University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Department of Bangla MPhil Thesis

2005-12

Rudra Muhammad Shahidullah's poetry: Social Consciousness and Artistic Form

Khan, Syed Ahmad

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1015

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যঃ সমাজ ভাবনা ও শিল্পরূপ

তত্ত্বাবধায়কঃ

প্রফেসর ড. অমৃতলাল বালা

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী।

গবেষকঃ

সৈয়দ আহ্‌মদ খান

এম.ফিল ফেলো

জানুয়ারি ২০০০ ব্যাচ

রোল নং- ৩৭

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যঃ সমাজ ভাবনা ও শিল্পরূপ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য লিখিত এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন ডিগ্রির জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত করা হয়নি।

সৈয়দ আহমদ খান

(সৈয়দ আহ্‌মদ খান)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

রাজশাহী
ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

ড. অমৃতলাল বালা
এম.এ. (রাজশাহী); পি-এইচ.ডি. (কোলকাতা)
প্রফেসর
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
ফোন: অফিস: ৭৫০০৪১-৯/৪১৪৭
বাসা: ৮৮০ ৭২১ ৭৫০৬৫৪
বাসা নং- প-১০/এফ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, রাজশাহী।

Dr. Amritalal Bala
M. A. (Rajshahi); Ph.D (Kolkata)
Professor
Department of Bengali
Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh.
Phone : Off.- 750041-9/4147
Res- 880 721 750654
House No-W-10/F
Rajshahi University Residential Area, Rajshahi

Date : ২৭।১২।০৫ ইং

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দ আহ্‌মদ খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ-এর ফেলো হিসেবে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্য: সমাজ ভাবনা ও শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছেন। আমি এই গবেষণা কর্মটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি; এটি মৌলিক উপকরণ থেকে রচিত এবং তার একক গবেষণার ফল।

এই গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি এই অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

২৭/১২/০৫
(প্রফেসর ড. অমৃতলাল বালা)
সুপারভাইজার
এম ফিল/পি এইচ.ডি
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দ আহ্মদ খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ-এর ফেলো হিসেবে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য আমার পত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্য: সমাজ ভাবনা ও শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছেন। আমি এই গবেষণা কর্মটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি; এটি মৌলিক উপকরণ থেকে রচিত এবং তার একক গবেষণার ফল।

এই গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এই অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(প্রফেসর মোঃ আবুল ফজল)
বাংলা বিভাগ, ২৭.১২.২০০৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

কো-সুপারভাইজার
এম.ফিল/পি.এইচ.ডি
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ কথা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর (১৯৫৬-১৯৯১) কাব্য রচনার সময়কাল ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত। এর মধ্যে পনের বছর কম বেশি সামরিক শাসন কবলিত বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির স্থবির কাল। রাজনীতির হাত পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। পাকিস্তানি স্বৈরশাসন থেকে যে আশায় বাঙালি একদিন সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শক্তিশালী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে; স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে সে প্রাপ্য বাঙালি পায়নি। সমাজের সর্বত্র দেশীয় আমলা-দালালদের দ্বারা সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হতে থাকলো। অন্যদিকে দেশীয় সামরিক শাসকের দ্বারা বিপ্লবী ও প্রগতিশীল কর্মীগণ নির্বিচারে খুন, জখম ও অরাজকতার শিকারে পতিত হতে লাগলো। রুদ্র বরাবরই সচেতন রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক ছিলেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উদারনৈতিক সাম্যবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাধনায় দেখা যায়। টগবগে তারুণ্যদীপ্ত এই কবি, কবিতা ও রাজনীতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক ব্যভিচার রোধে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘ, কবিতা পত্র, লিটল ম্যাগাজিন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় থেকে সামরিক শাসনমুক্ত শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সবার আগে।

অস্থির অশান্ত পরিবেশে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের নাতিদীর্ঘ জীবনে রুদ্রের কবিতায় প্রগাঢ় উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক-চিত্রকল্পের ভাষা এবং উপকরণিক পট পরিবর্তনগত কোন বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনার আশা করা বৃথা। তারপরও এ দেশের যে ক'জন কালসচেতন কবি আছেন, রুদ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সর্বস্তরের মানুষের ভুল চেতনায় একজন শব্দ শ্রমিকের মতো অনবরত হাতুড়ি পিটিয়ে সজাগ করতে চেয়েছেন তিনি। দুর্বোধ্য শব্দের বিন্যাসে না গিয়ে সহজ ও বোধগম্য কবিতার দ্বারা এ কবি সম্মিলিত করতে চেয়েছেন সবাইকে। বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ছন্দে ন্যস্ত থেকে কবি রুদ্র মার্ক্সিয় সাম্যবাদের আশ্রয়ে সমাজ দেহে ফসলের সুষম বন্টন করতে চেয়েছেন। রুদ্রের এই সমাজমনস্ক মনোভাব এবং সাহসী চিন্তাধারা আমাদের তাঁর উপরে অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রেরণা জাগিয়েছে। তাঁর কাব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা বিষয়ভিত্তিক সাতটি অধ্যায়কে বেছে নিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়: "আধুনিক বাংলা কবিতায় গণচেতনা: সমাজ প্রেক্ষিত"। এতে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রেক্ষাপট এবং বাংলা কবিতায় গণচেতনা ও মার্ক্সিয় ধ্যান-ধারণার

বহিঃপ্রকাশের বিবরণ বিদ্যমান। মূলত, এ সময়কালে- পাঁচজন কবির মধ্যে সাম্যবাদী গণচেতনা প্রবলভাবে এসেছে, আমরা তাঁদেরই আলোচনা করেছি। যেমন- ক) কাজী নজরুল ইসলাম, খ) বিষ্ণু দে, গ) সমর সেন, ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ঙ) সুকান্ত ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়: "বাংলাদেশের কবিতায় সমাজ-রাজনীতির ধারা ও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ"। পূর্ব পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং উত্তরণের জন্য এদেশের প্রধান প্রধান কবিদের কবিতায় অধিকার চেতনাবোধ এবং সাম্যবাদের দ্বারা কিভাবে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন; এ-ধারাক্রমে রুদ্রের আগমনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ দু'টি অধ্যায় কবি রুদ্রকে অনুধাবন করার জন্য সহায়ক হবে। তৃতীয় অধ্যায়: "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় জাতীয় জীবনের হতাশা ও প্রতিরোধ স্পৃহা"। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ১৯৭৫-এর পট-পরিবর্তনগত প্রেক্ষাপট এবং ১৯৯০ পর্যন্ত সামরিক সরকারের দুঃশাসনগত জাতীয় জীবনের অবক্ষয় ও রুদ্রের কবিতায় নির্যাতিত মানুষের অধিকারবোধের তীব্রতা বিশ্লেষণের জন্য আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্তির মাধ্যমে আলোচনার চেষ্টা করেছি। অনুচ্ছেদগুলো হলো: ক) সামরিক দুঃশাসন, খ) দারিদ্র্য ও সংগ্রাম, গ) ক্লেদাক্ত জনজীবনের অবসান, ঘ) স্বৈরশাসক ও সন্ত্রাসকবলিত নগরজীবন, ঙ) চিত্ত চায় শুধু বিত্ত, চ) জীর্ণ সভ্যতা ও ছ) স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্ন।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম: "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় স্বদেশ চিন্তা ও সাম্যবাদী আন্দোলন"। বাংলাদেশের উপদ্রুত জনপদ ও অসহায় মানুষের মুক্তির দিক নির্দেশনায় রুদ্রের সাম্যবাদী চিন্তার পরিস্ফুটন এতে বিদ্যমান। তাঁর জীবনাদর্শগত পর্যালোচনার পাশাপাশি সাম্যবাদের সামাজিক ইতিহাস ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা চারটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি। যেমন- ক) পীড়িত স্বদেশ ও সাম্যের অধিকারবোধ, খ) প্রেম ও প্রকৃতির ভাবনায় বিপ্লববোধ, গ) একনায়কত্ব স্বৈরশাসন ও বিপ্লবাত্মক প্রেরণা ও ঘ) সম্মিলিত সাম্যবাদের লড়াই।

পঞ্চম অধ্যায়: "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। কবি বরাবরই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পক্ষের একজন শব্দ-সৈনিক এবং উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অধিকারী; তাঁর কাছে ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা সাম্যবাদ। এ অধ্যায়ে তার বিশ্লেষণ বর্তমান। ষষ্ঠ অধ্যায়: "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় নির্মাণশৈলী"। ভাষাগত সহজবোধ্যতা এবং প্রচলিত অভিজাত ভাষার ক্রিয়াপদকে অক্ষুণ্ন রেখে দক্ষিণাঞ্চলের শব্দের মিশেল ঘটিয়েছেন কবি। গল্পাশ্রয়ী দীর্ঘ কবিতা, বক্তব্য প্রধান কবিতা এবং লিরিকধর্মী প্রেমের কবিতা রচনা করলেও রুদ্র ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে উদাসিন ছিলেন না। ত্যক্ত-বিরক্ত

হয়েও তিনি সব সময় ছন্দে বিন্যস্ত ছিলেন; এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়: "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবনালেখ্য"। এতে কবির জীবন-বৃত্তান্তের পাশাপাশি গান, উপলিকা, গল্প ও রচনা নিদর্শনের ধারা বর্ণনা এবং সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যনির্দেশ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ রয়েছে। তথ্যনির্দেশে আমরা উপরের ব্যক্তি ও গ্রন্থ বোঝাতে 'ঐ' সংকেত ব্যবহার করেছি। অসীম সাহা (সম্পাদিত) 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনা সমগ্র' 'দুইখণ্ড' একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা প্রথম খণ্ডের কাব্যগুলোর আলোচনা বেশি করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা যেখানে এসেছে, সেখানে ২য় খণ্ড অবশ্যই উল্লেখ করেছি, যেখানে কোন খণ্ডের উল্লেখ নেই, তা মূলত প্রথম খণ্ড ধরে নিতে হবে। কোথাও আবার দ্বিতীয় খণ্ড বোঝাতে '২খ' উল্লেখ করেছি।

বানানোর ব্যাপারে আমরা রুদ্রের মতামত অগ্রাহ্য করিনি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তা অক্ষুণ্ন রেখেছি। তিনি ধ্বনিকে মূল ভিত্তি ধরে কবিতায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির পরিবর্তে 'ন' ব্যবহার করেছেন। 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র'-এর সম্পাদক অসীম সাহা এবং 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর'-গ্রন্থের জীবনীকার তপন বাগচীও রুদ্রের অনুসৃত বানান রক্ষা করেছেন। বানানের এই পরিবর্তনের দায়ভার রুদ্র নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন। আমরাও বর্তমান অভিসন্দর্ভে রুদ্রের বানানরীতি গ্রহণ করেছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রধানত আমার প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর সারোয়ার জাহান স্যারের নিকট থেকে প্রেরণা পাই এবং তিনি এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাঁর আন্তরিক উৎসাহবোধ মনে রাখার মতো। বর্তমানে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. অমৃতলাল বালা; তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামত, কৌশলী বিবেচনাবোধ ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরামর্শ আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে চিরদিন যুক্ত রাখবে।

বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এ গবেষণা কর্মের বিলম্ব হয়েছে, বিলম্ব হলেও বাস্তবে রূপলাভ করায় আমি মনে আনন্দ অনুভব করছি। ভুল-ত্রুটি দূর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং

সৈয়দ আহ্‌মদ খান

বিষয় সূচি

ঘোষণা-পত্র

প্রত্যয়ন পত্র

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অধ্যায় :

আধুনিক বাংলা কবিতায় গণচেতনা: সমাজ প্রেক্ষিত — ০১–৩৮

ক) কাজী নজরুল ইসলাম
খ) বিষ্ণু দে
গ) সমর সেন
ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ঙ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অধ্যায় :

বাংলাদেশের কবিতায় সমাজ-রাজনীতির ধারা ও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ — ৩৯–৮১

তৃতীয় অধ্যায় :

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় জাতীয় জীবনের হতাশা ও প্রতিরোধ স্পৃহা — ৮২–১১১

ক) সামরিক দুঃশাসন
খ) দারিদ্র্য ও সংগ্রাম
গ) ক্লেদাক্ত জনজীবনের অবসান
ঘ) স্বৈরশাসক ও সন্ত্রাস কবলিত নগরজীবন
ঙ) চিত্ত চায় শুধু বিত্ত
চ) জীর্ণ সভ্যতা
ছ) স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্ন

চতুর্থ অধ্যায় :

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় স্বদেশ চিন্তা ও সাম্যবাদী আন্দোলন — ১১২–১৭৭

ক) পীড়িত স্বদেশ ও সাম্যের অধিকারবোধ
খ) প্রেম ও প্রকৃতির ভাবনায় বিপ্লববোধ
গ) একনায়কত্ব স্বৈরশাসন ও বিপ্লবাত্মক প্রেরণা
ঘ) সম্মিলিত সাম্যবাদের লড়াই

পঞ্চম অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা — ১৭৮–১৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় নির্মাণ শৈলী — ১৯৯–২৪৫

সপ্তম অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবনালেখ্য ২৪৬–২৮১

উপসংহার ২৮২–২৮৪

পরিশিষ্ট– ১ : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রতিকৃতি ২৮৫

পরিশিষ্ট– ২ ২৮৬

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৬-২৯৩

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতায় গণচেতনা : সমাজ প্রেক্ষিত

আমাদের এই উপমহাদেশ চিরকালই বিজাতির শাসিত ও শোষিত। প্রচুর অর্থকরী সম্পদ ছিল বলেই একদিন বিদেশী বণিকদের এদেশে আগমন ঘটে। ব্রিটিশদের দখলের পূর্বে এ দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। এই অর্থের লোভে পারসিক, গ্রীক, কুষাণ, দ্রাবিড়, মঙ্গোল প্রভৃতি নানা গোত্রীয় লোক শাসন করেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল। তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশই এ-দেশ শাসন করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিগুলোর শাসনে এদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ব্রিটিশদের দখলে থাকার পর মাত্র দুই দশকের মধ্যে তার সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা রূপটি হারাতে থাকে। নিচের তথ্যটি উল্লেখ করার মতো :

> ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে নবাবকে গদিতে বসিয়ে ও গদিচ্যুত করে ইংরেজরা লাভ করে ৫,২৬৬,১৬৬ পাউণ্ড। সিরাজোউদ্দৌলার পতনের আট বছরের মধ্যে ইংরেজরা বাংলাদেশের কাছ থেকে আদায় করে সর্বমোট ৬,৬১৪,৮২৬ পাউণ্ড। ... ১৭৭০-৭১ সালের মহামন্বন্তরের বছরে রাজস্ব আদায় প্রথম ছয় মাসে পূর্ববর্তী বছরের আদায় থেকে ২.২৫ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী বছর ছাড়িয়ে যায় ১৩ লাখ টাকা। কৃষকদের কাছ থেকে গায়ের জোরে নগণ্য মূল্যে কৃষিপণ্য কিনে ও উচ্চমূল্যে বিক্রি করে (মন্বন্তরের এটাও একটা প্রধান কারণ ছিল) ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তারা যে কি পরিমাণ লাভবান হয়েছিল তার সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি। তদুপরি কোম্পানী সরকার বয়ন শিল্পের ওপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এই শিল্পটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।[১]

ইংরেজ শাসকদের উদাসীন মনোভাবের ফলে পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ৪৫ লাখ লোক। বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ও কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ কাক-পক্ষি-কুকুরের আহারে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের পথ ধরে গ্রামে গঞ্জে দেখা দিল মহামারি। কবি-শিল্পীদের বিবেকে গভীরভাবে নাড়া দেয় পঞ্চাশের এই মহামন্বন্তর। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (১৭১৪-৭৬) এই করুণ অনুষঙ্গ গভীর মমতায় তুলির আঁচড়ে তুলে ধরেন কঙ্কালসার, শীর্ণকায় মানুষের লাশ, কাক-শকুন-চিল খুবলে খাচ্ছে বিকৃত পচা লাশ। কবি-সাহিত্যিকরা চুপ থাকতে পারলেন না। দুই বাংলার সচেতন কবি-সাহিত্যিকগণ প্রতিবাদ জানালেন তীব্র ভাষায়।

অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯৪৮-১৮) কালে আধুনিক বাংলা কবিতার অবয়বে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়, তা হলো কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) সমাজতান্ত্রিক চেতনা। এ মতবাদের সঙ্গে এদেশের মানুষ বিশ শতকের

শুরুতেই পরিচয় লাভ করে। শোষণমুক্ত পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে এবং সর্বহারার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই মার্কসের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শ্রেণী সংগ্রামই ছিল তাঁর হাতিয়ার। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে এ দর্শন পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলনে রূপলাভ করে–

> কার্ল মার্কসের ইকনমিকস-এর অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্ক লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।[২]

তিরিশ-চল্লিশ দশকের কবি মাত্রই সমাজ-রাজনীতি সচেতন, তাঁদের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আলোড়িত। কেননা, রুশ বিপ্লব সৃষ্টি করে মায়াকোভস্কি, নাৎসী বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হন ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬), স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বেদনা জন্ম দেয় আলবের্তি ও এরনান্দেজকে, নাৎসী আক্রান্ত ফরাসি দেশে দেখা দেন আরার্গ (১৮৯৭-১৯৮২), এলুয়ার (১৮৯৫-১৯৫২), চিলিতে পাবলো নেরুদা (১৯০৪-৭৩), পশ্চিমেও অসংখ্য কবি সাম্যবাদে উদ্বেলিত হয়ে সমাজ-রাজনীতি নির্ভর কবিতা চর্চা শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন "জর্মন হাইনে, ফরাসি ওজেন পাতিয়ে (যার 'আন্তর্জাতিক'-এর অসাধারণ বাংলারূপ দিয়েছেন নজরুল), রুশ মান্ডেল স্টান, স্পেনীয় থেসার ভেলিয়েখো, তুর্কি নাজিম হিকমত, চেক হোলুব ও আরো অনেকে। বিশ শতকে যে রাজনীতি প্রবণতাটি বিশ্ব জুড়ে কবিদের অনুপ্রাণিত করে উৎকৃষ্ঠ রাজনীতিক কবিতা সৃষ্টি করেছে, তা সমাজতন্ত্র।"[৩]

তিরিশের দশকের কবিদের নাগপাশ শিথিল করে চল্লিশের কবিরা গণ মানুষের কাতারে শামিল হলেন। এ সময়ের সমাজতান্ত্রিক অনুষঙ্গগুলো ব্যাপক হারে বাংলা কবিতায় স্থান পেতে থাকে। এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) "রাশিয়ার চিঠি"তে কোথাও মার্কসের নাম না থাকলেও আছে সাধারণ মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের কথা; আছে শ্রমিকের প্রতি বৃদ্ধ কবির আশীর্বাদ। পৃথিবীর যেখানেই সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের আক্রমণ কবি হৃদয়ে সঞ্চার করেছে গভীর মর্মযাতনা। "ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখলের পটভূমিতে রচিত 'আফ্রিকা' কবিতায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্মবেদনা আন্তর্জাতিক ভালবাসা।'[৪]

স্পেন এবং চীনে মানবতার বিপর্যয় হলে কবি তার প্রতিবাদ জানান। ১৯৩৮ সালে হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করে নেন। রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা জানান এই ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে। বিশ্বের নির্যাতিত গণমানুষের প্রতি গভীর বেদনার বাণী- তাঁর গানে ও কবিতায় বিরাট স্থান দখল করে আছে।

(২)

সাম্যবাদের জটিল তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়েও সাদামাটা ভাবে বলা যায়, সাম্যবাদে উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতির বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। শ্রেণী সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণীর এক নায়কত্বের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যায়। আর এই সর্বহারাদের মাধ্যমেই ঘটবে সমাজে শ্রেণী ব্যবস্থার বিলোপ। জন্ম নেবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা। এটা প্রমাণ করতে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিস্তৃত ইতিহাস তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ও শ্রেণী সংগ্রামের আলোকপাতে বলেছেন :

> স্বাধীন মানুষও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্রিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা আর কারিগর এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে। কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংস প্রাপ্তিতে। [৬]

কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশে দেশে কবি-সাহিত্যিকরা বেশি আলোড়িত হয়েছেন। বিশেষ করে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, পৃথিবী ব্যাপী বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়ে তোলে। তাছাড়া মার্কস এবং এঙ্গেল্স (১৮২০-৯৮) নিজেরাও যৌবনে কবিতা লিখেছিলেন। সেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) অনেক নাটকের সংলাপ মার্কসের কণ্ঠস্থ ছিল, ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) ভূরি ভূরি লেখা তাঁর আয়ত্ব ছিল। তাই মার্কস এবং এঙ্গেলস্ "জার্মানীর দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিখ হাইনে এবং ফ্রাইল গ্রাথকে নিয়ে তারা সাম্যবাদী সমাজের পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবাণী রচনায় প্রবৃত্ত হন। পরে তাদের সাধনাকে টেনে নেয়।"[৭] কবিদের প্রতি একটা দুর্বলতা তাঁদের ছিলই। মায়াকভস্কিকে স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। যে বলশেভিকরা রুশ বিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো, তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) ছিলেন তাদের বিরোধী, অথচ লেলিন (১৮৭০-১৯২৪) শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তলস্তয়কে মেনে নিয়ে বিখ্যাত সিদ্ধান্তটি নিলেন– "কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তবে তাঁর রচনায় বিপ্লবের কোনো-না-কোনো মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হয়ে পারে না।"[৮]

তারপর বাঙালির কাছে মহাপ্লাবনের মতো এলেন ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। গোর্কির চর্চার মাধ্যমে উজ্জীবিত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) হাতেই অবশ্য গোর্কির সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাংলা সাহিত্যে একটা পরিপূর্ণ অবয়ব পায়। এই সময়ে আরেকজন তরুণ দীপ্রভাবে উপস্থিত হলেন, তিনি সোমেন চন্দ (১৯২০-৪২)। ফ্যাসিবাদী ঘাতকের ছুরি মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর জীবন প্রবাহ স্তব্ধ করে দিলো। গোর্কির 'মা' উপন্যাস এতোটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে,

১৯৩৯ সালে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১) ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: "কেঁদোনা গোর্কির 'মা' পড়ো, সান্ত্বনা পাবে।"[৮] অবশ্য গোর্কি একজন মহৎ লেখক হওয়াতে গোঁড়া কম্যুনিস্ট মতবাদ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর 'ক্লিম্ স্যামগিন' উপন্যাস তার স্বাক্ষর।

অনেকটা পোড়া জমিতে ফসল ফলানোর জন্যে টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ধর্মীয় ঐতিহ্যের আশ্রয় নিলেন। আর শূন্যতার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্রেশ্‌ট (১৯৮৯-১৯৫৬) অবশেষে আশ্রয় নিলেন মার্কসবাদে। পার্টিতে যোগদান সত্ত্বেও তার লিরিক প্রেরণা এবং শিল্পবোধ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়নি। অবশ্য একথা সত্য যে, রুশ বিপ্লবের পূর্বেও পৃথিবীতে অনেক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে এবং সেসব বিপ্লবেও মানুষের ভাগ্য অনেকাংশে সুফল পেয়েছে। কিন্তু সে সব সমাজ বদলে মানুষ যথার্থ 'মানবিক' হতে পারে নি–

> কারণ, মানুষের বদল হবার ক্ষেত্র যে সমাজ, সেটিই তো তেমন করে বদলায়নি। আগেকার সবগুলো সমাজ বিপ্লব বহি:রঙ্গের বিপ্লব মাত্র, সমাজের অন্তঃসারকে সে সব বিপ্লব অতি সামান্য পরিমাণেই ছুঁতে পেরেছে। সে সব বিপ্লবে সমাজের শাসকের প্রকার বদল হয়েছে, শাসকের প্রকৃতি বদল হয়নি। সবগুলো বিপ্লবের পরও শাসক থেকে গেছে শোষকই।[৯]

বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা একতাবদ্ধ হলেন। কম-বেশি প্রায় সকলেই সাম্যবাদে অণুপ্রাণিত হলেন, সবাই খুঁজতে লাগলেন কিভাবে পুঁজিবাদ থেকে শ্রমজীবী শ্রেণীকে মুক্তি দেয়া যায়। "মার্কসের একথাটি সবার প্রেরণা জাগালো: বিপ্লবে শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রথম কাজ হবে মেহনতি ও সর্বহারাদের শাসক শ্রেণীতে পরিণত করা, বিজয়ী হওয়া গণতন্ত্রের যুদ্ধে।"[১০] 'ভীরু' আর অলস অপবাদ জুটলেও বাঙালি যে কখনো কখনো প্রয়োজনের মুহূর্তে অস্ত্র তুলে বীরদর্পে লড়াই করেছে, তার অসংখ্য নজীর আমাদের ইতিহাসে বিদ্যমান। মোগল যুগের বারভূঁইয়াদের ক্রমাগত আক্রমণ, ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ, দুদুমিয়ার সশস্ত্র ফারায়েযী আন্দোলন (সূত্রপাত ১৮১৮), তীতুমীরের (১৭৮২-১৮৩২) বিদ্রোহ, নীলচাষী ও রায়ত বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮০০), অষ্টাদশ শতকে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভিযান বাঙালির সংঘশক্তি, সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় বাহক।[১১]

১৯৪৬- এ একই সঙ্গে শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, এবং সারা ভারতব্যাপী মুক্তি সংগ্রাম। নৌবিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর ত্রিবাঙ্কুরকোচিনে প্রতিবাদ, তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম, সর্বোপরি বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৭)। মনুষ্যত্বের জয়-পরাজয়ের এ ঘটনাগুলো গোটা ভারতবাসীকে শোষকের হাত থেকে মুক্তির প্রেরণা জোগায়, তাতে প্রচণ্ড প্রতাপে বিবেকে জাগ্রত করে মার্কসের সাম্যবাদী এ মতবাদ। গোটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। গান্ধীজীর

(১৮৬৯-১৯৪৮) অসহযোগ আন্দোলনে (১৯৩০) সাড়া দিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ অত্যাচার-নির্যাতন-কারাবরণের শিকার হলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গংগাধর তিলক, লালা রাজপৎ রায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র (১৮৯৭-১৯৪৫)– যিনি গোর্কির 'মা' উপন্যাসের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছেন; সকলে মিলিতভাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অগ্নিবর্ষণ করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮), বাঘা যতীন (১৮৮০-১৯১৫), প্রীতিলতা (১৯১২-৩২), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), মাষ্টারদা সূর্যসেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) বীরত্বের কাহিনী সবার মুখে মুখে–

> একবার বিদায় দেমা, ঘুরে আসি', গানটি ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাবার আগে ক্ষুদিরামের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়ে গ্রামে গঞ্জে, হাটে ঘাটে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে উতলা করে দিল।[১২]

(৩)

ভারতবর্ষ এমনিতেই এক জটিল সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দ্বারা গঠিত। আজকের ভারতরাষ্ট্র, যা সামন্ত শাসনে ছিল, তা ৭৮১টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামন্তরাজ্যের ও ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসিত সাতখানা প্রদেশের সমষ্টি মাত্র। অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা নিম্নবর্ণের লোকেরা সারাক্ষণ শোষিত হয়েছে। তার উপর ধর্মীয় গোঁড়ামি, দ্বিজাতিতত্ত্ব, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি এবং এর ফলশ্রুতি– হিংসা, রক্তারক্তি। তার উপর ইংরেজ আমলে এদেশে নিদারুণ শস্যাভার ছাড়াও দুর্ভিক্ষ হয়েছে বাইশটি। এই পরিস্থিতিতে অক্টোবর বিপ্লব বাংলার সবচেয়ে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মহলের নিকট থেকে খুব ত্বরিত সাড়া লাভ করে। মার্কসবাদে আকৃষ্ট কয়েকজন প্রতিভা সম্পন্ন নেতাকে দেখা যায় যাঁদেরকে এ আন্দোলনে শামিল করা গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এম.এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)। ভারতীয় মার্কসবাদের বিকাশের কালে রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শনের উপর প্রচুর সংখ্যক বই ও প্রচারপত্র লিখে এম.এন. রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এম. এন. রায়ের অনুপস্থিতিতে কয়েকজন মুসলমানও কমিউনিজমকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসলেন, কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল হালিম (১৮৭৯-১৯৫৬) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিরিশের দশকে সাম্যবাদ এদেশে কিছুটা অগ্রগতি লাভে সক্ষমও হয়েছিল। শিল্প-মজুর ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে বোম্বাই, বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বিশেষ করে বাংলার তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) ছিল সামন্তবাদ বিরোধী। সামন্তবাদী শোষণকে লাঘব করা ও বর্গা জমির উপর চাষীর স্বত্বকে প্রতিষ্ঠা করা– এ দু'টিই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। বিদ্রোহী চাষীরা অসম সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখিয়ে এই আন্দোলনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যা বহু শহীদের রক্তে বাংলার মাটিকে রক্তে স্নাত করিয়েছে।[১৩] শুধু ভারত বর্ষে কেন, তখন

বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদের জয় জয়কার। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ, চীন এবং মধ্য প্রাচ্যেও এ মতবাদ সচেতন বিবেকে গ্রহীত হয়। কেউ সরাসরি দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন, আবার কারো রচনায় সাম্যবাদের অনুষঙ্গ অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হতে থাকে। নিচে আমরা এমন কয়েকজনের আলোচনায় যেতে চাই, যাঁরা বাংলা কবিতায় শ্রেণী চেতনা এনেছেন। সাম্যবাদের ধারাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় মধ্যযুগ হলো সামন্তবাদের যুগ। সামন্তবাদ বা ফিউডালিজম-এর সাথে ধর্মের গভীর সম্পর্ক। ধর্মই তখনকার সাহিত্যের প্রাণ। সামন্ত কাঠামোর সবচেয়ে উঁচুতে ছিলেন রাজা। সমস্ত জমির মালিক তিনি। কবি-সাহিত্যিকরাও পরিচালিত হতেন এই রাজার দ্বারা। কাজেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রাজার স্তুতি ও ধর্মীয় প্রেরণা দ্বারা শুরু থেকেই আচ্ছন্ন। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের তো কথাই নেই, এমন কি যে মঙ্গল কাব্যগুলি বৈষ্ণব ও শাক্ত কাব্যাদি অপেক্ষা লোক জীবনের খুব কাছাকাছি এবং লোক সংস্কৃতির রসে জারিত, সেখানেও দেব দেবীর মাহাত্ম্য ছাড়া তেমন কিছু নেই। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দরিদ্র মানুষের দুঃখের মর্মান্তিক চিত্র থাকলেও তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দেব দেবীর কাছে প্রার্থনার কাতরতা বিদ্যমান। রাজা যেহেতু বড়-সড় গোছের একজন সামন্ত প্রভু, অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে তাই সব সময় সংঘর্ষ লেগেই থাকতো সেজন্য ঘন ঘন যুদ্ধের ফলে মহামারি দুর্ভিক্ষ প্রায়ই দেখা দিতো; মহামারিও দুর্ভিক্ষে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ।

গ্রামের জমি গুটি কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে নিয়ন্ত্রিত। লব্ধ সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য সাধারণ জনতা রাজশক্তির স্থানীয় লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করেছে। এই রাজশক্তির কর্ণধারদের যুগে যুগে নাম পাল্টিয়েছে শুধু, কিন্তু কর্মপদ্ধতি এতোটুকু পাল্টায়নি। হিন্দু যুগে এদের নাম ছিলো "সামন্ত, মহা সামন্ত, মান্ডলিক, ভূস্বামী, মহত্তর, মহামহত্তর। মুসলিম যুগে এদের নাম হয়েছে রাজা মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার, হাওলাদার ইত্যাদি।"[১৪] এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যই রাজসভার সাহিত্য। এদের ভাবতেই কষ্ট হতো, এই সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙতে পারে। ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই মন মানসিকতা ছিল শান্ত ও সুন্দর। কিন্তু যখনই আঘাত এসেছে, ভারতবর্ষের এই আমজনতা আর শান্ত থাকেনি। যেমন, আমরা দেখতে পাই ভারতের বিভিন্ন নরপ্রবাহের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষজন প্রিয় ভূমি থেকে উচ্ছেদের নব নব সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে, তাদের দোসর জমিদার মহাজন, সুদখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯–৯১), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৯–১৭৯৯), তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ (১৭৮৩–১৭৮৫), লাল সিং বিদ্রোহ (১৮০০), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১–৩২), ভূমিজ বিদ্রোহ

ও গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা (১৮৩২-৩৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) ইত্যাদি বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল তৎকালীন বাংলা প্রদেশের রাজমহল পাহাড় থেকে শুরু করে ধলভূমের পাবড়া পাহাড়ে।[১৫] অন্যদিকে ঊনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলার গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। চাষীরা এর বিরুদ্ধে ছড়া তৈরি করল, মুর্শিদাবাদ জেলায় ছড়া বাঁধল :

জমিদারদের শত্রুনীল,
কর্মের শত্রু ঢিল (আলস্য)
তেমনি জাতের শত্রু পাদরী হিল।[১৬]

ভারতবর্ষে গণচেতনার এভাবে উত্তোরণ আমরা দেখতে পাই; কিন্তু এতে সংঘবদ্ধ কোন বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়নি, সংঘবদ্ধ প্রয়াস ছিল অনুপস্থিত। দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩) 'নীলদর্পন' (১৮৬০), নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গ্রাম-বাংলার চাষী সম্প্রদায়ের রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে অসামান্য বাস্তবতার সঙ্গে। মাইকেল মধুসূদনদত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৯৭০) প্রহসনে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান প্রজার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস– সাহিত্যে আকস্মিক হলেও গণজীবনে এর প্রভাব পড়েছিল, কিছুটা হলেও বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে আম জনতা সাহস সঞ্চার করেছে। প্রতিবাদের পূর্বাভাস ঘটেছে এ পর্বের সাহিত্যে।

রবীন্দ্র কবিতায় সাম্যবাদের অনুষঙ্গ সামান্য, তিনি মোটেও সাম্যবাদী কবি নন; তার পরেও গণ মানুষের জন্য তাঁর ছিল সমবেদনা। 'আমি তোমাদেরই লোক। আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়'। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বেদনার বাণী তিনিও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সমাজ-রাষ্ট্রে কেন বিক্ষোভ ঘটে তারও চিন্তা-চেতনা তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সাম্যকে প্রশংসা করার সাথে সাথে একনায়কতার বিপদ সমূহকেও উল্লেখ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের ভয়ানক মানবতা বিরোধী অন্ধকার এবং এক নায়কত্বের বন্দীশালায় নির্যাতিত মানুষের জন্যই কবির প্রাণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো কেঁদে ওঠে, একজন মানবিক চিন্তামগ্ন কবি বলেই।

ভারতবর্ষে সাম্যবাদের চেতনা রুশ বিপ্লবের পরে শুরু হয়েছিল; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নেই হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলিম রায়তদের সংগ্রাম করতে দেখা যায়, বিত্তহীন মুসলিমগণ গণচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে লড়াই শুরু করে। প্রাচীন গ্রীসে যেমন ক্রীতদাসেরা লড়েছে তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে, রোমান সাম্রাজ্যে অন্তজরা বিদ্রোহ করেছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডে ভূমিদাসদের অভ্যুথান ঘটেছিল ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে; তেমনি ভারতে রায়ত ও বিত্তহীনরা রুখে দাঁড়িয়েছিল জমিদার, মহাজন ও

বিত্তবানদের বিরুদ্ধে। এসব সংগ্রাম সাম্যবাদী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে। ইংরেজ মদদ প্রাপ্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে এসব সংগ্রামকে হিন্দু জমিদাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করে ফায়দা হাসিল করার জন্য। সেজন্য ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের পুরো সময়টা জুড়েই সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে প্রায় প্রত্যেক বছরেই।[১৭]

এক গোলযোগপূর্ণ মুহূর্তেই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। আজও বাংলার কাব্যাকাশে শ্রেণী চেতনা রূপায়ণে তিনি উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্রের মত শোভা পাচ্ছেন। অবশ্য নজরুল পূর্ব ও সমসাময়িক বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক-এর মধ্যেও গণচেতনা প্রবল ও প্রচ্ছন্নভাবে দেখা দেয়। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), দীনেশ দাস (১৯১৩-৮৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৭৬), মণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৭-১৯৮৭), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-৮০) প্রমুখের রচনায়। এঁদের অনুপ্রেরণায় এদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন রুশ বিপ্লবের পর পরই গড়ে তুলেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), মানবেন্দ্র নাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-৭৪), নলিনীকান্ত সরকার, আব্দুল হালিম (১৮৭৯-১৯৫৬) এবং আরো অনেকে। 'তবে নজরুলের গৌরব এইখানে যে, তাঁর আগে বাংলা ভাষায় এই সুরের ও ভাবের কবিতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তিনিই সাহস ভরে প্রথম বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তুতে শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন সচেতনভাবে। গৌরবটা শুধু পথিকৃতেরই নয়, নির্ভীকতারও।'[১৮]

কার্ল মার্কস এর সমাজ পাল্টানোর দর্শন রাশিয়ায় যে সমাজবিপ্লব ঘটায় তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব-মানুষের চিন্তার দরোজায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে এই মতবাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। নজরুল স্বরাজ পার্টি (১৯২৩) গঠন থেকে শুরু করে ঐ পার্টিরই মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর এই সময়ের রচনায় সাম্যবাদের আবেদন অত্যন্ত বেশি। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের তখন জয় জয়কার অবস্থা। বিশ্ব পরিসরে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার শ্রেণী-ভাঙ্গন, শ্রেণী-শোষণ, বিভিন্ন উৎপীড়ন, যুদ্ধ-অবক্ষয়-রক্তপাত, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা-সঙ্কট, মুষ্টিমেয়ের ধন-সম্পত্তি ও বিলাসের বিপরীতে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্পত্তিহীনতা, মানবেতর জীবন যাপন– এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশে দেশে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দখল করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে থাকলো। নজরুল ইসলাম একেবারেই শ্রেণী-সচেতন কবি। বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য সমাজ জীবনে জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, শোষিত-নিপীড়িত-অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ-বেদনায় শুধু শরিকই হননি, শাসক শ্রেণীর প্রতি ক্ষমাহীন অভিশাপ বর্ষণ করেছেন; ক্ষোভে, দুঃখে ও ঘৃণায়।

সাংগঠনিক কোন কঠোর নিয়ম-নীতি, কিংবা অতি সংযম প্রদর্শন তাঁর কাছে আশা করা বৃথা। তাই নজরুল সচেতন ভাবে সাম্যবাদের সাথে জড়িয়ে যাননি, সম্যুনিষ্ট ভাবাদর্শে তাড়িত হয়েও কাব্য রচনা করেন নি; কিন্তু

তাঁর সহজ আন্তরিকতাকে সাম্যবাদী সত্তার সাথে মেলাতে পেরেছিলেন এবং বাস্তব-বিক্ষুব্ধ সময় এ দর্শনের প্রতি তাঁকে সহানুভূতিশীল করে তোলে। তিনি আপাদমস্তক একজন মানবদরদী কবি। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী দ্বারা আক্রান্ত জনপদ।

তখন হিটলার, মুসোলিনী, আত্তিলা, তৈমুর, চেঙ্গিস প্রভৃতি নামগুলো সমাজদেহে বিষ ফোড়ার মতো দেখা দিলো। হত্যা-লুণ্ঠন-শোষণ-পীড়নে অতিষ্ঠ বিশ্ববাসী। বৃটিশ রাজত্ব করার গরজে এ উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং ভেদনীতির সাথে তিনি সুপরিচিত। দাম্ভিক মুসোলিনী তো ঘোষণা করেছে: 'মানুষের কথা সুন্দর বস্তু হলেও রাইফেল, মেশিনগান, প্লেন এবং কামানের শব্দ আরো সুন্দর'।[১৯]

অপরদিকে রুশ বিপ্লব মানব দরদী মতবাদ, মার্কস-এঙ্গেল্‌স-লেলিন মানবদরদী। 'এঁরাই বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন– মানুষ মাত্রেরই বাঁচার জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের সরকারের রাষ্ট্রের। ... প্রবলের-দুর্বলের শোষক-শোষিতের শ্রেণীগত দ্বান্দ্বিক অবস্থা ও অবস্থানই দুর্বল মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার হৃত হবার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কারণ। কান্ট-হেগেল হয়ে দ্বান্দ্বিক অবস্থান তত্ত্ব এ আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব মার্কস-এঙ্গেল্‌সের হাতে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেল আর পরে তা Material Diloplic তথা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে স্থিতি পায় বিদ্বান মানববাদীর চিন্তায় ও চেতনায়।'[২০] নজরুল ইসলামও এই মানবতাবাদী বিপ্লবে স্নাত হয়েছেন–

দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!
চোখে ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?[২১]

নজরুল উপলব্ধি করলেন, এ দেশের শোষিত মানুষকে ভাল না বাসলে তাদেরকে আপন করা যাবে না। শ্রমের কোনো ইতিহাস হয় না, ইতিহাস হয় শ্রম লুটেরাদের। ইতিহাস হয় কীর্তিময় সভ্যতার, বর্বর-লম্পট-বেনিয়াদের যাদের চাকচিক্যটাই প্রধান। মৃত্যু ও ক্ষুধার মুখোমুখি যারা দাঁড়িয়ে, যাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে– ইতিহাস এখানে নির্মম। কিন্তু মানবদরদী নজরুল শ্রমিককে দেবতাসনে বসালেন, তাদের সু-দিনের গান গাইলেন :

আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!/ হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,/ পাহাড় কাটা সে পদের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,/ তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,/ তোমারে বহিতে যাহারা পবিত্র

অঙ্গে লাগাল ধূলি;/ তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাতি তাহাদেরি গান,/ তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।[২২]

সাম্যবাদকে তিনি দেখেছেন মানুষের ত্রাতা বিধাতারূপে। শোষণকারীর নাগপাশ ছিন্ন করে পৃথিবীতে সুখের পায়রা উড়বে, শ্রমিক-মজুর-কুলিরা থাকবে ক্ষমতায় আসীন; অত্যাচারীর দল লেজ গুলিয়ে শাসনযন্ত্র থেকে বিতাড়িত হবে–

ক. আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত্
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইক আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলাখল।
... ...
আজ জাগরে কৃষাণ, সবত গেছে কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।[২৩]

খ. যত শ্রমিক শু'ষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝারে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবিরে আয় মজুর দল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥[২৪]

গ. আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
শোন্‌রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠবরে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাইরে,
ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠবরে সব ঠেলে ॥[২৫]

ঘ. ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা

ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান!
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥[২৬]

ঙ. ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উপর অধিকারী।
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥[২৭]

প্রথম মহাসমরের পর ইউরোপীয় দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন তরুণেরা যখন বিশ্বাস রাখতে পারছিল না পূর্বতন কোনা মতবাদে, সব মহাদর্শের প্রতি হয়েছে বিশ্বাসহীন; তরুণ লেখক-বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক যখন খুঁজছিলেন একটি নতুন আদর্শ; যাতে পোষণ করা যাবে আস্থা, ঠিক তখনি তারা পেয়ে গিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রকে। নজরুলের রক্তও টগবগিয়ে উঠলো, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা ঘোষিত হলো অসংখ্য কবিতায়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেন যে, শ্রমিক-মজুর-কুলিদের এ মতাদর্শ বোঝার দরকার নেই, এ মতাদর্শ তাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয়; কিন্তু এ সাম্যবাদেই তাদের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা নিহিত। 'তার সিন্ধুপারের 'আগল ভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। তার প্রলয় মানে 'বিপ্লব' আর জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লবও।'[২৮] তাই নজরুল বিশ্বব্যাপী বর্ণ-গোত্র ভেদাভেদ ভুলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন :

আয়র্ল্যান্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া, চীন,
নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া- সবার ধারিগো ঋণ।
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই।[২৯]

জারের রুশ সাম্রাজ্যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাউলাট কমিশনের প্রতিবেদন ডিসিশন কমিটির রিপোর্ট (১৯১৮), ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সময়ের অভিঘাতে জড়িত না হয়ে তাঁর উপায় কি? এভাবে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হওয়া তার হঠকারিতার লেশমাত্রও ছিলনা; তেমন হলে অনুশোচনাহীন কারাদন্ড ভোগের মত কঠিন শাস্তি মাথা পেতে নিতেন না; দ্বিতীয়বার কারাবরণের ঝুঁকি নেওয়াও সম্ভব হতো না।[৩০] বাংলা কবিতায় তাই নজরুল স্বভাবী ধারায় যোজনা করতে পেরেছেন বিদ্রোহী মনোভাবের চিরন্তনতা। এই দ্রোহ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যা তাঁকে আজীবন সংগ্রামী হবার চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছে বার বার :

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2608
Date..16.2.07

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা,
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা-
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।[৩১]

এজন্য নজরুলের প্রেমের কবিতায়ও দেখা যায় অস্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার বেদনা, যে অস্তিত্বকে জটিল করেছে সমকালীন সমাজ, শাসক, এমনকি ব্যক্তি নিজেও। শাসক গোষ্ঠীর লোভ লালসার বলি হয় সাধারণ মানুষ। কিন্তু মানুষ মনে প্রাণে চায় উন্নতি; নজরুল বৈষয়িক উন্নতি চান না, মানবিক উন্নতির পক্ষপাতী। সাম্যবাদ ব্যবস্থার লক্ষ্যও উন্নতি, সেটা মানবিকতাকে পরিত্যাগ করে নয়। সব মতাদর্শ বৈষয়িক উন্নতির যাঁতাকলে মানুষকে বিপর্যস্ত, ক্লান্তিকর ও গ্লানিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করেছে, ক্ষতি হয়েছে তাঁদেরই :

অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জু পাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস–
তাদের সে লোভ-বহ্নি শিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তা'রা জ্বালাল ধরা, তা এনেছে
তাদেরি সর্বনাশ!
আপন গলে আপন ফাঁস!"[৩২]

"অগ্রপথিক" কবিতায় তাই বিচিত্র গণ মানুষের মিছিলে নেতৃত্ব দেন নজরুল নিজেই :

জগতের এই বিচিত্র মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই।
শ্রমরত ঐ কালি মাখা কুলি, নৌ-সারং,
... ...
প্রভু স-ভৃত্য পেষণ কল,

অগ্র-পথিক উদাসী দল,
জোর কদম্ চলরে চল্ ॥[৩৩]

যারা সে মিছিলে যায়নি, প্রতিবাদ করেনি, বলদের মতো প্রভুর পা লেহন করে চলেছে, কবি তাদের ভর্ৎসনা করলেন :

শ্রমিক হইয়া খুঁড়িতেছে মাটি,
হীরক মালিক আহরি'
রাজার ভাঁড়ার করিছ পূর্ণ
নিজে নিরন্ন বিহরি'।[৩৪]

কাজী নজরুল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কবিতার রুদ্র রূপে আবির্ভূত হন। ইংরেজদের কুট রাজনীতির হয়রানির শিকারে পরিণত হন। কবিতার জন্যই তাঁকে ইংরেজদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। ১৯২০ সালে তিনি সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। এ সময়ে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' (১৯২০) পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হলেন এবং পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সাম্যবাদী রাজনীতিবিদ মুজফ্ফর আহমদ। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিজেই সম্পাদনা করলেন 'ধূমকেতু' নামের অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। তারপর সম্পাদক নিযুক্ত হন 'লাঙল' পত্রিকার। 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশ করে নজরুল রাজরোষে নিপতিত হন ১৯২২ সালে।

প্রতিবাদের রক্ত যার শরীরে সারাক্ষণ টগবগিয়ে ওঠে, তার কি নিশ্চুপ কারাবরণ সাজে? জেলে বসেই তিনি লেখেন, 'কারার ঐ লৌহ্ কপাট। ভেঙে ফেল কররে লোপাট'- এর মত রক্ত গরম করা গান এবং জেলের কিছু অনিয়মের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন। অনশনে কবির জীবনাশঙ্কা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) প্রমুখ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। 'ধূমকেতু' বিষয়ক মামলা শুরু হয়েছিল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর এজলাসে। 'মিঃ সুইনহো নিজেও ছিলেন একজন কবি। এ কথা জানার পর নজরুল যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা হলো : 'শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি, শুনে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু বেলা শেষের শেষখেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত ঊষার নবশঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অর্ভ্যথনা করছে : তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার আলোর মিলন হবে কিনা বলতে পারিনা ... ... আমার ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতে অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায়

অত্যাচারকে দগ্ধ করবে।'[৩৫] ঔপনিবেশিক বিচার প্রহসনে কাজী নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

ব্রিটিশ সরকার বিশ শতকের শুরুতেই প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা অসংখ্য গুপ্ত সমিতির সন্ত্রাসবাদিতায় ভীত হয়ে পড়ে। এ সব সমিতিরও নানা রকম পুস্তক, পুস্তিকা, লিফলেট, ইশতেহার ইত্যাদি সরকার অত্যন্ত সচেতনভাবে খুঁজতো এবং বাজেয়াপ্তও করতো। বৃটিশ সরকার তখন অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির নামগন্ধ পেলেই তা বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতা সরকারকে পেয়ে বসে। তবে নজরুলের উপরই সরকার বেশি নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যে মার্কসীয় অনুষঙ্গের অবতারণা সবচেয়ে বেশি; সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অনেক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী যুক্তি-তর্কের অবতারণাও দেখা যায়। মানব সাম্য ও ভারতের শোষণ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ছিল এসব কবিতার মূল সুর। উন্নত সমাজ গঠন, অর্থনৈতিক সাম্য ও সমবন্টনের মাধ্যমে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর কাম্য। সেজন্য হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের ভেদাভেদ ভুলে গণচেতনায় উজ্জীবিত হবার অকুণ্ঠ আহ্বান আছে :

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসিলম-খ্রীশ্চান।[৩৬]

"বিংশ শতাব্দী" কবিতায় আরো স্পষ্ট উচ্চারণ :

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিম- নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকী পেশা
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত
এ মানবের একই রক্ত মেশা।[৩৭]

এ জন্যেই কবি নজরুল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে শত্রু হিসেবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে চিহ্নিত করেছেন; তাদের বিরোধিতা করে কবিতায় তীক্ষ্ণ চাবুক চালিয়েছেন এবং গণচেতনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসন নির্মূল হয় :

(ক) ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,

কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রুর স্যাঙাত
মা বোনদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।[৩৮]

(খ) আজ চারিদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত।[৩৯]

তখন মার্কসের সাম্যবাদের সফল প্রয়োগ হচ্ছিল দেশে দেশে। তাঁর দর্শনেই মুক্তি পাচ্ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তা থেকে কোটি কোটি মানুষ। এক চীনেই তো মুক্তি পেয়েছিল আশি কোটি মানুষ। নজরুলও ভীত ভারতবাসীর মুক্তি কামনায় উচ্চকিত হলেন; ভারতবাসীর মুক্তির জন্য চাই সাহস, প্রতিবাদ, সংগ্রাম এবং অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রেরণা। তুর্কী, মোগল, পাঠান, ইংরেজদের শাসন-শোষণে আবদ্ধ জনতাকে শৃঙ্খল ভাঙার গান শোনালেন, এবার আর গোলামি নয়, ভারতের চাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

নজরুল ইসলাম ধনবাদী শোষক শ্রেণীর অবসান চাইলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'জলদস্যু' এবং 'ডাকাত' বলেও চিহ্নিত করেছেন। মার্কস বলেছিলেন 'উপনিবেশ ব্যবস্থা পৃথিবীতে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত।' নজরুলও তাই সমগ্র নিপীড়িত মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন এবং এভাবেই যে বর্ণবাদী ভারতের স্বাধীনতা আসবে, তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। 'সাম্যবাদী' কাব্যের "সাম্য" কবিতায় এমনই সুর বর্তমান :

গাহি সাম্যের গান–
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায় নাক কেহ ক্ষুদ ঘাটা কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে, মোটর চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাক সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা দেহ।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জা ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ, নাই পুলিশের ডর।[৪০]

এ সমাজ ব্যবস্থা তো মার্কসের সাম্যবাদেরই। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'– বাস্তবে এমন নীতির সৃজন ঘটিয়েছিল সাম্যবাদী সমাজেই, রুশ বিপ্লবে। তবে এ কথা সত্য, নজরুল

সচেতনভাবে সাম্যবাদী চেতনায় ভাবাপন্ন হয়ে কবিতা চর্চা করেন নি; তাঁর সহজ ও আন্তরিকতায় সাম্যবাদ তাঁর সত্তারই সাথে মিশে গেছে। সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে তিনি জর্জরিত; অভিঘাতটাই কবিতা হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এমন হয়েছে তার মানবদরদী মন থাকার কারণে। নজরুলের মানস দ্বন্দ্ব পীড়িত– এই দ্বন্দ্বে তিনি মথিত, কখনো অস্থির, কখনো চঞ্চল, কখনো উচ্চকিত। সব বিরোধ গুলো সাম্যবাদের অনুষঙ্গে কবিতা হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

(খ) বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দু'টি দশক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শতাব্দীর সূচনাতেই সিগমণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৫) স্বপ্ন ব্যাখ্যান গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। মনোবিদ্যার দেশ ওলোটপালোট করে দেন তিনি তাঁর মনঃসমীক্ষা তত্ত্ব হাজির করে। ১৯১৩ সালে ইংরেজিতে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হলে মানসের চেতন-অবচেতন-অচেতন প্রদেশগুলি আবিস্কৃত হয়ে পড়ে। The Interpreation of Dream এবং Three Contributions of the theory of Sex, Introductory Lecture on Psychoanalysis, Psychopathology of Everyday life প্রভৃতি গ্রন্থে ফ্রয়েডের চিন্তা-চেতনা ও মানব মনের আন্তরহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) বিখ্যাত আপেক্ষিকতত্ত্ব মানুষের চেতনায় বস্তুর বাস্তবতাকে নতুন মাত্রায় যুক্ত করলো। এর পরেই সমাজ ব্যাখ্যায় কার্ল মার্কসের শ্রেণীতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা প্রবাহ গণ আন্দোলনের রূপ পেতে থাকে। কিন্তু সমর নায়কদের পুঁজি বিস্তারের উদগ্রবাসনা প্রথম মহাসমরের ফলে মানুষকে আবার নৈরাজ্য, অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কবি-শিল্পী-চিত্রকরদের মনে যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, ধর্মীয় আবহ মিথ্যাচারও শূন্যতার যে স্বরূপ অবলোকন করেছিল; তারই পথ ধরে জন্ম নেয় নিহিলিজম বা শূন্যবাদিতা এবং নঞর্থকতা–

> এই সাহিত্যিক নঞর্থকতার কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছিল বিভিন্ন রকম। তিস্তাঁ জারা জুরিখে বসে উপলব্ধি করেছিলেন মানব জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার গগণদর্পীরূপ। তার ভাবনা-চিন্তায় উপ্ত হয়েছিলো নিহিলিজমের সুরধ্বনি। তিনি পারীতে এলেন, তার শূন্যমনস্ক মতবাদ ডাজইজমে আকৃষ্ট হলো পারীর শিল্পীকবিকুল। যুদ্ধের বিভীষিকা, মানবতার পতন, অস্ত্রের জয়গান, অর্থনীতির ডামাডোল এবং চাবুক, চাপ, বিশ্বাসহীনতা, ধর্মের মুখোশ, ধর্মহীনতা এবং অবিশ্বাস, চিন্তার ক্ষেত্রে অস্থিরতা, পুরানো শিল্প আন্দোলন ও শিল্পবোধে অবিশ্বাস ওই মহাসমর অতিক্রান্ত ইউরোপের কবিজীবনে দৃঢ়মূল করলো ডাডইজম।[৪১]

তিস্তাঁ জারার (১৮৯৬-১৯৬৩) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন সুররিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাতা আঁদ্রে ব্রেতো (১৮৯৬-মৃত), কবি লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২) ও পল এলুআর (১৮৯৫-১৯৫২)-সহ অনেকেই। পরে তাঁরা সুরারিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরাবাস্তববাদ বিশ শতকের কবি শিল্পীদের মননজাত শিল্প আন্দোলনগুলো ইউরোপে নন্দনতত্ত্বকে শুধু পাল্টে দেয়নি, বাস্তবতা ও মানবিক চাকচিক্য, গতি, বেপরোয়া বিলাস ব্যসন ইত্যাদির ফাঁকে অবস্থান করছে যে ক্ষত, তাকেই শিল্পের গণ্য বস্তু হিসেবে কবিরা গ্রহণ করলেন। এতে কবির ভাষাভঙ্গি হলো সহজতর, শব্দ হয়ে উঠলো প্রতীক বা সংকেতবাহী। বাস্তবকে অবাস্তবের স্বপ্নময় রাজ্যের প্রতিস্থাপন করে যান্ত্রিক জীবনের নগ্ন নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন তারা। এই সময়েই মার্কসের সমাজ পাল্টানোর দর্শন রাশিয়ার যে সমাজ বিপ্লব ঘটায় তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব-মানুষের চিন্তার দরোজায়। আঁন্দ্রে ব্রোতোঁও পরাবাস্তববাদের সাথে মার্কসবাদের সঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন: কিন্তু কোনো নীতি নিয়মের কঠোর বশ্যতা পরাবাস্তববাদীরা স্বীকার করেনা; ব্রেতোঁ রয়ে গেলেন পরাবাস্তবে। পিকাসো আরাগঁ ও এলুয়ার সাম্যবাদে যোগ দিলেন। বিষ্ণু দে'র এই আরাগঁ ও এলুআরের সাথেই বেশি মিল। সেজন্যই আমরা এ পটভূমি সামনে রাখছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে বিষ্ণু দে-র তিনটি কাব্য 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাতভাই চম্পা' (১৯৪৫) ও 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭) প্রকাশ পায়। এ তিনটি কাব্যের রচনাকাল ১৯৩৭-১৯৪৭। এ কাব্যগুলিতে বিষ্ণু দে-র সমাজ রাজনৈতিক চেতনা নতুন মোড় নেয়। সামাজিক রূপান্তরের ভিত্তিভূমি হচ্ছে সমকালীন সমাজ; আর চিন্তার গোত্রত্বে বিষ্ণু দে মার্কসবাদী।

'সাত ভাই চম্পা'-র রচনাকাল শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী চেতনা এবং তার সঙ্গে স্বদেশী অভিজ্ঞতাকে সংলগ্ন করার ও নৈতিক অবক্ষয়ে ধনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শোষণের চক্রান্ত চলছিল। তাই ব্যক্তি পরিবর্তে সমাজচৈতন্য, ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিবোধ, চিরায়তের পরিবর্তে সমসাময়িকতায় কবি অনুসিক্ত। ১৯৪৬-এ একই সঙ্গে শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এবং সারা ভারত ব্যাপী মুক্তি সংগ্রাম। একটু পূর্বেই হয়ে গেল বাংলাদেশে মন্বন্তর ১৯৪৩-এ। মনুষ্যত্বের পরাজয় ও জয়ের ঘটনা একই সঙ্গে। 'এক দল তরুণ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, যাঁরা পরে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামে খ্যাত হন। ভেরিয়ের এলুইন, উইলিয়াম আচার এবং তাদের নৃতাত্ত্বি পত্রিকা 'ম্যান ইন্ ইন্ডিয়া' ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ ঘটে। সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়। চেনা-অচেনায় যে ঘরা এই প্রকৃতি, সেখানকার দরিদ্র লড়াকু আদিবাসী মানুষ, তাদের গান-ছবি, ... ক্লান্ত তিক্ত মন শুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত পায় শিল্পের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে।'[৫২] বিষ্ণু দে-র কবিতায় সেজন্য সমষ্টিগত একটা প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র সৃজনে উদ্যোগী হন; যা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনো, প্রাচীন প্রতিমাসকে ভেঙে বেরিয়ে

আসতে চায় নতুন রূপে, অর্থে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধীশক্তিতে। যা পরে একান্ত মানবিকতায় সিক্ত হয়। সাঁওতাল গানের ধ্বনি ও বাকভঙ্গিকে আত্মস্থ করে বিষ্ণু দে যা বলেন তা একই সঙ্গে সাঁওতালী ও মানবিক।

বিষ্ণু দে-র কবি মানসে সর্বত্রই সকল প্রতিমাই একটা বিশেষ তাৎপর্যে বিধৃত। 'লুকাচের মতো তিনিও বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চপুঞ্জ ও অন্তঃশীলা বিমূর্ত নিয়মাবলীকে পরস্পর সাপেক্ষতায় নিজ কবি মানসে ধারণ করতেন এবং এক নতুন বাস্তবতার জন্ম দিতেন, যাতে সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ধৃত বস্তুর অপ্রত্যক্ষণই রক্ষিত হতো।'[৪৩] যার ফলে তাঁর কবিতায় আবেগের সম্মোহন থাকে না, কোন রহস্যের উদ্বেলতা থাকে না, শুধু প্রতিদিনের কর্মের রাজ্যে ইচ্ছা পূরণের অভাবে যন্ত্রণার দায়ভাগ থাকে। যেখানে প্রত্যক্ষ ঘটনাপুঞ্জের নিষ্কাষণ ঘটেছে, শিল্পের নির্যাসে তা স্নাত, পরিশুদ্ধ। অনেকগুলো অভিজ্ঞতাকে তিনি সাজাতে চান সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলনে। যেমন ঃ

তুমি তো পড়েছ সুললিত পদাবলী,
সেই আমাদের হৃদয়ের পাঠশালা?
সেই ভাষাতেই আমরা তো কথা বলি।
তাই সংক্ষেপে, সব লক্ষণই জানো-
বসন্ত আসে শহরে মানো না মানো,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর রটে,
গলা পিচে আর উচ্ছল ডাস্টবিনে,
স্ক্যাভেঞ্জারে অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত আসে দুর্গন্ধের দিনে।[৪৪]

মার্কসবাদে অবিচল আস্থা রেখে বিষ্ণু দে মানুষকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন প্রতিদিনের ব্যবস্তায়, কর্মে ও ঘর্মের সিক্ততায় এবং জীবিকার্জনের অপরিহার্যতায়। কর্মেই মুক্তি, কর্মেই শক্তি এবং কর্মেই গড়তে চেয়েছেন ভাষার প্রাসাদ। সাম্যবাদের নিগূঢ় তাৎপর্যই হচ্ছে কর্মই সকল শক্তি ও গুণের আঁধার; কোনো অরূপ-আধ্যাত্ম শক্তিতে বাস্তবের মুক্তি ঘটে না। তাই চলার পাথেয় হিসেবে মানুষ নিজেই আপন পথ তৈরি করে। বিষ্ণু দে তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টায় যন্ত্রণাদীপ্ত মানুষের ছবিকে দেখেছিলেন। যেমন :

ক. মোহানার শত মোহ স্রোতে আসন্ন মুক্তিতে দিশাহারা-
স্বপ্ন বাঁচে কর্মে
কর্ম দুঃস্বপ্নে অস্থির।[৪৫]

খ. আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে।[৪৬]

গ. এখানে দ্বিধার ঠাঁই তো নয়
শত্রু কখনো ভাই তো নয়
কর্মক্ষেত্রে বীর জানে
নিজ প্রত্যয়ে অকুতোভয়
নবজগতের নির্মাণে।[৪৭]

বিষ্ণু দে'র কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে মানব দরদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাবের পরিচয় বেশি। এই বুদ্ধির জোরেই তিনি এলিয়টের অনুকরণে আন্তর্জাতিক হয়েছেন। মার্কসবাদের প্রভাবে সমাজ ও ইতিহাস সচেতন হয়েছেন। বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আহরণ করে প্রতীকের মতো কাজে লাগিয়েছেন। 'বক্তব্য খুব একটা নতুন নয়, কবির আন্তরিকতার বদলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে, সংশ্লেষণের পরিবর্তে রূপ সৃষ্টিতে জাদুর বদলে সচেষ্ট ঐকতানের প্রয়াস লক্ষণীয়, খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবার প্রবণতা রয়েছে, গীতিকাব্যের মধ্যে নাটকীয় সংলাপ, অতি পরিমিত বাক্‌রীতি, নিজের সুরের মধ্যে পরের উক্তির নির্দেশ বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এনেছে।'[৪৮] একটা বিপরীত প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে কবি বিষয়কে পরিব্যাপ্ত করে তোলেন যেখানে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্‌স মূর্ত হয়ে ওঠে এবং একটা পরিপূর্ণ সংঘাতের মধ্যে তাঁর কবিতা সমাজ-রাজনীতির নান্দনিক রূপ মূর্তি ধারণ করে। 'সব কিছু মিলিয়ে তিনি এমন একটি দ্বান্দ্বিকতার অবয়ব গড়ে তোলেন যেখানে বিচ্ছুরিত হয় ধ্বংস, মৃত্যু, অন্ধকারের মধ্যেও নিহিত যুক্তির বিভা। এ-অর্থেই বিষ্ণু দে, যতটা মনন আরোপ করেন কবিতায় তারও বেশি রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা ও কার্যকারণেরও ঝোঁক চাপিয়ে দেন, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রাজনীতিতেও যা চলে না, কবিতার হাতেও যেন আজ সেই বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়েছে যার বাইরে কবিতা যেতে পারছে না।'[৪৯]

মার্কসের প্রতি কবির অন্ধ ভক্তি ছিল না, তিনি লক্ষ্য রাখেন মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগে। এ প্রেরণা থেকেই বিষ্ণু দে ইতালির সাম্যবাদের তাত্ত্বিক নেতা আন্তোনিও গ্রামশ্চির পঠন পাঠনে মনোনিবেশ করেন এবং গ্রামশ্চির মতোই শ্রমজীবীর মধ্যেই বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে পর্যবেক্ষণ করেন, যদিও গ্রামশ্চির মতো ছিল না তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। তবু বিষ্ণু দের রয়েছে একটা নান্দনিক মানস জীবন যাপনের সংগ্রাম ও সদিচ্ছা। সেজন্য তিনি নিজেই মার্কসীয় দর্শনের আলোকে গড়লেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের সংঘাতটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। মানুষের নিঃস্বতার ব্যথা ও পূর্ণতার আকাঙ্খাকে তিনি এই পটভূমিতেই বার বার দেখতে চেয়েছেন, কখনো সে মানুষ বিপর্যস্ত, সেই আগের মতোই খণ্ডিত তার ব্যক্তিসত্তা।

একটা বিচ্ছিন্নতা বোধ কবির জীবনে অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'পূর্বলেখ' থেকে 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর' পর্যন্ত মার্কসবাদ এবং সেই সাথে দলের সাথে যোগাযোগ ভালভাবেই এগোচ্ছিল। সক্রিয় কর্মী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না, এমন কি ফ্যাসিবিরোধী যুগেও না। এই বিচ্ছিন্নতা এসেছে ১৯৪৮ সালে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যে চরম বামপন্থী লাইন গৃহীত হয়, তার প্রভাবে কমিউনিস্ট জগতে বিশেষত শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে মতান্ধতা ও একদেশদর্শিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল– তার অংশীদার হওয়া বিষ্ণু দে-র সাহিত্য রুচি ও নন্দনে অসম্ভব। ... ... ফরাসি কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক রজের গারোদির মতামতকে হাতিয়ার করে লড়াইও চালিয়েছেন তিনি সাহিত্যিক অন্ধতার বিরুদ্ধে। অবশ্য যতদিন লড়াই চালানো সম্ভব হয়। ক্রমশই পার্টির হুকুমে তাঁকে একঘরে হতে হল। বেশ কিছু কাল সহ্য করতে হল নগ্ন, কুৎসিত আক্রমণ।'[৫০] তারপরও কবি 'সময়ের চূড়ায়' উঠে জীবনকে নতুন করে জারিত করতে চান, সেই সাম্যবাদের শ্রেণীসংঘাত ও সংহতির রূপ শিল্পে লক্ষ্য করেন। যামিনী রায়ের এক ছবিতে দেখেন 'মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর'। কোণার্কের স্থাপত্যে কবি লক্ষ্য করলেন কর্মী মানুষের নির্মাণের জয় এবং গণ মানুষের মিছিলের একাগ্রতা।

সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নানা বাধা, বিপত্তি, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আসবেই; তবু পুঁজিবাদী রক্ত খাদকদের শৃঙ্খল ভেঙে শোষণহীন সমাজ একদিন প্রতিষ্ঠা হবেই, শ্রমজীবী মানুষের রাজত্ব ও অধিকার সংগ্রামে কবি দ্বিধাহীন।

আবার রুশ ও চীন বিপ্লব এবং সাম্যবাদী সমাজের প্রতি কবিমনের উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। যা তিনি দেশজ সাহিত্য, পুরাণ, ধ্রুপদী সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির ভেতরে খুঁজেছেন আত্মমুক্তির সূত্র :

ক. মিলিত হাতের মে দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক্ রুশ উজ্‌বেক

হে লাল কমল হে নীল কমল
হাজার কসাক্-মেঘ।[৫১]

খ. হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে
তেলাঙ্গা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর রুশে
বেলগ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে প্রাণে জাগে
হে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা।[৫২]

গ. ও দিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভয়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।[৫৩]

দেশে দেশে সাম্যবাদের প্রসারণ, শ্রমজীবী মানুষের বন্ধনমুক্তির সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সম্প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসন এবং মন্বন্তর, বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, বাঙালি মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা, বুর্জোয়া সমাজের গ্লানি, পচন, ক্ষত, নাগরিক অবক্ষয় এবং শাসক শ্রেণীর সাথে শোষিতের বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন বিষ্ণু দে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে এবং সাম্যবাদী প্রেরণায়।[৫৪] কিছু উদাহরণ :

১. দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান;
তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে নিশান
... ...
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।[৫৫]

২. চাষিরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।[৫৬]

৩. যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।[৫৭]

৪. দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্ষা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?[৫৮]

৫. সাম্রাজ্যচণ্ডীর মুখে, চতুর্দিকে বাণিজ্য-দালাল
তারই মাঝে সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্ব দান।[৫৯]

৬. বিশ্বমাতার কোটি সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ
... ...
মিলিত হাতের সে দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক রুশ উজ্‌বেগ
হে লাল কমল হে নীল কমল
হাজার কশাক মেঘ।[৬০]

৭. একদা আমারই হবে জয়
বার বার বাতাসের হাতে লেগে লেগে
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝরে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানস বলাকা।[৬১]

৮. তবু অবিনশ্বর আয়ু
সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে
ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন
প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা।[৬২] ইত্যাদি।

তারপর ১৯৬০-৬১, এই সময়েই বিষ্ণু দে-র চিন্তা-চেতনে স্বদেশের যন্ত্রণা ও সম্ভাবনা অন্যদিকে মোড় নেয়। "সেই অন্ধকার চাই" থেকে "উত্তরে থাকো মৌন" পর্যন্ত কবিতায় কখনো তিক্ত, কখনো অবসন্ন, কখনো মরিয়া স্বপ্নদ্রষ্টার কণ্ঠস্বরে তিনি সময়কে তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তা ও কার্যকলাপে আত্মবিনাশী কলহ, ভারতীয় রাজনীতিতে অর্থহীনতা ও গৌণতার প্রসার, ষাট ও সত্তরের দশকের এই পরিবেশে বিষ্ণু দে-র অনুসন্ধানকেও ক্লান্ত করে তুলেছে।[৬৩] মার্কসবাদও যে সহজে বিকৃত হতে পারে, সে-ই মার্কসের জীবিতাবস্থার কাল থেকেই; বিষ্ণু দে-ও শেষে সংশয়ে ভুগলেন, তিনিও সাম্যবাদের যান্ত্রিকতাকে মেনে নিতে পারেন নি।

একনায়কত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতা, অতি বাম পন্থা ও সংশোধনবাদ নিয়ে সমস্যা থেকেই যায়। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস সাফল্য ও সংগতির ঘটনা যত আছে, প্রায় ততই আছে ভারসাম্য বিচ্যুৎ ভ্রান্তির দৃষ্টান্তও। তাঁর মন এসব ভ্রান্তি থেকে উত্তরণের পথ খোঁজে এবং স্বপ্ন দেখে শ্রেণীহীন সমাজের ভ্রান্তির ও পশ্চাদ্ধাবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

(গ) সমর সেন (১৯১৬-৮৭)

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অব্যাহত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় জনজীবনকে বিপর্যস্থ করে তুলেছে; মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টি ও উজ্জীবন এ দু'য়ের টানাপোড়েনে মধ্যবিত্ত জীবন চেতনা বার বার আন্দোলিত হয়েছে। তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধ, সমকাল সম্পৃক্ততা ও দেশাত্মবোধ মিলিত হয়ে ভারতীয় সাহিত্যের রূপরেখা আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছে। চল্লিশের দশকে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপে সংঘটিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন এবং অন্যদিকে সাম্যবাদী চেতনা কবি শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছে; তেমনি পরাধীন ভারতের অবক্ষয়, গ্লানি, আত্মসঙ্কট তাঁদের সমর্পিত করেছে বৃহত্তর ঐক্যসূত্রে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতায়। বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তিরিশের শুরুতেই তা ভারতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক আঘাত হানলো, শহর-গ্রামে সর্বত্র এ সঙ্কট ঘণীভূত হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতীয় জনজীবনে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান তৈরির প্রেক্ষাপট নিয়ে কবি শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক রূপান্তরের প্রত্যাশায় সাম্যবাদী আন্দোলনের চর্চায় গভীর আত্মনিয়োগ করলেন। ঠিক তখনি ১৯৪৩-৪৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটায়। ফলে শুরু হলো প্রতিরোধের কবিতা, সকল অমানবিকতার বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো দ্রোহ। সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূঢ়তায় সমরসেনও ঘোষণা করলেন– 'আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কসিস্ট'।[৬৪]

এই ঘোষণার দ্বারা মনে হতে পারে, সমর সেন বুঝি মার্কসীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন; কিন্তু না, সমর সেন বিষ্ণু দে-র মতোই আদর্শ ও মননে মার্কসপন্থী এবং অনেক একনিষ্ট সাম্যবাদী কর্মীর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, একাগ্রতা ছিল। তিনিও মার্কসীয় শ্লোগানধর্মিতায় বিশ্বাসী নন। তাই সমর সেন তাঁর বুদ্ধিপ্রধান কবিতায় সমাজের গ্লানি, অন্ধকার, অবক্ষয়, ক্লেদ এবং নিসঙ্গতার নৈরাজ্যে অস্থির হয়ে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। অবশ্য সাম্যবাদের মধ্যেই কবিচিত্ত অস্থির, তবে অনেক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মতোই স্বশ্রেণীকে অতিক্রম করা সমর সেনের সম্ভব হয়নি; মনে হয় সেজন্যই তিনি কাব্যজগৎ থেকেও স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমর, মন্বন্তর বিপর্যস্থ নগরজীবন, সমাজ-রাজনৈতিক কুটচাল প্রভৃতি এসেছে তাঁর কবিতায় অসংখ্যবার। "রোমন্থন", "হসন্তিকা", "পরিস্থিতি", "কয়েকটি মৃত্যু", "ঘরে-বাইরে", "আন্তর্জাতিক ধর্মের গ্লানি", "নানা কথা", "বসন্ত", "খোলা চিঠি", "ক্রান্তি", "আনন্দ মঠ", "২২শে জুন" প্রভৃতি কবিতায় সমাজ-রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুটচাল বিদ্যমান। পশ্চিমী গণতন্ত্রকে সমর সেনের মনে হয়েছে 'বৃদ্ধা গণিকা' মধ্য ইউরোপ যার পোষ্য :

ক. একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম শবজীবীর আশ্রয়,
শস্যহীন মাঠে পোড়া বারুদের স্বাদে
মুষ্টিমেয় মানুষ উচ্ছিষ্ট ফসলের খোঁজে,
শূন্যতার মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে কালোয়াতি দেখায়,
জয়গর্বে কামান গরজায়।[৬৫]

খ. নরহন্তা বিদেশী রাজ, রক্ত জোঁক স্বদেশী বণিক।[৬৬]

গ. দু'কোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাঙলাদেশে
চোরে চোরে মাসতুত ভাই
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।[৬৭]

ঘ. কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সারাক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।[৬৮]

সমর সেন ক্লেদাক্ত নগরজীবনের বিষণ্ণতার চিত্ররূপ এঁকেছেন তাঁর অসংখ্য কবিতায়। সেজন্য বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: 'সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজ কালকার জীবনের সমস্ত

বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।'[৬৯] সমর সেন অবশ্য যে কোন প্রতীকী শহরের কবি নন; পুঁজিবাদী ধণতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্ট আধুনিক শহরের কবি, 'কারণ তিনি বর্তমান সভ্যতার বিষণ্ন বন্ধ্যাত্বের কবি'।[৭০] নাগরিক হতাশা, নিরাশ্বাস শূন্যতা, ক্লান্তি, অবক্ষয় অবসাদ– সমাজ জীবনের এই ধণতান্ত্রিক বিপর্যয় থেকে যেন কোন দিন মুক্তি পাবেনা; বিষণ্ন বেদনায় দীর্ঘশ্বাস আসে কবির মনভূমে, ক্লান্ত শরীরে ধিক্কার আসে, দানা বাদে ক্ষোভ, দ্রোহ চিৎকার–

ক. মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিনভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লালা, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।[৭১]

খ. কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে;
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গনোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা![৭২]

গ. হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে;
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি
কত দীর্ঘশ্বাস
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কত দিন।[৭৩]

ঘ. গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ
হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধূলোর ঝড়,
এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো।[৭৪]

ঙ. চূর্ণ শহরের স্ফুলিঙ্গে
রক্তদন্ত কুকুর জাগে, মনে পড়ে
নরকে যাত্রাকাল।
বার বার পৃথিবী ঘুরে
যাত্রাস্থানে যথাস্থানে ফিরে আসি,
সর্বাঙ্গে কাল ঘাম,
বিষণ্ন বিধূর।[৭৫]

সমর সেন জাতীয় জীবনের এই দুর্বিসহ চিত্রই শুধু আঁকেন নি, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সাম্যবাদী আদর্শের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে পুঁজিবাদী ধণতান্ত্রিক জঞ্জাল হটিয়ে– সুষ্ঠু সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেছেন। শোষণ-বঞ্চনা থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি অনুভব করেছেন :

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশার নদীর জল ঝলকায়– শাণিত হাতিয়ার।
মাঝে মাঝে বালুচর, কাদা-খোঁচা জলে নামে,
ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,
হাতুড়ি বাজে কামার শালে,
সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।[৭৬]

সাম্যবাদী আদর্শে ব্যষ্টির কোন মূল্য নেই, সমষ্টির মধ্যে আত্ম নিমজ্জনেই তার স্বার্থকতা–

ক. অপরের শস্যালোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।[৭৭]

খ. যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।
দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে
তারা বলে, দুনিয়ার দুশ্‌মনের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।[৭৮]

গ. চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এদেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্থান।[৭৯]

সমর সেনের কবিতায় যুগ যন্ত্রণা থাকলেও মিথ ব্যবহারের ফলে তা সার্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে উঠেছে। অগ্নিবর্ণ, উর্বশী, পাণ্ডু ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; তাঁর আর্কেডিয়া যান্ত্রিক নগর সভ্যতার বিপরীতে একটি ভিন্ন ইচ্ছাকেই প্রতিষ্ঠিত করে, যা যান্ত্রিকতার ক্ষণস্থায়ীত্বের ঘোষণাও বটে এবং স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকেই জাগিয়ে তোলে। পুঁজিবাদ ধূলিস্যাৎ করে কৃষিনির্ভর সাম্যবাদী সত্যের কাছাকাছি এবং কৃষক-শ্রমিক-জনতার সম্মিলিত সাম্যের চিরন্তনতার ঘোষণাই দেয়।

(ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৯)

সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাঙলা কাব্যে আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট একই; উভয়েই মার্কসবাদী কবি বলে চিহ্নিত। তাঁদের সমাজ চেতনার পেছনে আছে বাংলাদেশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় মহাসমর, রুশ বিপ্লব, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের অস্থির রাজনীতি। তবে সুভাষের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম হলো, তিনি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট কর্মী; সেজন্য তাঁর যুগচৈতন্য কিছুটা অসরল ও তিক্ষ্ণধী। তাঁর কবিতার সুর একেবারেই কর্কশ; প্রেম-প্রকৃতি তিরোহিত শুরু থেকেই। সমকালীন বিশ্বের দায়বদ্ধতাও কবি এড়াতে পারেন না। ব্যক্তিবোধ থেকে সমষ্টিবোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি অর্জন করতে চান বৃহত্তর মানবমুক্তি। এই জন্য আমিত্বের নানা রূপ, চরিত্রের প্রাধান্য বলয়িত হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের সমষ্টিগত ভাবনা এবং অন্ত:বীণা ছিন্ন করে তাঁর কবিতা শ্লোগানধর্মীতায় খাপ খোলা তলোয়ার, মুক্তি সংগ্রামে আপোষহীন :

ক. প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠকাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
... ...
শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না–
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।[৮০]

খ. পায়ে পায়ে রুদ্ধগতি বিদ্যুৎ কদম,
ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি;
অগ্নিবর্ণ চোখের ভ্রূকুটি
... ...
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে;
মুক্তি আজ বীর বাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব;
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।[৮১]

গ. প্রভু যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দিরুক্তি করব না; নেব তীর ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই
দেহ্ না চললে চলবে তোমার কড়া চাবুক।[৮২]

ঘ. কাঁধে কাঁধে সান্নিধ্যে দাঁড়াও,
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও
শৃঙ্খলের কলঙ্ক মোচন।[৮৩]

ঙ. হে জননী,
আমরা ভয় পাইনি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে
সীমান্ত পার করে দেব।[৮৪]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতায় ব্যক্তি চেতনা বিভিন্ন চারিত্র্য ও গোত্রীয়বোধে একটা সম্মিলিত ঐক্য প্রেরণা লাভ করে এবং তাদের উজ্জীবনে, সংগ্রামী প্রতিরোধী আস্ফালনে নিপীড়িত মানুষের কাঙ্খিত স্বপ্নের

পৃথিবী বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে। "সালেমনের মা", "অগ্নিগর্ভে", "একটি লড়াকু সংসার", "যেতেই হবে", "লাল টুকটুকে দিন", "বাসিমুখে", "পারুল বোন", "ছিট মহল", "কমরেড স্তালিন", "মামা-ভাগ্নের গল্প", "সহজিয়া", "ফুল ফুটুক", "লোকটা জানলই না" ইত্যাদি কবিতায় গল্পের চরিত্রে নির্যাতিত মানুষের কাঙ্খিত পৃথিবী মিলে যায়। গণ মানুষের বিদীর্ণ বেদনার প্রতীক হয়ে আফ্রিকা যেমন উদার মানবিকাবাদী কবি বৃন্দের চৈতিন্যকে আন্দোলিত করে; তেমনি জোরদার করতে থাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাম্যবাদী কবির বিপ্লবী প্রত্যয়কে।[৮৫]

"মেজাজ" কবিতায় বাঙালি ঘরের কালো নিগৃহীতা বউটি পর্যন্ত আফ্রিকার স্বাধীনতায় উদ্বেলিত হয়ে যায়, তাদের প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের প্রত্যয়ের আলোকিত উদ্ভাসনে মাতোয়ারা হয়, তার গর্ভের সন্তান কালো হবে ভেবে লজ্জিতা হয় না এবং সন্তানের নাম করণেও সেই গর্বিত প্রত্যয়কে চিহ্নিত করতে চায়[৮৬]– সন্তানের নাম রাখে আফ্রিকা।

নাগরিক জীবনের অবক্ষয়, নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ, সামাজিক ক্লেদ, মালিক-মহাজনদের শোষণ, সভ্যতার উদ্ভট ম্যাকিপনার রূপক দেখা যায় "ফুল ফুটুক না ফুটুক" কবিতায় :

শান বাঁধানো ফুটপাতে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।[৮৭]

যান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার বীভৎস চেহারা, মহামারি-মৃত্যু, পদে পদে শোষণ, পঙ্কিল সমাজের বাস্তব কাঠিন্যের প্রকাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদী চেতনায় কোথাও কোথাও শ্লোগানধর্মী; শ্রমিকদের মানবেতর জীবন যাপন, মালিকদের খেয়ালীপনা, ঘৃণ্য চিত্তবিনোদন প্রভৃতির নিখুঁত চিত্রায়ণ বর্তমান :

'দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ,
রক্ত চক্ষু রাজার শাসন
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন;
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু
শবের গলিত গন্ধ ছোটে।

প্রজাপুঞ্জ উঠে;
আগুন লেগেছে ঘরে,
খরসূর্য মাথার উপরে।
ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য;
শূন্য পেটে চাষবাস চুপ
কারখানায় পড়েছে কুলুপ।[৮৮]

এই সমাজকে তাই পাল্টাতে হবে, সম্মিলিত বিপ্লবের কোন বিকল্প নেই; সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষপাতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নিম্নশ্রেণীর মানুষকে যারা অবহেলিত এবং অত্যাচারিত; তাদের স্বৎ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদেরকেই সমাজ পরিবর্তনে হাতিয়ার হতে হবে। কেননা মার্কস বলেছেন, "বিপ্লবে শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রথম কাজ হবে মেহনতী ও সর্বহারাদের শাসক শ্রেণীতে পরিণত করা, বিজয়ী হওয়া গণতন্ত্রের যুদ্ধে।"[৮৯] মার্কসের সমগ্র চিন্তার সারকথা হলো, ধণতন্ত্রী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিদান এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়ন। সেজন্য একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সুভাষ চাইলেন, সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে একত্রিত করে একটা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজের পতন এবং সাম্যবাদী সমাজ গঠনে শ্রমিক শক্তির উত্থান :

ক. জাগ্রত চল্লিশ কোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধণতন্ত্রের কবর।[৯০]

খ. ঘুম ভেঙে ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ!
রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুতে
অন্ধকারের বুকে হাটু দিয়ে দুহাত উপরে আসে
দুঃশাসনের ভিৎ।[৯১]

গ. লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়
অন্ধকার যবনিকা দুহাত সরায়।
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্ত পদচিহ্ন তার—
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়।[৯২]

কবি ভারতবর্ষের এই দুর্দিনে মেহনতী জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস শুধু নয়, কমরেডদের এগিয়ে আসার এবং নেতৃত্বদানের উদাত্ত আহ্বান জানালেন :

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবেনা?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা।
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?"[৯৩]

সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কিছুতেই তিরোহিত হয়না কবির অন্তর থেকে, এক সময় অজস্র মানুষের মিছিলের জয়োগানে মুখরিত আলোকে পৃথিবীতে ভালবাসার কবিতা রচনা করতে থাকেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় :

"মৃত্যু ভয়কে ফাঁসতিতে লট্‌কে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী,
অজস্র মুখ, সীমাহীন ভালবাসা
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।"[৯৪]

(ঙ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭)

সুকান্ত ভট্টাচার্য সাম্যবাদী বাস্তবতা ও বিপ্লবী চেতনার কবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় তিনি কলুষিত আঁধার থেকে সমাজ ব্যবস্থার এক সুস্থ পরিবেশে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। গণচেতনা থেকে গণকবিতে পরিণত হওয়ার একটা বাসনা তাঁর মধ্যে সদা জাগ্রত ছিল। তাঁর চিঠিপত্র মারফত জানা যায়, কবির চাইতে তিনি কমিউনিস্ট বলে গর্ব বোধ করতেন– 'কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই'।[৯৫] মাত্র একুশ বছর কালসীমা এবং ১৯৪৩-৪৭ মাত্র এই কয়টি বছরই সুকান্তের কবি ভাবনার বিকশিত সময়। পার্টির কাজে দিবারাত্রি ব্যস্ত; ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত

মানুষের সেবা– সর্বত্র তাঁর পদচারণায় মুখরিত বিপ্লবী প্রেরণা। নবজাতকের জন্য সংগ্রামী পথ, নতুন ভাবনা ও চিন্তার বীজ বুনে যেতে চান :

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।[৯৬]

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ কবলিত ভারতের তখন চরম অস্থিরকাল। দুর্ভিক্ষ-মহামারি, মজুর শ্রেণী লাঞ্ছিত, পদদলিত। তাঁর কাব্যধারায় এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের আহ্বান সূচিত হলো এবং এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রতিরোধের যুদ্ধে তিনি শামিল হলেন। জন্মেই দেখেছেন তাঁর স্বাদের স্বদেশ ভূমি বিদেশীর দ্বারা নিয়ত লাঞ্ছিত, 'ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়'[৯৭] 'মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী'।[৯৮] 'জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন' থেকে তিনি স্বদেশ কে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেন এবং মুক্তদেশে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন :

ক. রক্তে আনো লাল;
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল'।[৯৯]

খ. দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।[১০০]

গ. এ মাটি উত্তপ্ত হোক, এ দিগন্তে আসুক বৈশাখ,
ক্ষুধার আগুনে আজ শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্।
... ...
এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।[১০১]

ঘ. এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়,
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম রক্তের বন্যায়,
ওদের দু'চোখে আজ বিকশিত আমার কামনা।
অভিনন্দন গাছে, পথের দু'পাশে অর্ভ্যথনা।

ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে ॥[১০২]

ঙ. মুক্তির দাবী করেছি তীব্রতর
সারা কলকাতা শ্লোগানেই থরো থরো।[১০৩]

চ. জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ ॥
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান ॥[১০৪]

এভাবে আশাবাদী কবির কণ্ঠে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির মন্ত্রণা বেঁজে ওঠে। যা সমসাময়িক অন্যান্য সাম্যবাদী কবিদের প্রেরণা যুগিয়েছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৪), আশরাফ আলী খান (১৯০১-১৯৩৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৩), বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), মহীউদ্দীন (১৯০৬-১৯৭৫), অরুণ মিত্র (জ. ১৯০৯), বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৮২), দীনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), মণীন্দ্র রায় (জ. ১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯২১), গোলাম কুদ্দুস (জ. ১৯২০) প্রমুখ কবির দ্বারা সাম্যবাদী গণচেতনার জোয়ার বইতে থাকে।

তথ্য নির্দেশ

১. সিরাজুল ইসরাম চৌধুরী, "শুনতে পাই" (কলাম), 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ১৬ মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৩১।

২. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী, ৪ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ২৫ মে, ১৯৯৩, পৃ. ২১–২২।

৩. হুমায়ুন আজাদ, "কবিতা ও রাজনীতি", 'সীমাবদ্ধতার সূত্র', আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, পৃ. ২৪।

৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৫৪।

৫. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, রচনা সংকলণ, ১ খণ্ড, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ২৬।

৬. রণেশ দাশগুপ্ত, 'শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে', মুক্তধারা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯–৩০।

৭. যতীন সরকার, "তলস্তয়ের শিল্পাদর্শ ও তাঁর উত্তরাধিকার", 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা', মুক্তধারা, এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ. ১৪০–৪১।

৮. সত্যপ্রিয় ঘোষ, "বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব ও নতুন চেতনার সূচনা", 'বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা', ১৯৮৭, পৃ. ৬৫।

৯. যতীন সরকার, 'মানবমন মানবধর্ম ও সমাজ বিপ্লব', জাতীয় সাহিত্র প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃ. ৪।

১০. আবুল কালাম, 'ইউরোপীয় রাজনীতি ও কূটনীতি (১৮১৫–১৮৭১)', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ৩১৫।

১১. অজয় রায়, "বাঙালীর আত্ম পরিচয়ঃ একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্তিক আলোচনা", সফর আলী আকন্দ (সম্পাদিত), 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়', ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১, পৃ. ২৭।

১২. কৃষ্ণকুমার পাল চৌধুরী, "স্বাধীনতা হে মোর স্বাধীনতা!" 'বাংলা বাজার পত্রিকা' বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২০।

১৩. অজয় ভট্টাচার্য, 'নানকার বিদ্রোহ', মুক্তধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৯৭।

১৪. ড. সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা', সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

১৫. সাপ্তাহিক মেঘনা পত্রিকার প্রতিবেদন, ৫০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১ মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৭।

১৬. শ্রী সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, "বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৫৫।

১৭. এম. আর. চৌধুরী, 'ভারতের হিন্দু-মুসলিমঃ রক্তাক্ত ইতিহাস', সাপ্তাহিক আগামী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত রচনা, ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৮, পৃ. ১১।

১৮. নারায়ণ চৌধুরী, "বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব", মাসিক 'সংস্কৃতি' পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃ. ২২।

১৯. মূল মাইকেল প্যারেন্টি, "যৌক্তিক ফ্যাসিবাদ", 'কালো কুর্তাওলা আর কমিউনিস্টরা', ওমর তারেক চৌধুরী (অনুদিত), 'মাসিক সংস্কৃতি' পত্রিকা, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৪১।

২০. আহমদ শরীফ, "ভাবনার কথা" (কলাম), 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৩; পৃ. ৪১।

২১. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), 'নজরুল রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ২৪৬।

২২. ঐ, "কুলি-মজুর", পৃ. ২৪৬।

২৩. ঐ, "কৃষাণের গান", পৃ. ২৮১।

২৪. ঐ, "শ্রমিকের গান", পৃ. ২৮২।

২৫. ঐ, "ধীবরদের গান", পৃ. ২৮৪।

২৬. ঐ, "রক্ত-পতাকার গান", পৃ. ৩২৯।

২৭. ঐ, "জাগর-তূর্য", পৃ. ৩৩১।

২৮. মুজফ্ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা', ৭ম মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৭।

২৯. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), 'নজরুল রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, অগ্রপথিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২।

৩০. বিস্তারিতঃ হায়াৎ মামুদ, 'প্রতিভার খেলা নজরুল', চেতনা প্রকাশ, মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫৩।

৩১. নজরুল রচনাবলী, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০৩।

৩২. ঐ, ২৫ মে ১৯৯৫, পৃ. ৩৩৩।

৩৩. ঐ, "অগ্র-পথিক", পৃ. ৪৫৩।

৩৪. ঐ, "শূদ্রের মাঝে জাগিয়েছে রুদ্র" ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।

৩৫. দেলওয়ার হাসান, "ইংরেজ আমলের গোয়েন্দা বিভাগে নজরুল চর্চা", দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুন ১৯৯৯ সংখ্যা।

৩৬. নজরুল রচনাবলী, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

৩৭. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১।

৩৮. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৩৯. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯।

৪০. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১৯।

৪১. মাহবুব হাসান, "বিপন্ন বিশ্বের 'উত্তরাধিকার' কবি শহীদ কাদরী", শিল্পতরু পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ১২।

৪২. অরুণ সেন, 'বিষ্ণু দে-র নন্দন বিশ্ব', অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

৪৩. বেগম আকতার কামাল, 'বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯২, পৃ. ৬৯।

৪৪. বিষ্ণু দে, "বৈকালী", কবিতাসমগ্র ১ম খণ্ড, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২২।

৪৫. ঐ, "বহুবড়বা", ঐ, পৃ. ১১০।

৪৬. ঐ, "টুম্বা-ঠুংরি", ঐ, পৃ. ৯০-৯১।

৪৭. ঐ, "নবজগতের নির্মাণে", ঐ, পৃ. ১৭৫।

৪৮. বার্ণিক রায়, 'কবিতা : চিত্রিত ছায়া', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯–৬০।

৪৯. বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।

৫০. অরুণ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৫১. বিষ্ণু দে, "মে দিন", ঐ, পৃ. ১৯৬।

৫২. ঐ, "সন্দীপের চর", ঐ, পৃ. ১৯৩।

৫৩. ঐ, "মৌভোগ", ঐ, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৫৪. অনীক মাহমুদ, আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৩।

৫৫. বিষ্ণু দে, "বৈকালী", ঐ, পৃ. ১১৭।

৫৬. ঐ, "আইসায়ার খেদ", ঐ, পৃ. ১৯৯।

৫৭. ঐ, "৭ই নভেম্বর", ঐ, পৃ. ১৭৬।

৫৮. ঐ, "ঘোড়াসওয়ার", হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৯।

৫৯. বিষ্ণু দে, "২২শে জুন ১৯৪৪", ঐ, পৃ. ১৮৩।

৬০. ঐ, "মে-দিনের গান", ঐ, পৃ. ২৩০।

৬১. ঐ, "পঞ্চমুখ", ঐ, পৃ. ৫২।

৬২. ঐ, "থারকভ", ঐ, পৃ. ১৭৪।

৬৩. অরুণ সেন, ঐ, পৃ. ১৭।

৬৪. সমর সেন, "সাফাই" 'তিন পুরুষ', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৪।

৬৫. ঐ, "ধর্মের গ্লানি", ঐ, পৃ. ২০।

৬৬. ঐ, "ক্লান্তি" 'কয়েকটি কবিতা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৮।

৬৭. ঐ, "যদি কোনো দিন", ঐ, পৃ. ৯।

৬৮. ঐ, "২২শে জুন", ঐ, পৃ. ৩৫।

৬৯. বুদ্ধদেব বসু, "সমর সেন : কয়েকটি কবিতা", 'কালের পুতুল' নিউ এজ পাব:, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৬০।

৭০. অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়' সিগনেট বুকস্, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ২৩৪।

৭১. সমর সেন, "নাগরিক", 'কয়েকটি কবিতা', ঐ, পৃ. ২৮।

৭২. সমর সেন, "নাগরিক", ঐ, পৃ. ২৮।

৭৩. ঐ, "উর্বশী", ঐ, পৃ. ২১।

৭৪. ঐ, "মৃত্যু", ঐ, পৃ. ২৬।

৭৫. ঐ, "যাত্রা", 'গ্রহণ' অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫।

৭৬. ঐ, "ইতিহাস", 'খোলা চিঠি' অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৮।

৭৭. ঐ, "নানা কথা", 'নানা কথা' অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩-৩৪।

৭৮. ঐ, "শব যাত্রা", 'নানা কথা', ঐ, পৃ. ২৮।

৭৯. ঐ, "মহুয়ার দেশে", 'কয়েকটি কবিতা', ঐ, পৃ. ২২।

৮০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "মে-দিনের কবিতা", 'পদাতিক' হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পূর্বোক্ত, ঢাকা, পৃ. ২১৬।

৮১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "ঘোষণা", 'চিরকুট', ঐ, পৃ. ২১৯।

৮২. ঐ, "প্রস্তাব ১৯৪০", 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৮৭, পৃ. ১১।

৮৩. ঐ, "এই আশ্বিনে", ঐ, পৃ. ৪৫।

৮৪. ঐ, "ফুল ফুটুকু না ফুটুক", হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পৃ. ২২১।

৮৫. যতীন সরকার, "'আফ্রিকার কবিতা' পাঠোত্তর ভাবনা : বাংলার কবির কাছে প্রত্যাশা", 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা', মুক্তধারা, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ. ৮৯।

৮৬. ঐ, পৃ. ৮৯।

৮৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "ফুল ফুটুক না ফুটুক", হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।

৮৮. ঐ, "ঘোষণা", ঐ, পৃ. ২১৮-১৯।

৮৯. আবুল কালাম, 'ইউরোপীয় রাজনীতি ও কূটনীতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪।

৯০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার", 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ', পৃ. ৫৬।

৯১. ঐ, "অগ্নিকোণ", ঐ, পৃ. ৭১।

৯২. ঐ, "বর্ষশেষ", ঐ, পৃ. ৬১।

৯৩. ঐ, "সকলের গান", 'পদাতিক' ঐ, পৃ. ৬।

৯৪. ঐ, "একটি কবিতার জন্যে" ঐ, পৃ. ৭৬।

৯৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'সুকান্ত সমগ্র', সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ৪৪ নং পত্র, সারস্বতি লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৩০১।

৯৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "ছাড়পত্র" 'সুকান্ত-সমগ্র', আহমেদ পারভেজ (সম্পাদিত), স্বর্ণালী প্রকাশনী, ঢাকা, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩।

৯৭. ঐ, "ঐতিহাসিক", 'ছাড়পত্র', ঐ, পৃ. ৫৪।

৯৮. ঐ, "শত্রুবক", 'ছাড়পত্র', ঐ, পৃ. ৫৫।

৯৯. ঐ, "বিকৃতি", 'ছাড়পত্র', ঐ, পৃ. ৪৯।

১০০. ঐ, "লেলিন", 'ছাড়পত্র', ঐ, পৃ. ৪৪।

১০১. ঐ, "মনিপুর", 'ঘুমনেই', ঐ, পৃ. ৮৫।

১০২. তদেব, পৃ. ৮৫।

১০৩. ঐ, "মুক্ত বীরদের প্রতি", 'ঘুমনেই', ঐ, পৃ. ৭৯।

১০৪. ঐ, "মৃত্যুজয়ী গান", 'ছাড়পত্র', ঐ, পৃ. ৬১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কবিতায় সমাজ-রাজনীতির ধারা
ও
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান মূলত আজকের বাংলাদেশ। প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গোটা ভারতের জনগণের সুদীর্ঘ সঙগ্রাম ও আত্মত্যাগের একটা খণ্ডিত বিজয় হলো। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পেছনে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাস জড়িত হয়ে রয়েছে, আর অতলে যে বস্তুটি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিরও বাইরে, তা হচ্ছে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিম অর্থনৈতিক বৈষম্য। এ দেশের জনসাধারণের বড় অংশই সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে। উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আর্থসামাজিক কারণেই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। সেখানে সংঘাতের অবস্থাটা বাস্তব যতটা ছিল, পারস্পরিক সংকীর্ণতা ছিল তার চেয়ে বেশি। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অভাব এবং ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়া সত্ত্বেও নেপথ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে ভেঙে দেয়া আর সামরিক শাসক আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। পূর্ব-পাকিস্তান পরিণত হয় পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে। তারপর কীভাবে এই পরিস্থিতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, যেমন ভাষা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, চাকরির অনুপাত নিয়ে অসন্তোষ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ইসলামি ভাবাদর্শ, সামন্ত মূল্যবোধ এবং অখণ্ড পাকিস্তানি বা জাতীয়তাবাদী চেতনা। তীব্র এক নৈরাজ্য এবং বিভ্রান্তির মুখে পড়লেন কবি, বুদ্ধিজীবীগিণ।

'মুসলমান স্বাতন্ত্র্যে'র বিভ্রান্তির কবলে পড়ে 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' গঠনের সাম্প্রদায়িক চোরাবালিতে পা রেখেও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা এবং সাতচল্লিশ উত্তরকালে পূর্ব-বাংলা, এর নেতৃবৃন্দ ও জনমণ্ডলি নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের ভেতর দিয়ে এযাবৎকার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক শোষণমুক্তি, সমতা ও ন্যায়ানুগ বন্টন এবং পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাঙালির নেতৃবর্গ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও কৃষক সাধারণকে প্রতারণা করে, তাদের সকল প্রত্যাশা গুড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের আভ্যন্তরিণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত দ্বিবিধ শোষণের খপ্পর থেকে নিস্কৃতি লাভের বাসনায় গোড়া থেকেই

বাঙালিরা অর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক শোষণমুক্তি, শ্রেণীপীড়ন মুক্তি, রাজনৈতিক যথার্থ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্যে বিক্ষোভ প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে একের পর এক, একটানা। এক বৃটিশ শাসনামলেই বাংলাদেশে শতাব্দীকালেরও বেশি কৃষক অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। তার উপর বিশ শতকের বিশের দশকে ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রসার ঘটে; জমিদারি উচ্ছেদের পরিকল্পনা এবং 'লাঙল যার জমি তার' ইত্যাদি র‍্যাডিক্যাল চেতনা বিদ্যমান ছিল। চল্লিশের দশকের মাঝ নাগাদ সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে এসব চিন্তা চেতনা খানিকটা চাপা পড়ে গেলেও এগুলো অন্তঃসলিলা ছিল; একটা স্রোতধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলার রাজনীতিতে, এর অগ্রসর মানবগোষ্ঠির চেতনায় ফল্গুধারার মতোই প্রবাহিত ছিল। তাই সাতচল্লিশ পরবর্তী ভাষা আন্দোলন এ দেশের গণমানুষকে সাংস্কৃতিক চেতনায় জাতিসত্তা চিহ্নিত করার প্রেরণা যুগিয়েছে। এ দেশের মানুষ মাতৃভাষাকেই ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার আকর ভেবে নিয়েছে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে প্রতিবাদের তীব্রভাষা ব্যবহার। কবিতা পেয়েছে নতুন মাত্রা। অথচ কাব্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে আইয়ুবের কালো দশক শুরুর (১৯৫৮) পূর্বপর্যন্ত বাংলায় দেখা গিয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্দীপ্ত কবিতার জোয়ার। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটতে থাকে, মূলত তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। এঁদের একটা অংশ নিজেদের কবিতা নিয়ে প্রকাশ করলেন 'নতুন কবিতা' নামক সংকলন। পরে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণাম হিসেবে প্রকাশ পায় 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামক আরো একটি সংকলন। এ দু'টি সংকলনই ধারণ করে আছে পঞ্চাশের নতুন কবিদের সৃজনশীল রচনাবলি। যা পশ্চিম বাংলার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। 'কবিতা', 'পরিচয়', 'সাহিত্যপত্র', 'চতুরঙ্গ'কে ঘিরে তখন সমবেত হয়েছিলেন নানা শ্রেণীর কবি, যাঁরা ছিলেন সমাজবাদী। 'আরো কবিতা পড়ুন' এই আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অনেকে পথে পথে। সেই তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানে চল্লিশের বা পঞ্চাশের প্রজন্মের কবিরা গড়ে তুলতে পারেননি কোনো কাব্য-আন্দোলন। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্যক্ষেত্রে এ সময় একটা ভাবাবহ সক্রিয় হচ্ছিল, তা হলো একটি সমাজ সচেতন মনোভঙ্গি–

> কবিরা যে বিষয়কে অবলম্বন করুন না কেন, তাঁকে মূলতঃ সমাজ-সচেতন হতেই হয়। কেননা, যে মানুষের কথা তাঁরা বলবেন এবং সে-কথাকে পরিস্ফুটিত করবার জন্য যে শব্দগুলো তাঁরা ব্যবহার করবেন সে মানুষ ও শব্দ তাঁদের পরিচিতি পরিমণ্ডল থেকে এবং তাঁদের প্রতিদিনের পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করতে হবে। একজন কবিকে এই সচেতনতার মধ্যেই বাস করতে হয়। তা না হলে তিনি মহৎ কবি কিংবা সুন্দর কবি কখনও হতে পারেন না।[১]

এ সময়ের কবি আবুল হোসেন (জ. ১৯২২), আহ্সান হাবীব (১৯১৭-৮৫) ও হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-৮৩) নাম করা যায়। আবুল হোসেন স্বাভাবিক কবি। তাঁর কোনো কবিতাই দীর্ঘ নয়; কেননা দীর্ঘ কবিতায় শিথিল বিন্যস্ত, অসংলগ্ন এবং অতিকথন থাকে। যা কবিতার জন্য ক্ষতিকর। তাঁর মনন জনতান্তর থেকে কখনো আলাদা নয়। তিনি সতত সমাজ সচেতন। তাঁর প্রত্যয় সাধারণে মিশে যাওয়া। 'জেনেছি, সত্য বহুদিন মনে মনে/ মুক্তির পথ মিশে গেছে জনগণে'। 'পদাবলী স্মরণিকা'য় তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও দিয়েছেন– 'মানুষ আর সমাজ নিয়েই আমার সব ভাবনা-চিন্তা। প্রকৃতি আমাকে আকর্ষণ করেনা, তা নয় তার সীমাহীন বৈভবে, বৈচিত্র্যে বার বার বিস্মিত, মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত হয়েছি। তবু আমার আজীবন উৎসাহ মানুষকে নিয়ে' সেজন্য কবি সমকালিন সমাজ প্রেক্ষাপটে নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান– 'আমরা বিদ্রোহী নই/ আমরা ক্ষুধার্ত/ ডাল ভাত রুটি আলো হাওয়া আর একটু আশ্রয়,/ আপাতত আর কিছু নয়।'[২] এটা এমন একটা সময়– জীবন বিমুখ শিল্প সর্বস্ব সাহিত্য নয় আবার শিল্পকে অস্বীকার করে কেবল জীবনের কাঁদা মাটিকেই শিল্প বলে তুলে ধরা নয়; এই মেরুকরণে আধুনিক বাংলা কবিতার যে ধারাটি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বেরিয়ে এলো, তাতে পশ্চিম বাংলার সমরসেন (১৯১৬-৮৭), দীনেশ দাশ (১৯১৩-৮৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (জ. ১৯১৯) নামের সঙ্গে পূর্ব বাংলার আবুল হোসেন ও আহ্সান হাবীবের নাম যোগ করা যায়। তবে আবুল হোসেনের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে মিশে আছে গার্হস্থ্য প্রশান্তি।

রোমান্টিক বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে আহ্সান হাবীব এ সময়ে কবিতায় প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জ্বল এবং আশাবাদী। বাস্তব জীবনের সাথে কবির যোগ নিবিড় এবং তাঁর মন সমাজমুখী। আধুনিক অন্য যে কোন মুসলিম কবির চেয়ে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বেশি এবং সংস্কারমুক্ত। উত্তাল ও রক্তাক্ত আকাল সময়ের কবি আহ্সান হাবীব, সেজন্য প্রাগ্রসর দৃষ্টি এবং সাহ্সী জীবনজিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। তবে আহ্সান হাবীবের চেয়ে সমকালীন কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) আরো স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সরাসরি। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি হচ্ছেন হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩)। 'দ্বিধাপন্ন মানুষের যন্ত্রণা এবং উজ্জীবন-আকাঙ্খা যুগপৎ তীক্ষ্ণ তরবারির মতো ঝলসে উঠলো হাসানের রচনায়'।[৩] বাংলাদেশের মার্কসীয় সাম্যবাদী চিন্তা ত্রিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যে সব কবিদের আলোড়িত করেছে হাসান হাফিজুর রহমান তাদের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবিদার। সব্যসাচী হাসান বিকৃত সমাজে বিপ্লবী কবি বরাবরই অস্বীকার করেছেন মেকি দেশপ্রেমকে এবং মিথ্যে গণতন্ত্রের আস্ফালনকে। মাটি ও মানুষের নিবিড় আত্মিক পেষণা থেকে কর্ষিত তাঁর কবিতা। সমাজ-রাজনীতির সাংঘর্ষিক উৎকর্ষতায় তিনি কবিতার ভাষ্যকার। 'সংগ্রাম চলবেই' সিকান্দার আবু জাফরের এই আপোষহীন উক্তিই একাত্ম করেছে তাঁর চেতনালোক। হাসানের মতোই সমান্তরাল প্রেরণায় আব্দুল গণি হাজারীর (১৯২৫-৭৬) কবিতায়ও উপজীব্য

হয়ে উঠলো বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোগত মধ্যবিত্তের বিকাশ ভাবনা। সব মিলিয়ে পশ্চিম বাংলার তিরিশ ও চল্লিশের কবিদের সাথে সামান্য সাযুজ্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় যে তার স্পন্দন জেগেছিল, সমকালিন বাস্তবতা ও রাজনীতির অস্থির চিত্ততার পরিহাসে উন্মুখর হতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

(২)

চল্লিশের দশক থেকেই বাংলাদেশের কবিতা বঙ্গভঙ্গ এবং জাতিসত্তার প্রশ্নে রাজনীতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকেই। তখন থেকেই ভাষা-সাত্ত্বিক প্রশ্নেই বাংলাদেশের কবিতা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে রাজনীতির সঙ্গে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, রাজপথে ছাত্রজনতার মিছিল, মিছিলে গুলি এবং পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত বাংলার রাজপথ ইত্যাদি ভাষা আন্দোলনের ভয়াবহ ঘটনা। শহীদ হন– রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও নামহীন আরো অনেকে। হাজার বছরের ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। এ সময় মূলত রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে কবিরা বিভক্ত হয়ে পড়লেন বিভিন্ন শিবিরে। সেসব কবিরাই মানুষের ভালোবাসা পেলেন, যারা সময়ের সাহসী প্রকাশ ক্ষমতায় ছিলেন উন্মুখর। এই পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশের প্রথম সারির কবি শামসুর রহমান (জ. ১৯২৯), আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬), শহীদ কাদরী (জ. ১৯৪২) প্রমুখের উত্থান। তবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। সম্পাদক হিসেবে হাসানের সাহসী পদক্ষেপ ছিল অসাধারণ। সেই ১৯৫২ সাল শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা; যাতে বাঙালির রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনার পালাবদল ঘটেছে এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ঊনসত্তরের উত্তাল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একুশকে স্মরণ করেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্দীন (১৯০৪-৭৬)–

ঘুমাও ঘুমাও ভাইরা মোদের
ঘুমাও মাটির ঘরে
মতিউর গেছে আসাদ গিয়াছে
জহিরুল গেছে আর,
রক্তজবায় সাজায়েছে তারা
চরণ যে দেশ মার,[৪]

একুশকে ঘিরে আমাদের সুপ্ত চেতনার নতুন প্রাণের স্পন্দনে কবি হাসান হাফিজুর রহমান লিখলেন–

ঢাকা আমার, আমার আপন শহর,
ফেব্রুয়ারীর ঢাকা আমার, বুকের এতো
কাছাকাছি মনে হয় তোমাকে আমার।
আপন শহর আমার, ফেব্রুয়ারীর ঢাকা আমার
এমন বুকের কাছাকাছি চিরকালে তুমি কখন হবে?
শহীদের রক্তধারার প্রতিটি বিন্দু
বুক পেতে ধারণ করে আছে, একটি ফোঁটাও
দাওনি অযথা হতে।[৫]

একুশ সাহস যুগিয়েছে, প্রাণের বিনিময়ের মাধ্যমে কাঙ্খিত বস্তু ছিনিয়ে আনার প্রেরণা দিয়েছে, বাঙালির স্বাধীকার সত্তায় সুপ্ত চেতনার বিস্ফোরণ জাগিয়েছে। তাই কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ (জ. ১৯৩২) বুলেটের ভয়ে আর ভীত নন– 'বুলেট শুধু/ রক্ত ঝরাতে পারে/ প্রাণ অথবা/ এমন কিছুই/ নয়।/ তুমি কি ভেবেছ/ পেয়েছি ভয়?/ যখন তোমার/ গুলীটি আমার/ বুকে লাগলো?/ মোটেই নয়।'[৬] বাঙালির সমস্ত বাধা-বিপত্তি, মারি-মহামারি, দুর্ভিক্ষ, নৈরাজ্য– সব কিছুতেই চোখ খুলে দেয় একুশের প্রেরণা। সেই রক্তিম দিনের স্মৃতি জাগুরুক থাকে সমস্ত বিপদে-আপদে, কবি শামসুর রাহমান–

আমার এ অক্ষি গোলকের মধ্যে তুমি আঁখি তারা,
যুদ্ধের আগুনে,
মারির তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে
বার বণিতার
নূপুর নিক্বণে,
বণিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে,
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজ্যের এলো
ধাবাড়ি চিৎকারে,

সৃষ্টির ফাল্গুনে
হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আজো সগৌরবে মহীয়সী।[৭]

একই বাসনা ব্যক্ত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহর (জ. ১৯৩৬) এ কবিতায় :

তোমার প্রতিটি শব্দ ছন্দ-ধ্বনি-লয়
আমার চৈতন্যে আছে, আছে মনোময়
অস্তিত্বের উচ্চারিত প্রতি প্রহার
আমার আকাঙ্খা দীপ্ত তোমার অক্ষরে
প্রেমের সংলাপে আর মৃত্যুঞ্জয়ী গানে
সংঘবদ্ধ আন্দোলনে মিছিলে শ্লোগানে
অনির্বাণ হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল শপথে।[৮]

আবার এই রক্ত কলুষিত হয়, ফায়দা হাসিল করে ঠুন্‌কো রাজনীতিক, ঐক্যবদ্ধ জনতাকে ভুল পথে চালিত করার উত্তপ্ত প্রেরণাদায়ী এ মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে; আসাদ চৌধুরীর (জ. ১৯৪৩) কবিতায় তাদের প্রতি আছে ধিক্কার :

হে বায়ান্নর পদাতিক,
তোমাদের কথাকে কেউ হত্যা করতে পারবেনা
তোমাদের দেহ থেকে নিপুণ জল্লাদ
একটি লোমও ফেলতে পারবেনা।
আমি আমার রক্তময় শরীর নিয়ে মৃত
সজীব জিভ নিয়ে বোবা,
লোভ লালসাময় প্রাণ নিয়ে ভোগের আশায়
আত্মাকে উলঙ্গ করি বিলায়ে দেহ,
আমার রক্তে বাস করে অকৃতজ্ঞ শয়তান,
আমি ওদের ত্যাগকে নিয়ে রাজনীতি করি।[৯]

(৩)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় ধনিক-বণিক-ভূস্বামী এবং অভিজাত মুসলিমের সংগঠন মুসলিম লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম ঘটালো, তাতে প্রথম থেকেই পাকিস্তানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে গঠিত ও পরিচালিত হতে থাকলো যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-বাংলার রাজনীতি, প্রশাসন, শিল্প-সাহিত্য, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই এমন কোন ভূমিকা রাখতে পারলো না, যার দ্বারা এ বাংলার স্বাধীন সত্তা অথবা উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভের সম্ভাবনা থাকবে। তার উপর মুসলিম লীগের শ্রেণীচরিত্র হলো সামন্তবাদী পীরজাদা, নবাবজাদা, সাহেবজাদা, সৈয়দজাদা, খাঁ সাহেব প্রভৃতি ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সংগঠনটি সংগত কারণেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে হিংস্র হায়েনার মত মানুষের রক্তচোষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পূর্ব-বাংলার নিরাপত্তাহীনতা, বাঙালি মধ্যবিত্তকে আরো সচেতন করে তুললো। এই সময় রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়, আর এই সূত্র ধরে কবি-সাহিত্যিকরা আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। 'সমকাল' পত্রিকা ধীরে মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত-যুক্তিনিষ্ঠ-প্রতিবাদী লেখনী জনসাধারণে সচেতনতা সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটায়। বাঙালি জাতীয় নেতাও পেয়ে যায় এবং দলমত নির্বিশেষে বাঙালি তার স্বাজাত্যবোধে উজ্জীবিত হয়। তাছাড়া বাংলার তে-ভাগা আন্দোলনকে ঘিরে বাঙালির মনে মার্কসীয় চেতনার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। তে-ভাগা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম গণচেতনার বহিঃপ্রকাশ।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তে-ভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন ইলামিত্র। সাঁওতালদের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কবি গোলাম কুদ্দুসের (জ. ১৯২০) 'বিদীর্ণ (১৯৫০) এবং 'ইলামিত্র' (১৯৫৪) কাব্য দু'টি তখন গণমানসে মার্কসীয় সাম্যবাদের সংগ্রামী চেতনাবোধ সঞ্চারিত হয় এবং বিপ্লবী প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। "ইলামিত্র কবিতার একটি দৃষ্টান্ত :

> ধানকাটা নাচোলের মাঠে
> বুলেটের বৃষ্টিতে রক্ত ঝরে
> নাচোলের শস্যশূন্য মাঠে
> পূর্ণ হলো কৃষকের লাশে!
> ইলামিত্র কৃষকের প্রাণ!
> ইলামিত্র ফুচিকের বোন!
> ইলামিত্র স্ট্যালিন নন্দিনী![১০]

পঞ্চাশের দশকে কবিতায় নতুন ভাবের জন্ম নিল এবং তা হলো মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী প্রেরণা। সমাজ-রাজনীতি সচেতন কবিদের কবিতায় মানবতাবাদ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিবাদী মন, পরাজয় চেতনা, ভাববাদ-বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনুষঙ্গ দেখা গেল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও নাচোলের কৃষক বিপ্লবে পূর্ব-বাংলার কবিতা মুক্তির আকাঙ্খায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র (জ. ১৯৩২) কুঁচবরণ নারী হয়ে ওঠেন স্বদেশ প্রতীকে– পাকিস্তানী স্বৈরশাসনে বীভৎস বাংলার স্বরূপ :

কুঁচবরণ কন্যা তোমার
মেঘবরণ চুল,
চুলগুলো সব ঝরেই গেলো
গুঁজবো কোথা ফুল।[১১]

এ সময় হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩) একটা সংগ্রামী সময়কে ধারণ করে অপরাজেয় সৈনিকের মতো বাংলা কবিতার ক্ষেত্র পরিসরে চাইলেন মানুষ, সমাজ ও শিল্পের সমন্বয় ঘটাতে। সমাজ ও মানবিক এষণায় তিনিই প্রথম চৈতন্যেজাগর কবি। ক্রান্তিকাল ভেদ করে স্বদেশের মুক্তির বাসনায় আলোর নেশায় সারাক্ষণ তাড়িত হাসান আমরণ যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত। যুদ্ধের দাবানলের মতো তাঁর উচ্চারণ সমস্ত অসত্য-মেকিকে অতিক্রম করে শাশ্বত কবিতারই জয় ঘোষণা করে বার বার। তাঁর কাঙ্খিত সমাজ রূপরেখা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানের মধ্যে শোষক শ্রেণীর চরিত্র আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। জরাগ্রস্থ সমাজ পরিবর্তন করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় হাসান ভৌগলিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাকেই ইংগিত দেন এবং নিজেই সংগামী পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভাঙ্গার দীপ্ত শপথকারী হাসান প্রবল প্রতাপে বাংলা কবিতায় একটা প্লাবন বইয়ে দিলেন। "স্বদেশ পরিব্রাজক" কবিতায় বলেন–

ইবনে বতুতার চোখে কি স্বপ্ন উঠেছিল ফুটে
নীল নদ মিছে হল তার কাছে
বাংলার নদী জলে;
বার্নিয়ের ভুলে গেল স্বদেশের যশোগাথা,
পলিমাটি-পদাবলী তার দৃষ্টি দিল ভরে।
ইবনে বতুতা নই আমি, নই বার্নিয়ের
তবুও পর্যটক আমি এক আমারই স্বদেশে।[১২]

ষাটের দশকে বাংলা কবিতায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরো ঘণীভূত, স্বাধীনতার বীজ বপনে এ দশকের মূল্য অপরিসীম, কেননা এ দশকেই ঘটে বাঙালির গণআন্দোলনের পটভূমি এবং পরিণামে একাত্তরের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলো এবং পাকিস্তানিদের বৈষম্য ঘুচিয়ে দিতে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবি। বাঙালির এই অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করলো। অরাজকতা, হত্যা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, হতাশাময় বাঙালির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে স্বদেশ ভাবনা। সামাজিক প্রতিরোধের জন্য কবিতার চরণে চরণে দেশের বীভৎস রূপ তুলতে কবিরা বদ্ধ পরিকর। খরা, বন্যায় অতিষ্ঠ গণমানুষের কাছাকাছি কবিরা দাঁড়ালেন– 'আজ একি অভিশপ্ত খরা/ মা তোর সোনার ধানে/ সিন্ধু পারে ভাগুভরা/তোর ছেলে উপবাসী।'[১৩] ফজল শাহাবুদ্দিন (জ. ১৯৩৬) শস্যহীন দেশের চিত্র আঁকেন, সেই সাথে মুক্তির নিশানা :

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে। হাওয়ায় ওঠেনা
দুলে রাশি রাশি তৃপ্তির শিখার মতো
স্বর্ণরঙ শস্যকণা আর
খামারেতে নেই নেই আকাঙ্খার সম্পন্ন শরীর
এবং ইদানীং
ক্ষুধার পতাকা এক উড়ছে শুধুই
বিরাট আকাশ জুড়ে আশ্বিনের সুনীল ললাটে[১৪]

হুমায়ুন কবিরের (১৯৪৮-৭২) কবিতায় বাংলাদেশের সাথে কারবালার তুলনা চলে আসে এবং শাসকের খঞ্জরে ক্ষত-বিক্ষত হয় বাংলাদেশ; তার চিত্র :

কারবালা হয়ে যায় সমস্ত বাংলাদেশ হায়!
কারবালা হয়ে যায়।
নিস্পত্র সমস্ত বৃক্ষ, তৃণহীন প্রান্তর হা হা করে,
জল নেই, জল নেই, কান্না ফাটা শিশুদের গ্রীবা
চতুর্দিকে ঝলসায় কৃতান্ত সীমার,
ভীষণ খঞ্জুর তার বিদ্ধ করে এই বাংলার
আমাকে অন্যকে; আর জননীকে
ভীষণ যন্ত্রণা দেয়, দুঃখ দেয় শুধু।[১৫]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যগত কারণে পূর্ব বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়, সেজন্য আজ বাংলার জনগণ সর্বাত্মক সংগ্রাম এবং আত্মহুতির জন্যও প্রস্তুত। ঠিক তখনি ছ'দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যই শেখ মুজিব (১৯২০-৭৫) এবং জাতীয়তাবাদের সমর্থক সেনাবাহিনী বাঙালি সদস্য এবং উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কয়েকজনকে জড়িয়ে শুরু হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা ভারতের সহযোগিতা নিয়ে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জাতিগত নিপীড়নের শিকার বাঙালি তা বিশ্বাস করলো না, ফলে শুরু হয়ে যায় গণ-আন্দোলন। হরতাল, সান্ধ-আইন ভঙ্গ, সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ, বিক্ষোভ মিছিল, গুলি চালনা, নির্যাতন– ঢাকা ও প্রতিটি শহর উত্তাল হয়ে ওঠে এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই ১৯৬৯ সনে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ঝরতে থাকে। শামসুর রাহমানের কবিতার দু'টি দৃষ্টান্ত–

ক. বুঝি তাই উনিশ শো উনসত্তুরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে শূন্যে তোলে ফ্লাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে
সালামের বুকে আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা–
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্ত দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবে বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।[১৬]

খ. গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।
... ...

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে এক খণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[১৭]

ষাটের দশকে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় ফুটে উঠলো সমকালীন জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, রাজনৈতিক ঐক্যহীনতা, আত্মসংকট এবং নৈঃসঙ্গবোধ। এক নষ্ট সময়ের জালে বন্দী কবি: তার উপর তার নিকটতম অনেক বন্ধু অন্তরালে গা ঢাকা দিয়েছে এবং জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশ্চিমা শাসকদের সুরে কথা বলা শুরু করেছে কিন্তু হাসান এই মিথ্যাচার মেনে নেননি এবং কোনো অশুভ জোয়ারে ভেসে যাননি– 'ওরে কাপুরুষের মতো/ আমি পালাবো না এ দৃশ্য মায়াবী দানবের/ যান্ত্রিক সম্মোহনের সন্ত্রাসে দিশেহারা/ আমি আবার দশ আঙুল ডুবিয়ে/ দেব তবু এই পাষাণ মাটিতেই/ আমার শিরা-উপশিরার সহস্র শিকড়।'[১৮] 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' (১৯৭২) কাব্যে তিনি মুক্তি সংগ্রামের অনুভবে অস্তিবোধের চৈতন্য লাভ করেন; সমকালীন সমাজ-রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তীব্র জটিল রক্তক্ষত পথ বেয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে যান :

আশ্চর্য সুগন্ধ মুক্তি আসে ভেসে হাওয়ার আভাসে,
নবান্নের মদির ঘ্রাণের চেয়েও প্রাণজয়ী মনোহর।
যেন বা রূপকথার অভিশপ্ত রাজপুত্র আমরা সবাই
একে একে আবিল খোলস খুলে
অজগর শরীর থেকে দিব্য দেহে ফিরে যাই।[১৯]

সমাজের উচ্চবিত্তদের নিয়ে পরিহাস করেছেন কবি আব্দুল গণি হাজারী (১৯২৫-৭৬), তাঁর কবিতায় সেজন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আক্রমণ এবং করুণার চিত্রই প্রধান। সামরিক আপশাসন এবং বিরাজমান শোষণে আক্রান্ত জনপদের মুক্তি বাসনায় কবি গণআন্দোলনে শামিল হলেন–

গণ বিস্ফোরণে মুহুর্মুহু আমরা
জনাক্রান্ত[২০]

তারপরও কবির আত্মসংকটবোধ থেকেই যায় :

জল্লাদ রাত্রির নির্মোক ছেড়ে
মিছিলের পুরোভাগে তুমি
সোচ্চার ব্যানারের মালিক
তোমার নাম না শুধিয়েই
তোমার শ্লোগানে বন্ধুর বিশ্বাস রাখি
অথচ সুশ্যামল তৃণের ছায়ায়
অব্যর্থ বিষের সবুজ
সাপের মত নিশ্চিত
নিশ্চিত।[২১]

এ সময়ের কবিতায় পাকিস্তানি শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা, সামরিক অপশাসনে দেশের অর্থনৈতিক দৈন্য, বন্যা-খরায়পীড়িত জনজীবন দুর্বিসহ এবং ব্যক্তি-সামাজিক আত্ম সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কবিরা পাকিস্তানি শাসনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক চালালেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. একি জাদু দেখলাম হায় একি ভেলকি
দুদিনেই গুদামের বুকগুলা হালকা
রাস্তার আশে-পাশে নামে কালো রাত্রি
বস্তারা সেই ফাঁকে কোথা করে যাত্রা।
মোদের হাতের চটের থলি
খালি থাকতেই পায় আরাম
আরাম দিলেন উজির সাহেব
বেঁচে থাকুক তাহার নাম ॥[২২]

খ. চালনেই ঘরে গাম নেই ক্ষেতে পশ্চিমে পুবে কোনখানেই।
ঘুম ভেঙে শুনি টাকাও নেই।
রাতারাতি সব তবিলখালি,

তুলো আর পাট চামড়া বেচতো সে গুড়ে বালি।

... ...

এদিকে হাজার হাতির খোরাক চাই রাজার

উজির যাবেন নাথিয়া গলি,

লে আও হাওয়াই জাহাজ, লে আও টাকার থলি;

সফর করতে লাট আসেন

ভক্তরা সব কামান দাগেন ডিনার দেন।

টাকা দেবে তো সে গৌরি সেন।[২৩]

গ. ধন্য রাজা ধন্য,

দেশ জোড়া তার সৈন্য!

পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল!

চাষীর গরু, মাঝির হাল

ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,

সাত মহলা আছে বাড়ি,

আছে হাতি আছে ঘোড়া,

কেবল পোড়া মুখে পোরাব

দুমুঠো নেই অন্ন,

ধন্য রাজা ধন্য![২৪]

আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫) এ সময় সামাজিক বাস্তবতায় জীবনের কাছাকাছি প্রত্যক্ষ অনুভবে অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ কিছুটা আত্ম সংকটে ভোগেন, দেশের অশান্ত-অস্থির রাজনীতির করাতে খণ্ডিত হতে থাকেন, সমগ্র জনতার বেদনা, নিরাশার জাল ছিন্ন করে তিনি নানা মানুষের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ তোলেন। এখানে আর সংকট থাকেনা, দেশের স্বাধীনতার জন্য আর নমনীয়তা নেই– এবার সাম্যের লড়াইয়ের পতাকা :

আমি কবি হতে চাই–

প্রত্যেকটি অনুচ্চারিত পিপাসার।

আমি কবি হতে চাই দারিদ্র্যের

এবং বিত্তের।

বিত্তের মুখের কদর্যতার,
দারিদ্র্যের দুঃখের শক্তির।
আমি কবি হতে চাই বিপ্লবের
এবং শান্তির, ধর্মের এবং
নাস্তিকতার।
... ...
আমি কবি হতে চাই আশ্চর্য দেবতার
এবং লোভী জানোয়ারের, গায়কের ও
কোদালের, সশ্রম হাতের এবং
মিলিত কণ্ঠের।[২৫]

আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬) সমস্ত হাতাশা ঝেড়ে ফেলে সমাজ, সমকাল চেতনায় উজ্জীবিত–

ধ্বংস যদি করবে তবে, শোনো, তুফান
ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের
পরের শ্রমে গড়ছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহাদুরি গুড়িয়ে ফ্যালো।[২৬]

আল মাহমুদের 'কালের কলস' (১৯৭৩) ও 'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩) কাব্যে সমাজচৈতন্য ও সাম্যবাদী অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা গেলেও কবির পরবর্তী কাব্যগুলো সংকীর্ণ ভাবধারায় আচ্ছন্ন। আহসান হাবীবেরও মার্কসবাদী অনুষঙ্গ কিছু থাকলেও কবি উচ্চকণ্ঠি না; নম্র ও পরিশীলিত এবং মার্জিত প্রতিবাদে তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। সমাজজীবন এবং পৃথিবীময় বিশৃঙ্খলার দ্বান্দ্বিক কোলাহল তাঁর কবিতায় বিনীত প্রতিবাদে ভাস্বর। বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০-৮২) সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকলেও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা তাঁকে ততোটা আলোড়িত করেনি। দ্বিতীয় মহাসমর পরবর্তী উত্তপ্ত সময়ে তাঁর কবিতায় কিছুটা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে 'গোলাম কুদ্দুস মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে শ্রেণী সংগ্রামকে চিহ্নিত করতে চাইতেন কবিতায় অথবা যে অর্থে বিমলচন্দ্র ঘোষ পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দেশগুলোকে আক্রমন করাকেই কবিতা মনে করতেন, আহসান হাবীব সে অর্থে মার্কসীয় বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। বিমলচন্দ্র ঘোষতো প্রজাপতির রঞ্জিত চিত্রিত পাখনায় পর্যন্ত প্রলয়ের বরাভয় দেখতেন।[২৭] আহসান হাবীবের 'মেঘবলে চৈত্রে যাবো' কাব্যটি সমকালীন পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ গণআন্দোলন এবং মুক্তযুদ্ধকালীন উত্তপ্ত প্রবাহেও সমস্ত বিশৃঙ্খলার একটা সুস্থ্য ও আত্মনিমগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা তিনি মনে প্রাণে চান, কিন্তু হত্যা-রক্তপাতের ভেতর

দিয়ে নয়; তিনি বরাবর সন্ত্রাস ও নৃশংসতা পছন্দ করনে না, সেজন্য সংগ্রামে ও বিপ্লবেও তিনি কোমলতার পক্ষপাতি, এবং সৌন্দর্য্যের পূজারী; সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার ভাব থাকে।

সে তুলনায় সাইয়িদ আতিকুল্লাহর (জ. ১৯৩৩) কবিতা বেশি সমাজ চেতন এবং ধারালো বক্তব্যে শানিত–

কয়েক ডজন তাজা বোমা আর
শ'দেড়েক ছিমছাম ডিনামাইটের কাঠি
বটতলা নামক বিখ্যাত রাস্তার মোড়ে
সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে এসেছি। আজ
বিকেল বেলায় সলতের মাথায় আগুন দেবো ঠিক করেছি
রাস্তার ও মোড়টিকে আমি উড়িয়ে দেবো
ইতিপূর্বে ঠিক একই ভাবে উড়িয়েছি আরও জাঁদরেল
কয়েকটি রাস্তার মোড়। পৃথিবীতে যেখানে যতো
রাস্তার মোড় আছে সবক'টিকেই আমি উড়িয়ে দিতে চাই
শুনেছি কোনো একটি রাস্তার মোড়েই
উৎপেতে আছে, নিপুন শিকারী
তাকে দেখবার, জানবার, বুঝবার, দরকার নেই আদৌ আমার।[২৮]

যে গভীর দ্যোতনা এবং সামাজিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-৮৫) কবিতায় সাম্যবাদের জন্য শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধারালো হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল; বাংলাদেশের উত্তাল সময়কাল অর্থাৎ ষাটের দশকেও পরিপূর্ণ সাম্যবাদী মতাদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি কোন কবির রচনায়। সমাজ-রাজনীতি নির্ভর এবং সমকাল উত্তাল ব্যক্তি-সমাজ সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে মাত্র। হাসান হাফিজুর রহমানের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এ চেতনা কার্যকরী ছিল। সত্তর দশকে আমরা সাম্যবাদী চেতনার উজ্জীবন দেখতে পাই; সে আলোচনাতেই এখন যাবো।

(৪)

সত্তর দশকের কবিতার প্রধান চরিত্র হচ্ছে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার উদ্বুদ্ধকরণ। সমকালীন সমাজ ও চলমান জীবনবোধ একজন সচেতন কবি মাত্রেরই অনুশীলনের বিষয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটের উত্তপ্ত দাবিকে কোনো বিবেকবান কবি উপেক্ষা করতে পারেন না। কবিও আর দশজনের মতো মানুষ, তবে তিনি আরো

বেশি সচেতন মানুষ। কোনো চিন্তাশীল কবি বুদ্ধিদীপ্ত কবি, যুগ সচেতন কবি জাতির ক্রান্তিলগ্নে অসহায় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে পুতুলের মতো নীরব থাকতে পারেন না। সমাজ কাঠামোগত উদ্ভুত মানুষের দুঃখ-বেদনা, ক্রোধ, হিংসা, নিপীড়ন-অত্যাচার প্রভৃতি কবিকে প্রতিবাদী এবং রাজনীতি মনস্ক করে তোলে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরে বাংলা কবিতায় সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ এমনভাবে এলো যে, মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে এ দেশের প্রায় সকল কবিই ইসলামি ভাবধারা, নয় মানবতাবাদী ধারায় বিভক্ত হয়ে চলমান অস্থিরতার অবসান চাইলেন। ইসলামি ধারার নেতৃত্বে ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) ও সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) এবং শেষোক্ত ধারায় হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫), আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), আবুল হোসেন (জ. ১৯২২) প্রমুখ কবিগণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমরা দেখেছি ভাষা সাত্ত্বিক প্রশ্নে এবং 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলনের মাধ্যমে কবিরা তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গের বহুমুখী নির্যাতন-নিষ্পেষণ প্রত্যক্ষ ও প্রতিরোধ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন অনেক কবি সাহিত্যিক। সত্তরে এসেও এঁদেরই আধিপত্য ছিল বেশি।

একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আচরণ ও হত্যাযজ্ঞের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাঙালি তরুণ সমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন 'অভিযোগ' নামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। শাসকশ্রেণীর রক্তচক্ষুর কারণ হয়ে দাঁড়ালেন কবি এবং এক সময় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ধরার জন্য তৎপরতা চালালে কবি ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এ সময়ের তাঁর কবিতা সম্মিলিত আক্রমণের হাতিয়ার ও তীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্ধ করে পাকিস্তানি শাসনের মর্মমূলে। দু'টি দৃষ্টান্ত :

ক. রক্তচোখের আগুন মেখে ঝলসে-যাওয়া
আমার বছরগুলো
আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,
কাজকি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি!
আমার হাতেই নিলাম আমার
নির্ভরতার চাবি;
তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া,
তুমি বাঙলা ছাড়ো।[২৯]

খ. কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের
লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা,
জরামারীজীর্ণ ভাগ্যবিদীর্ণ
জেলে-তাতী মাঝিদের বাঙলা।
শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা
পীড়িতের জননী বাঙলা
... ...
ভেঙে যাবে দস্যুর শত ষড়যন্ত্র
জনগণ বাঙলার পারে গণতন্ত্র
দুর্বার ছেলেদের দুর্জয় মন্ত্র
জয় জয় জননী বাঙলা।[৩০]

'সংগ্রাম চলবেই'– সমকাল সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের এই আপোষহীন শৃঙ্খল ভাঙার উক্তি একাত্ম হয়ে আছে হাসান হাফিজুর রহমানের দেশকাল চেতনায়। 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' হাসানের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্য। –এ কাব্যেই হাসানের পরিপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক অবস্থান এবং শোষকের আন্তর্জাতিক চরিত্রের বিকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। সমস্ত দুর্যোগ পেরিয়ে স্বাধীনতার তোরণে পৌঁছাবার একটা সামগ্রিক সত্তার উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়। জরাগ্রস্থ সমাজ ব্যবস্থার জঞ্জাল ছিন্ন করে শোষণহীন শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠার বাণী বাহক হয়ে দাঁড়ান হাসান এবং সেই সাথে একজন দৃঢ়চেতা সংগঠক। 'তোমার আপন পতাকা' কবিতায় যুদ্ধকালীন জীবনের যে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্বমুখর চিত্রপট এবং বিষয়বস্তুগত ভাবনার মহাকাব্যিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাবে।

পাকিস্তানি হানাদার দানবের নৃশংস নখরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার মাতৃত্ব, তার চিত্র "বীরাঙ্গনা" কবিতায়–

তোমার ঠোঁটে দানবের থুথু,
স্তনে নখরের দাগ, সর্বাঙ্গে দাতালের ক্ষতচিহ্ন
প্রাণান্ত গ্লানিকর।
লুট হয়ে গেছে তোমাদের নারীত্বের মহার্ঘ মসজিদ।
উচ্ছিষ্টের দগদগে লাঞ্ছনা তোমরা
পরিত্যক্ত পড়ে আছ জীবনের ধিকৃত
অলিন্দে নাকচ তাড়িত।[৩১]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, শামসুর রাহমানই (জ. ১৯২৯) বাংলাদেশের সবচেয়ে সমাজ-রাজনীতি সচেতন কবি। দেশ-কাল চিত্র ভাবনার দ্বারা বাংলা কবিতাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন; প্রেরণা অবশ্য পেয়েছিরেন হাসান হাফিজুর রহমানের কাছ থেকেই। রাহমানের কবিতায় সামাজিক সংঘাতময় জীবনের মানবিক স্পৃহা বেশি মাত্রায় কার্যকরী। এ দেশের প্রতিটি আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা মূর্ত করেছেন ভাষার জোরালো প্রকাশভঙ্গির দ্বারা। অবশ্য সেটা দলগত রাজনীতি চর্চার বাইরে নয়। তিনি দেশের দমননীতির বিরোধিতা, শাসক শ্রেণীর নিপীড়ন এবং সংঘবদ্ধ জনতার সঙগ্রামী প্রয়াসকে যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন। সমাজ-রাজনীতিই ঘুরে ফিরে কেন্দ্রীয় বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। রোমান্টিক আবেগ ও মনস্তত্ত্বগত জটিলতা আর নয়, এবার দেশের জীর্ণ দশায় কবি প্রতিবাদে উচ্চকিত এবং আক্রমণশীল– 'ক্রোধের গরগরে চিহ্নগুলি থাকতো ছড়িয়ে/ দুর্বাসার মতো জেদী পয়ারের প্রতিটি সারিতে।'[৩২] মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দীর্ঘদিন পুরনো ঢাকার একটি নির্জন ফ্লাটে অনেকটা বন্দী দশায় ছিলেন। 'নিজ বাসভূমে' এবং 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্য দুটি এ সময়েই রচিত। চারদিকের হাহাকার, দৈন্য, অসহায় আর্তি– কবিকে গভীরভাবে পীড়িত করেছে। যেমন :

ক. সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। নরছে মানুষ
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইদুঁর।
... ...
পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ
একটি জীপের দিকে, জীপে
সশস্ত্র সৈনিক কতিপয়। ভাবি, যদি
অন্তত হতাম আমি পথের কুকুর।[৩৩]

খ. দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো,
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে,
কখনো- বা বলিহারি যাই, গুঁড়ো দুধ।
খাসা কুটনীতি,
চীনা ও মার্কিন কালোয়াতি।
... ...

সত্যের বলাৎকার দেখে, নিরপরাধের হত্যা
দেখেও কিছুতেই মুখ পারিনা খুলতে।
বটের তলায় পিষ্ট সারা দেশ, বেয়নেট বিদ্ধ,
যাচ্ছে বয়ে রক্তস্রোত, কত যে মায়ের অশ্রুধারা।[৩৪]

গ. আমাদের প্রিয় যা কিছু সবি তো ওরা
হত্যা করে একে একে। শহীদ মিনার
অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
দারুণ আক্রোশে
ছুঁয়ে ফেলে দেয় দূরে, কে জানে কোথায়।
বটতলা করে ছারখার।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের (জ. ১৯৩৯) কবিতায় সমাজ-রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ আরো জোরালো; তবে সেখানেও আছে ব্যক্তি সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস। অন্যদিকে শহীদ কাদরী (জ. ১৯৪২) কবিতায় শহরবীক্ষণের পাশাপাশি ব্যক্তিমানস ও সমাজমানস উন্মোচনের জন্য মনোবিশ্লেষণের আশ্রয় নিলেন। যেমন ঃ 'স্বাধীনতা, তোমার জরায়ু থেকে/ জন্ম নিলো নিঃসঙ্গ পার্কের বেঞ্চি/ দুপুরের জন কল্লোল/ আর যখন-তখন এক চক্কর ঘুরে আসার/ ব্যক্তিগত, ব্যথিত শহর, স্বাধীনতা।'[৩৬] আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩) কাব্যটি এ সময়ে প্রকাশ পায়; স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধের দামামা, অসহায় মানুষের লাশ, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদি কারণে তাঁর কবিতায় সমাজ-রাজনীতির হলাহল। এমনকি আল মাহমুদ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় উচ্চকিত হয়ে পড়েন এবং শ্রেণীহীন সমাজে শ্রমিকের অধিকার আদায়ে আপোষহীন বিপ্লবের ঘোষণা দেন :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়েছে হাত
হিয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসে এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোক ধর্মে আর ভেদাভেদ।[৩৭]

"বাংলা তোমার নাম" কবিতায় আলাউদ্দিন আল-আজাদ (জ. ১৯৩২) বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যগত সংগ্রাম এবং বাংলার জনপদ লুটেরাদের বার বার আক্রমণের চিত্র তুলে ধরে এই সংকট মুহূর্তে সমষ্টিগত আন্দোলনের কথা বললেন, সে সংগ্রাম হবে গেরিলা আক্রমণ :

বাংলা তোমার নাম মুছে দিতে মান-
চিত্র থেকে যুগে যুগে এসেছে হার্মাদ
বর্গিদলঃ রক্তলোভী জরব জল্লাদ
পিশাচেরা; আদিগন্ত পতঙ্গ তুফান
উঠেছেঃ লুটেছে ফলিত খামার গ্রাম
থেকে গ্রাম জনপদ নগর বন্দর ঃ
মার মরদ জোয়ান শিশু সে বর্বর
মাঠে ঘাটে আক্রান্ত নারীর সংগ্রাম।
কি জাদু জানো যে তুমি ওগো মায়াবিনী
চুপি চুপি পোষো সকল জখম, যার
মাঝে জন্মে রক্তবীজ ঃ তা'দের বাহিনী
পাহাড় জঙ্গলে ঝোপে ক্রমশঃ দুর্বার ঃ
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো মেঘ বজ্র শাখা
প্রতিভোর সূর্য তোমার জয় পতাকা।[৩৮]

এভাবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কম বেশি সকল কবির মধ্যে সমকালিন সমাজ-রাজনীতির চেতনাবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন স্বদেশ ভাবনায় কবিদের জারিত হতে আমরা দেখি। "কেন মুক্তিযুদ্ধ" কবিতায় এখনকার কবি সৈয়দ হায়দার গোটা বাংলাদেশের পীড়িত বীভৎস চিত্র উপস্থাপন করেন ঃ 'কোথায় পালিয়ে যাবে অভিমানী জন্মভূমি ফেলে/ চকবন্দী সবখানে চলছে প্রচণ্ড গোলাগুলি/ ঢাকা যেন মরে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে, খুলনাও।/ চট্টগ্রাম রাজশাহী এবং সর্বত্র তছনছ/ বাড়িঘর, শস্যগোলা, পোল্ট্রিফার্ম, ফলের বাগান/ রেপ-হত্যা কোথায় না?[৩৯]

(৫)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কবিতার একটা জোয়ার এসেছিল; যদিও প্রতিভার তুঙ্গীয় বিকাশ ছিলনা। বাংলাদেশ তখন প্রানোম্মাদনায় উদ্ভাসিত, এক ঝাঁক তরুণ কবির উল্লসিত মর্মবেদনা কবিতার ক্ষেত্রকে

প্রবলভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই তরুণ-কিশোর কবিদের কবিতায় ছিলো সময়ের উত্তাপ। যুদ্ধ বিক্ষুব্ধতার পর দেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা দিল অর্থনৈতিক মানের ক্রমাবনতি, খাদ্য শস্যের অভাব, বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, দ্রব্যমূল্যের দোদুল্যমানতা, প্রকাশনা শিল্পের সঙ্কট প্রভৃতি কারণে তরুণদের মনে দেখা দিল সংশয়। তারপরও দুই যুগ বন্ধ্যাত্বের পর কবিতায় দেশ-সমাজ-রাজনীতির প্রবল প্রবাহ নেমেছিল এবং বলা যায়, সত্তর দশকই ছিলো কবিতার দশক। অসংখ্য সাহিত্য-পত্রিকা, কবিতা পত্র ছিল তাঁদের কবিতার চাষাবাদের ক্ষেত্র। গোটা সাংস্কৃতির সাম্রাজ্য তখন তরুণ কবিদের দখলে। তাঁদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তাঁদের স্বপ্ন, গ্লানি জর্জর মর্মবেদনা, হতাশার তামসিক আয়োজন এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে তাঁরা এসব পত্রিকায় ভরে তুলেছেন নিজেদের মতো করে। সামাজিক বিবর্তনের পুরোটাই প্রত্যক্ষ করেছেন সত্তুরের তরুণ কবিরা। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তিমির নিবিড়ে হারাতে থাকলো, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উচ্চস্বরকে ক্রমাগত নিম্নমুখী করে তুললো– ১৯৭২-১৯৭৪– এর মধ্যেই। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অদক্ষ প্রশাসক, নৈতিক মূল্যবোধের অভাব, হত্যা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির সর্বব্যাপী সয়লাব, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, রাজনৈতিক কুটিলতা এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে মহামারি-দুর্ভিক্ষের করাল থাবা আবার অন্ধকারের দিকেই টানলো; হতাশ বাঙালির আশা আকাঙ্খা তিমিরেই থেকে গেল। যে যুব সম্প্রদায় ও কৃষক-শ্রমিক স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পতাকা ছিনিয়ে নিলো; তাদের অবদানকে ক্ষমতাসীনরা বিশ্বাসঘাতকতার জালে জড়িয়ে তাদেরকে খুন-রাহাজানি ছিনতাইয়ের দিকে ধাবিত করলো। কিছু তরুণ কবি সাহিত্যিকের মনে এমনই সংশয় দানা বাঁধলো যে, তাঁরা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কবিতাকে মতাদর্শগত ভিন্নতার পটভূমিতে উপস্থাপন করে শ্রেণী সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

এসময় বাংলাদেশে একটা প্রতিবিপ্লবী মনোভাব গড়ে ওঠে। হতাশাগ্রস্থ জাতিকে শ্রেণী মুক্তির সোপানে আবার আহ্বান জানালো কিছু কবি-সাহিত্যিক। এর পেছনেও সমকালিন সমাজ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এই পথ নির্দেশনার জন্য দায়ী। কেননা, স্বাধীনতার পরপরই বৈদেশিক ঋণ বাড়তে থাকে, অনেক শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বাড়তে থাকে, বেকারত্বের অভিশাপে অপরাধ প্রবণতাগুলো উন্মোচিত হতে থাকে একটার পর একটা। বাড়তে থাকে দলীয়করণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, শ্রেণী বৈষম্যের ফলে বাড়ে হতাশা এবং তা থেকেই সামাজিক ভারসাম্যহীনতা। ১৯৭২ সনের শুরুতেই ছাত্রলীগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। যারা শ্লোগান তুলেছিলেন 'বিশ্বে এলো নতুন বাদ ঃ মুজিববাদ মুজিববাদ' এবং 'বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ ঃ মুজিববাদ মুজিববাদ', তারাই ১৯৭২ সনের ৩১ অক্টোবর গঠন করলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। অন্যদিকে সিরাজ সিকদারের (১৯০৯-৭৫) সর্বহারা পার্টিতো বাংলাদেশের স্বাধীনতাই অস্বীকার করে বসলো। কমরেড সিরাজ সিকদারের ভাষায় "আওয়ামীলীগ, মনিসিং ও মোজাফফর বিশ্বাসঘাতক চক্র

নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের বিশ্বাসঘাতকতা করে, বাঙালি জাতির আত্ম মর্যাদাকে পদদলিত করে পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নিকট বিলি করে দেয়, সামরিক ফ্যাসিষ্টদের উৎখাতের জন্য তাদের ডেকে আনে"।[৪০] কাজেই আওয়ামী সরকার সিরাজ সিকদারের উপর ক্ষুব্ধহন। ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল হক সিকদার সিরাজ সিকদার নামে পরিচিত, তিনি নিজেই একজন বিপ্লবী কবি, তাঁর কবিতার দু'টি অংশ এখানে উল্লেখ্য :

ক. জনগণ আজ বারুদের স্তূপ
সপ্নতের উষ্ণ আগুনের
আশায় উন্মুখ।
একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বলবে।
শোষণের কালো বন
পুড়ে সাফ হয়ে যাবে।[৪১]

খ. পাহাড়ের
ঢাল বেয়ে
নেমে যায়
মুরাং মেয়ে।
অঙ্গে তার ছোট্ট আবরণী,
কী নিটোল স্বাস্থ্যবতী।
কবে তাঁর কাঁধে–
শোভা পাবে রাইফেল একখানি।[৪২]

জাসদের জন্মকালিন ঘোষণা পত্রে দেখানো হয়েছে 'মুজিব সরকার সুবিধাবাদী'। বর্তমানে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি শোষক সম্প্রদায়ের করায়ত্ত। 'তাছাড়া মেহনতি শ্রমিক সমাজ উঠতি পুঁজিপতী ও শিল্প প্রশাসক গোষ্ঠীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে- আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী প্রথার নিগড়ে কৃষক সমাজের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং এটাই শ্রেণীদ্বন্দ্ব'। ঘোষণা পত্রে আরো বলা হয়েছে : বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী বাঙালী জাতির জীবনে কৃষক শ্রমিক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই কেবল একটি সফল সামাজিক বিপ্লবী সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সে ইপ্সিত শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করা যেতে পারে।'[৪৩] এই মতবাদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আস্থাশীল হয়ে বাংলার তরুণ কবিরা সাম্যের প্রতি জনসাধারণকে

উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। এরই মধ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হলো ১৯৭৪ সালে। হাজার হাজার মানুষ মারা গেলেন। দেশের সুযোগ সন্ধানী কিছু ব্যবসায়ী সরকারি মহলের সহায়তায় দুর্ভিক্ষের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাই 'হৃদয় ও রাজপথকে মেধা মনীষা দিয়ে মেলাতে চেয়েছেন এই দশকের কবিরা। এত দ্বৈততা সত্ত্বেও এই দশকের কবিরা নেতিবাদী দর্শনে সমর্পিত নয়, তাদের আস্থা মানুষে, মানুষের ভেতরের অপরিমেয় শক্তিতে। কবিতার পেলব কাঠামোর বদলে তাঁরা খুঁজেছেন দার্ঢ্য। কবিতার চারুময় গীতশ্রীকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে সেখানে তাঁরা বসিয়ে দিয়েছেন, ঋজু সাহসী, অনমনীয়, বিষয়নির্ভর কবিতাকে।'[৪৪] নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫) সাম্যবাদী চেতনায় সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তন প্রয়াসে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে আলাদা একটা প্রেক্ষাপট উন্মোচনের চেষ্টা করেন এবং পাঠক সমাজ গড়ে তোলেন, আমরা এখন তাঁর বিশ্লেষণে যাবো।

(৬)

নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫) ষাটের দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজনীতি সচেতন। রাজনৈতিক কবিতা লিখে ১৯৬৬ সালের দিকে বেশ খ্যাতিও লাভ করেন গুণ। তখনকার সময়টা এমন যে, ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে শেখ মুজিবের (১৯২০-৭৫) নেতৃত্বের প্রতি কবি পূর্ণ আস্থাশীল। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমনের জন্য আইয়ুব-মোনায়েম গ্রেফতারি, নির্যাতন এবং গুলির পথ বেছে নিলেন। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাজপথে নামলো। স্বদেশের প্রতিবাদী রূপ ধারণ করলেন মুজিব ভক্ত কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর কবিতা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শাণিত হলো।

সত্তর দশকে গুণের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেল; এক সময় চীন ভিত্তিক ছাত্র-ইউনিয়ন করতেন, সেই সুবাদে মার্কসের সাম্যবাদ চেতনা সবসময় তাঁর মধ্যে সক্রিয়। আবার প্রয়াত শেখ মুজিবকে নিয়ে একাধিক কাব্যও রচনা করেছেন। এই সব কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তরুণ পাঠক সমাজকে তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। তবে সোভিয়েত মুখী বাম রাজনীতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতি প্রগাঢ় সমর্থন তাঁর বরাবরই ছিল।

পরবর্তী সময়ে তিনি রাজনৈতিক কবিতার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েন এবং শিল্পের চেয়ে বক্তব্যের প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশি দেখা দেয়। কবি গুণ মানব সমাজের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের যে কথা বলেন, মার্কসবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে বলে চলেছেন, সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বই গুণের আদর্শ। এই শ্রেণী সংগ্রামকে কবি তার নিত্যদিনের জীবন সংগ্রামের সাথে তুলনা করেন; সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তিনি দেশে দেশে সাম্যবাদী শ্রেণী চেতনায় উদ্বেলিত হন। দুর্বলের প্রতি যে অত্যাচারের কথা গুণ বলেন সেই অত্যাচার হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে একটি

দলের অকুশল। গুণ সব সময় নির্যাতিতের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সহমর্মিতার ঘোষণা দেন। লেলিনের পত্রিকার নামে কাব্যের নাম দেন 'ইস্ক্রা' অথ্যাৎ স্ফুলিঙ্গ। রুশ সাহিত্যের ঐতিহ্যের সাথে বাঙালির সংযুক্তি সাধন করতে চান গুণ। বিপ্লবী কবি দস্তায়ভস্কির (১৮২১-৮১) বিখ্যাত পঙক্তিটি বাংলা ভাষায় চালান করে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন :

'ইস্ক্রা থেকে জ্বলবে মশাল'–
টলবে আসন শোষকের,
পুড়বে মুখ ও পৃষ্ঠ তাতে
পুঁজির পৃষ্ট শোষকের।[৪৫]

কবি মার্কস-লেলিনের আগমনের বার্তা দেন এবং অন্যসব মতবাদের অবসান চান ঃ 'মার্কস-এঙ্গেলস-লেলিন ...। ওরা আসছেন–/ দয়া করে পথ ছেড়ে দিন।'[৪৬] ৬৭নং কবিতায় বলেন :

রাজি নই আর অক্ষম শাপবর্ষণে।
পেয়ে গেছি পথ, নব হিম্মৎ
মার্কস-লেলিনের দর্শনে।[৪৭]

মার্কসবাদ যে নির্জীব কিংবা অস্থায়ী কোন ভঙ্গুর মতবাদ নয়, তাও কবি ঘোষণা দেন :

মার্কসবাদ নয় প্রাণহীন কোনো শুষ্ক-মৃততত্ত্ব,
কর্মযোগে সে চিরজীবন্ত এক সত্য।[৪৮]

সমাজতন্ত্র কাকে বলে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তিনি :

উৎপাদনের উপায়গুলি রাষ্ট্রীকৃত হলে
জানি তারে সমাজতন্ত্র বলে।
সময় যদি রাষ্ট্রীকৃত হয়,
তবে তারে সময়তন্ত্র কয়।[৪৯]

সাম্যবাদের ব্যাখ্যায় কবি বলেন :

ক. পুঁজিবাদে টাকা প্রভু, মানুষ টাকার দাস,
সাম্যবাদে মানুষ মুখ্য, টাকাই তাহার দাস।[৫০]

খ. সেই শ্রেষ্ঠ সামাজিক অভিধান
যে গ্রন্থে দরিদ্র, ধনী
সমার্থক এবং সমান।[৫১]

গুণ যে অত্যাচারিতের পক্ষে, শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণ মানুষের চেতনার কবি তা প্রকাশ করেন এভাবে :

আমি তো দেখেছি শিশুর মুখের গ্রাসে
লুণ্ঠনকারী কপটের ক্রুর হাসি,
তাইতো মায়ের করুণ দীর্ঘ শ্বাসে
বেজেছে আমর কবিতা রুদ্র-বাঁশি।[৫২]

"প্রলেতারিয়েত" কবিতায় কবি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা প্রকাশ করেন :

এই যে কৃষক বৃষ্টি জলে ভিজে করছে রচনা
সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ-
এই যে কৃষক-বধূ তার নিপুণ আঙুলে ক্ষিপ্র দ্রুততায়
ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ,
এই যে রাখাল শিশু খররোদ্রে আলে বসে
সাজাচ্ছে তামাক– আর বার বার নিভে যাচ্ছে
তার খড়ে বোনা বেণীর আগুন,
তুমি সেই জীবন শিল্পের কথা লেখো,
তুমি সেই বৃষ্টি ভেজা কৃষকের বেদনার কথা বলো
তুমি সেই রাখালের খড়ের বেণীতে
বিদ্রোহের অগ্নিজ্বেলে দাও,
আমি তোমার বিজয় গাঁথা করবো রচনা প্রতিদিন।[৫৩]

আশির দশকের সামরিক শাসনের প্রতি কবির সোচ্চার ঘৃণা, সমাজ জীবনে জেঁকে বসা এই আপদকে বিদেয় করতে গুণ আবার হুংকার ছাড়লেন এবং তাকে ভালোয় আলোয় সময় থাকতে সরে যেতে বললেন :

মিথ্যাচারী, প্রতারক, কপট, হৃদয়হীন, খুনী,
পাষণ্ড, বর্বর কাঁহাকার;
তুই প্রত্যাখ্যাত বাতিল পৌরুষ, তোর হাতে নেই

এই ভূবনের ভার।
তুই নির্লজ্জ, নাছোড়বান্দা-নপুংসক, ক্লীব
ক্ষমতা লোলুপ তুই সবার বদ্‌নসীব।
দেশদ্রোহী, জনদ্রোহী, সাম্যদ্রোহী, শান্তিদ্রোহী,
মূর্খ ক্রীড়নক;
বজ্জাত, জালিম, ধূর্ত, ভণ্ড, শয়তান, তুই
দুঃশাসন, ঠক্।
তোর হাতে রক্ত, পায়ে কুষ্ঠ, কণ্ঠে নালীঘা-
আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে, তুই নেমে যা-
নেমে যা।
তোর স্থলে আসুক সুন্দর, আসুক অনিন্দকান্তি
কাঙ্খিত পুরুষ।[৫৪]

নির্মলেন্দু গুণ সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক-মজুরের মিলিত শক্তির উত্থান দেখতে পান :

কমরেড লাল চেতনার রঙে
রাঙা রক্তিম বিশ্বের
পদধ্বনি বাজে আমার রক্তে,
হুংকার শুনি নিঃস্বের।
বুঝি মজুরের কিষাণের হাতে
ঝলমল করা খড়্গের
দিন আসে ঐ মাভৈ! মাভৈ;
কাপে ঈশ্বর স্বর্গের।[৫৫]

শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষ সব সময় রাষ্ট্রের দ্বারা, বিত্তবানদের দ্বারা, সামাজিক-ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িত। সুতরাং শ্রেণী অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস আন্দোলনের সফলতায় কবি গুণগান করেন।

এভাবে গুণ অশান্ত পরিস্থিতিতে এবং নৈরাজ্যজনক সমাজ ব্যবস্থার অবসান কামনায় বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী অনুষঙ্গের অবতারণা করলেন। সাধারণ জনগণের শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সব আন্দোলনেও শরিক ছিলেন কবি।

(৭)

হাসান হাফিজুর রহমান ও সিকান্দার আবু জাফরের প্রতিবাদী চেতনা যেমন নির্মলেন্দু গুণকে কবিতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো, তেমনি নির্মলেন্দু গুণকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে তাঁর অগ্রজ ও অনুজরা সাম্যবাদী কবিতার ধারায় সমাজ-রাজনীতি সচেতন কবিতার বলয়কে সম্প্রসারিত করতে থাকেন। অবশ্য আল মাহমুদ, গণ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এ ধারায় শক্তিমত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর 'কালের কলস' এবং 'সোনালি কাবিন' কাব্য দু'টি সমকালীন সমাজ-রাজনীতি এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য গণ বিপ্লবী চেতনা গড়ে তুলেছিলো। জোরালো কণ্ঠেই কবি বলেছেন ঃ 'ভাঙোনা কেন ভাঙতে পারো যদি'।[৫৬] বাংলার উপকথা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আল মাহমুদ সাম্যের দ্রোহী চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে সমাজ-রাজনীতির সুষ্ঠু সমাধান চান। যেমন :

মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোনো সামন্তের নামে কোনদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে এই নগ্ন মস্তকের পরে।
পূর্ব-পুরুষেরা করে ছিল কোন্ সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপরাধে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।[৫৭]

কালো দশকে শাসকের নির্লজ্জ শোষণে গোটা দেশকে শাসকের নির্লজ্জ শোষণে গোটা দেশ অন্ধকার,মহামারি-মৃত্যু-হত্যা-রাহাজানিতে অতিষ্ঠ কবি বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাস্তবের হলাহলে দ্রোহীরূপ ধারণ করেন :

কে বিদ্রোহী আলো জ্বালো এতদূর দীর্ণ জনপদে?
আমাকে দেখাও মুখ অন্ধকার রাত্রির বিপদে।[৫৮]

এ চেতনাবোধ থেকেই কবি এক সময় তাঁর বিপ্লবের সূত্রে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামী দ্যোতনা পেয়ে যান :

ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম, মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
খেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কীভাবে এগুবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।[৫৯]

এই সাম্যবোধ থেকেই কবি এশীয় রাজনীতির প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং বাংলাদেশে সাম্য সমাজের বিকল্প কোন মতবাদ কবিকে আকৃষ্ট করতে পারেনা। তাই কবির গভীর উপলব্ধিগত উচ্চারণ :

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ।[৬০]

এই পঙতি দু'টি পরবর্তী সাম্যবাদী কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহও (১৯৫৬-৯১) এর দ্বারা উৎসাহ পেয়েছেন, যদিও আল মাহমুদ পরে এই চেতনার বিনাশকামী হয়ে গেলেন।

সমকালীন সমাজ-রাজনীতিই সত্তর দশকের কবিতার মূল সুর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশা যখন ধুলায় লুণ্ঠিত, নৈরাজ্যের আঁধার সর্বত্র; তখন আশাহত বঞ্চনায় অগ্রজ-অনুজ সবারই কবিতায় গভীর বেদনা, আক্রোশ-দ্রোহী ভাবনা পাখা মেলতে থাকে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে কবিরা স্ধারণ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির সমাজ-ব্যবস্থার অবসান চাইলেন; স্বাধীনতার প্রকৃত নির্মাণে কবিদের প্রচেষ্টা হতে লাগলো মহৎ মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে শৌর্যের বীর্যের অনুপ্রেরণা দিয়ে হতাশ জাতির প্রকৃত মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত করা। আবু বকর সিদ্দিকের (জ. ১৯৩৮) কবিতায় প্রাচীন বাঙালির ঐতিহ্যগত সংগ্রাম বার বার সংগঠিত করতে চায় সাধারণ মানুষকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে নতুন শপথের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে :

ক. সূর্যকে আমূল ফুঁড়ে দেয় প্রতিরোধ,
মিছিলের শরিকের প্রতিটি মুখই
ঝকঝকে বল্লম,

বাংলার যে কোন ঘাঁটি ভিয়েতনাম,
আজীবন বিদ্রোহী বিপ্লবী
বাংলার গ্রাম।
অগ্নিবৃষ্টি ঝরে যায় অবিরাম
গঞ্জে বন্দরে।[৬১]

খ. সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপান্তে
আমিআসবো
হেটে হেটে রক্তাক্ত পায়ে
ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে
আর–
ডান হাতের মুঠোয় আমুল উপড়ে আনবো
আস্ত এক শপথের চারা
তোমার জন্যে।[৬২]

উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে কবি আতাউর রহমানের (১৯২৭-৯৯) মধ্যে সমাজদ্রোহী চৈতন্য প্রকাশ পেতে থাকে এবং বিপ্লবী প্রত্যয় ঘোষণা করেন কবি :

আমি তো ছিলাম এক মেহনতী শ্রমিক পুরুষ
আমাকে সাহসী করলো মাতৃভূমি মায়ের আশিস
আমাকে সৈনিক করলো মাতা-ভগ্নি-বধূর ক্রন্দন
আমাকে জাগিয়ে দিলো প্রতিশোধ প্রতিহিংসা জ্বালা
আমার কোমল হাত আমার ফুলের মতো চোখ
শিশিরের মতো মন শেফালীর মতো এইবুক
হিংসার প্রত্যয়মন্ত্রে হয়ে উঠলো শোণিত পিপাসু
পশ্চাতে রইলো পড়ে মা'র কান্না প্রেয়সীর হাত
পিতার বিষণ্ন চোখ-স্বজনের নির্বাক বেদনা।[৬৩]

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি এবং বিশ্বব্যাপী গেরিলা আন্দোলনের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা ব্যক্ত হয় আবুল মোমেনের কবিতায়। অশান্ত, অবক্ষয় দেশে দেশে চে বা অর্থাৎ চে গুয়েভারা (মৃত. ১৯৬৭) ঘুরে বেড়াতে থাকেন, মানব মুক্তির আশায়, মানব শৃঙ্খল মুক্ত করাই তাঁর কাজ :

তোমাক চেনেন কাস্ত্রো, গিয়াসচে
মেন্দেলা- সিসুলু আর লাইলা খালেদ?
তুমি কি চাদের মুখ ঢাকা ফেদারীণ, নাকি
তুমি জাপু– জামা ফ্রেনিমো,
নাকি লাল ফৌজ, দুরন্ত বলশেভিক,
সান্দিনিস্তা তুমি?
তুমি কি বাদামি, কালো, সাদা নাকি
রক্তাব কাস্ত্রো তুমি–
তুমি কে?
তোমাকে চিনেছে কাম্পুচিয়া
এ্যাঙ্গোলা লাভস ও নিকারাগুয়া
জেনেছে প্যালেস্টাইন আর জিম্বাবে ভিয়েতনাম।
চে বা … …
তোমার সামনে কার ছায়া?
মার্কস না লেলিন, নাকি ট্রটস্কি-স্ট্যালিন,
অথবা মাওকে মান বেশি?
নাকি হো চি মীন, চে স্বয়ং?
আছেন আলেন্দো কাস্ত্রো নেরুদা বা রবীন্দ্রনাথ?
তুমি কে?
কার বাণী বুকে নিয়ে মানব মুক্তির মন্ত্রজপে
ঘুরছ বন্দুক কাঁধে দেশ-দেশান্তরে![৬৪]

আবু কায়সার বেরিয়ে পড়েন ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে :

এই তো আজ বেরিয়ে পড়েছি বাইরে
কাফন রঙ

ব্যান্ডেজ বাঁধা এই দুটি হাত আজ গুটি পোকার মতো
স্বাধীন, বিপ্লবের পতাকার মতো চাঞ্চল্য ও চারুদর্শন।[৬৫]

আসাদ চৌধুরীর (জ. ১৯৪৩) কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে প্রাণের ফুলগুলো সব গ্রেনেড হয়ে যায় এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সে ফুলগুলো ভাত ও চালে পরিণত হবার বাসনা ব্যক্ত করে, অস্থির-পীড়িত দেশে অনাহারে– উদ্‌ভ্রান্ত কবির তাই উচ্চারণ :

এতো ফুল দিয়ে আমি এখন কী করি?
মুখ ফেরায় অনেকে,
শূন্য থালা হাতে কেউ তেড়ে আসে।
অনুগত যুঁই তুমি ভাত হও,
সাদা চাল হও।[৬৬]

কবি আবুল হাসানের (১৯৪৭-৭৫) কবিতায় সমকালীন মানুষের অসহায় আর্তি আছে, স্বদেশপ্রেমের গুঞ্জরণ আছে এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অনুষঙ্গও আছে; অবক্ষয় ও জীবনাসক্তির টানাপোড়েনে আরক্তিম আভা আছে। গুণের নিত্যদিনের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও হাসান একটা নিজস্ব আবহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং কবিতার গভীর ব্যঞ্জনার প্রতি সদা জাগ্রত ছিলেন; জন্মভূমি ও দয়িতা সংলগ্ন ছিলেন বরাবর :

দালান উঠছে তাও রাজনীতি, দালান ভাঙতে তাও রাজনীতি!
দেবদারু কেটে নিচ্ছে নরম কুঠার তাও রাজনীতি,
গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, গোলাপ ঝরছে তাও রাজনীতি!
মানুষ জন্মাচ্ছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি![৬৭]

মহাদেব সাহার (জ. ১৯৪৪) মধ্যে আত্ম সঙকট তীব্রতর। নঞর্থক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। সমকালীন পরিবেশ, দেশ ভাগ, স্বাধীনতা, প্রেম তাঁকে প্রশান্তি না দিলেও মানবিক অনুরাগ কবিকে অনুতপ্ত করে তোলে। গণমানুষের চাওয়া-পাওয়ার আর্তি, তাঁর কবিতায় বড় হয়ে দেখা দেয়–

একটি মাত্র মানুষ সারাদিন ইট ভাঙ্গে
ঘামে ভেজে আর রোদে ঝলসায় পিঠ
তবু নেই তার মাথা গুজবার ঠাঁই
সে কথা তোমায় জানাই বন্ধু, ভঅই
তোমার শ্রমেই তাদের বিজয়টীকা।[৬৮]

"শরণার্থী" কবিতায় অসীম সাহা (জ. ১৯৪৯) মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে নিরন্ন মানুষের অসহায় আর্তি মর্মে উপলব্ধি করেন :

কারা যায় ক্ষুধিত হৃদয় নিয়ে তীব্রতম অন্ধকারে আজ?
দুপায়ে শৃঙ্খল বেঁধে
কারা যায় নিজস্ব সংসার থেকে
স্বজনের চিতা ফেলে
শিশুর শরীর ফেলে
ভোরের সূর্য ফেলে
মানবিক প্রেম ফেলে
বুনো শুয়োরের শব্দে বাতাস বিবাগী ক'রে
কারা যায় অন্তহীন অজ্ঞাত জীবনে?[৬৯]

'কুসুমিত ইস্পাত' কাব্যে হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-৭২) দেশকালগত সংকটকে সৌন্দর্য এবং বিমুগ্ধতার সাথে একটা সমন্বয় ঘটাতে চাইছেন। প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তি-সামাজিক জীবনযাপন সব কিছুর মধ্যে সুন্দর ও কাঠিন্যের সংঘাতের চিত্র :

ইস্পাতের পাশে ফুল।
ফুলের সাতে কংক্রীটের ভালোবাসা
ফুলের গর্তে সাপ, পাপ
ফুলের গর্তে মানুষের স্বপ্নের বসবাস
ফুলের আড়াল থেকে মানুষের গোপন বন্দুক
জনসমাগমকে ভাই ডেকে গর্জে ওঠে।[৭০]

এভাবে সত্তরের মাঝামাঝি থেকেই বাংলা কবিতায় সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রবণতাই হচ্ছে প্রধান। তরুণ কবিরা প্রেম-প্রকৃতির মধ্যেও রাজনীতির আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। রাইফেল, বল্লম, সড়কি, বুলেট, গ্রেনেড, ককটেল ইত্যাদি শব্দগুলো দখল করেছে কবিতার ভাষায়। কেউ সমাজ ও মানবিক বোধে কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হাজির করেছেন, কেউ আবার শ্রেণীহীন রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং চলমান সমাজের অসংগতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই আমরা এবার রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সমাজ-রাজনীতি নির্ভর কবিতার আলোচনায় যাবো।

(৮)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ((১৯৫৬-৯১) কাব্যক্ষেত্রে রাজনীতি সংলগ্নতার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে বাংলাদেশে সাম্যবাদী কাব্যান্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পেরেছেন; বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতিতে যে ক'জন কবির কবিতার পংক্তি বার বার উচ্চারিত হয়, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনে যে দুর্বিসহ্ ঘন অমানিশার সৃষ্টি রুদ্র তাতে ব্যথিত। অন্য অনেক কবি যখন কবিতাকে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করে দেখতে আগ্রহী ছিলেন, সেখানে রুদ্র কবিতার সঙ্গে জীবনের সকল অনিবার্য ঘাত-প্রতিঘাতকে গ্রন্থিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁর এই অনুরাগ আমাদের জাতীয় জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর জন্য নব্য শাসক শ্রেণী কম দায়ী ছিলেন না; তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে, বিপ্লবের পর সাধারণত প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা চলে। দেশের নাজুক পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ-মহামারি দেখা দিয়েছে; সর্বত্র নিদারুণ হাহাকার। এমন সময়ে বাক স্বাধীনতা হরণ করা হলো; রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বাকশাল গঠনের পরিকল্পনা এবং তা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া ছিলো জঘন্যতম। আম জনতা একদলীয় শাসনের জন্য তিয়াত্তর শালে তাঁদের জয়ী করেনি। প্রতিপক্ষকে তাঁরা খুবই দুর্বল ভেবেছিলেন এবং কর্তৃত্বের দাম্ভিকতায় জিহ্বা কেটে দেয়ার কথা বলা হলেও তখনকার রাষ্ট্র প্রধান এর কোনো সুরাহা না করে বরং মদদ যুগিয়েছেন; অফিসে অফিসে আগুন দেয়ার পরও তাঁরা নিশ্চুপ। পরিস্থিতি প্রশাসনেও ফাটল ধরালো। পরে ১৫ আগষ্ট যা ঘটলো, জাতির বুকে চরম পদাঘাত– বিশ্ব বিবেক থ' মেরে গেলো। পৈশাচিক উল্লাস হলো বঙ্গ ভবনেও অভ্যুত্থানের নায়কদের দ্বারা।[৭১] যে নেতা তৎকালীন সংসদে সিরাজ সিকদারের হত্যায় উল্লাস করেছিলেন এবং দাম্ভিকতায় বলেছিলেন "কোথায় সিরাজ সিকদার"। কয়েক মাস পরেই তাঁর এই পরিণতি বাঙালি জাতির বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

পট পরিবর্তনের পর ব্যারাক শাসন। জাতীয় জীবনের এ সব ঘটনা রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ শুধু নন, সমগ্র সচেতন বিবেকে দারুণভাবে কষাঘাত করেছিল। কষ্টার্জিত মুক্তিযুদ্ধের সফলতা ধুলায় ভূলণ্ঠিত দেখে; পনেরই আগষ্টের করুণ ট্রাজেডিতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীশক্তির উত্থানে কবি রুদ্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন :

> আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
> আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
> ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে
> এ দেশকি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?
> বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
> মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।

এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিল,
জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার।
আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।
এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা– একি তবে নষ্ট জন্ম?
একি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?
জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।[৭২]

অবশ্য রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ যে মতাদর্শগত আদর্শের বিশ্বাসী অর্থাৎ সাম্যবাদী আন্দোলনের, তার ইতিহাস বাংলাদেশে সুখকর নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, সিরাজ সিকদার ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী নেতাদের মধ্যে আদৌ বনিবনা ছিলনা, সিরাজ সিকদার তো বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসীই ছিলেন না '৭১-এর জুনে যে "পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি" গঠন করেন, তাতে বাংলাদেশের মূল কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো 'পূর্ব বাংলার জনগণকে এরা ভাঁওতা দিতে সক্ষম হচ্ছে, কারণ, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-বাশার, মতিন-আলাউদ্দিন ট্রটস্কী চেবাদী, কাজী-রনো-মেনন ষড়যন্ত্রকারী এবং মণিসিং-মোজাফফর সংশোধনীবাদী বিশ্বাসঘাতক চক্র পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে বামপন্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়'।[৭৩] আর 'গণবাহিনী' গঠন প্রসঙ্গে তো জাসদ নেতা নূর আলম জিকু বলেছিলেন, 'গণ বাহিনী হওয়ার কারণে আমরা বেঁচেছি। রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনীর হাতে আমাদের দশ হাজার কর্মী নিহত হয়েছে। গণবাহিনী না হলে আরো ব্যাপক মুজিব বিরোধী যুবকের মৃত্যু হতো'।[৭৪] কাজেই ১৫ই আগস্টের ট্রাজেডিতে নির্মলেন্দু গুণ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মতো কবি-সাহিত্যিক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শোখগাঁথা কবিতার বিচরণ দেখলে এঁদেরকে স্ববিরোধীই মনে হয়। গুণ তো প্রেম-প্রকৃতি-ভালোবাসা সব কিছু ছাড়িয়ে বিপ্লবী দ্যোতনায় 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' বলেছেন। তবে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ ও অন্যান্য সাম্যবাদী কবিগণ সামরিক ক্যুদেতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন কৃষক-শ্রমিক-জনতার সম্মিলিত গণবিপ্লব। কিন্তু রব, জলিল ও তাহের গং যা করতে চাইলেন, তা ব্যর্থতায় পর্যুদস্থ হলো। ১৯৭৪ সনের নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং পরবর্তী সময়কালে জিয়াউর রহমান জাসদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে জাসদকে দুর্বল করে ফেলেন। যে জাসদ ১৯৭৩-৭৪ সনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে দীর্ণ করে দিয়েছিল সেই জাসদই জিয়াউর রহমানের হাতে দীর্ণ হয়ে গেল।'[৭৫] ব্যক্তি বিদ্বেষ এবং কোন্দলে কোন্দলে এ দেশে এ মতাদর্শ অসৎ রাজনীতিবিদদের দ্বারা বার বার প্রতাড়িত হয়েছে।

> আমাদের এই উপমহাদেশে বিপ্লবী দল ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস সুদীর্ঘ দিনের এবং তা অজস্র ভুলের চড়াই-উৎরাই পেরুনো সত্ত্বেও এখনও সাফল্যের মুখ দেখেনি, এখন পর্যন্ত একটি শক্তিশালী, সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে ওঠেনি। দল ও আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে তত্ত্বগত মৌলিকভুল, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞানতা বারে বারেই ধরা পড়েছে এবং এ থেকে অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনা থেকে উদ্ভূত সুবিধাবাদ ও হঠকারিতা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো এদিক ওদিক দোল খেয়েছে এ বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে।'[৭৬] একজন বিপ্লবী নেতারই এ মূল্যায়ন।

আমাদের দেশে যারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কবুল করেছেন, মার্কস-লেলিন-মাওবাদ-এর আদর্শে দল গঠন করেছেন, তাঁরা দীর্ঘ দিন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেননি। বরং আজকের রাষ্ট্র ও সমাজে তাঁরা অনেকেই নতুন রূপে শোষণ প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এদের প্রভাব ক্ষীণতর হয়ে গেছে। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের রূপ কি হবে, সে সম্পর্কেও কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণমুলক কোন গ্রন্থ থেকে জানার উপায় নেই। বিদেশী ঐতিহ্য অর্থনীতি-রাজনীতি সংশ্লেষিত হতে পারে না। তার পর এ সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে "দুনিয়ার মজদুর এক হও" শ্লোগানে এখনো সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠেন। তবু মানুষ সচেতন হয়, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তি কামনা করে। কবি-সাহিত্যিকগণ জাতির সাধারণ মানুষকে মুক্তির নির্দেশনা দেন। কি করে অত্যাচারী থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অত্যাচারী সরকারের উৎখাতের মাধ্যমে কি করে জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন করা গিয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তারপরও কি জনগণের প্রত্যাশা মিটেছে? যে তিমির সে তিমিরেই রয়ে গেল বাঙালি জাতি। একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহও চান শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের গণমানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। এটা কোনো অন্যায় আবদার নয়। জাতির ঘাড়ে যখন নব্য সামরিক জান্তা চড়ে বসে এবং ধর্মীয় লেবাসধারীরা নতুন করে দেশে শোষণ প্রক্রিয়া শুরু করে এবং অলৌকিক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ করতে থাকে, তখন একজন বস্তুবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর সাম্যবাদে বিশ্বাসী অসংখ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীর উপর দমন-পীড়ন যখন এঁরা চালান, তখন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ফেঁটে পড়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। স্বাধীনতার কুফল দেখে, স্বাধীনতার রক্তময় ইতিহাসের ভেতরে অনাহারী মানুষের বীভৎসতা কবির এমনই পীড়াদায়ক হয়, তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয় এবং শোষকের আনন্দ আস্ফালন দেখে তার সমস্ত মন-প্রাণ বিষিয়ে ওঠে; এরই জন্য কি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার জয়গান? রক্তাক্ত পতাকার কাছে এই কি আমাদের প্রত্যাশা ছিল; মুক্তিযুদ্ধের ভয়ালদিন স্মরণ করে কবি বলেন :

> এ-চোখে ঘুম আসেনা। সারারাত আমর ঘুম আসেনা–
> তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার,

নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ,
মুণ্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর
... ...
রক্তের কাফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা– সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা– সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।[৭৭]

সত্তর দশকের মধ্য পর্যায় থেকে নানাবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনায় মানুষের জীবনে অসহায়ত্ব বোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর এক ব্যারাক কর্মকর্তা থেকে অন্য ব্যারাক কর্তার হাতবদল। মাঝখানে রক্তের ফোয়ারা। আবার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর নিপীড়ন। প্রথম ব্যারাক শাসনে ২১টি অভ্যুত্থান পরিকল্পনা হয়েছিলো। শ'-শ' সেনা অফিসার-কর্মীদের ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে দেশ স্বৈরশাসনের দিকে এগিয়ে গেল। এ অবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের যা করা উচিত, কবিরা সেই ভূমিকা গ্রহণ করলেন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সমাজ-পরিবর্তনের জন্য কবিতার ভাষায় আন্দোলনের আহ্বান জানালেন এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব নিলেন। পঁচাত্তর পরবর্তী সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হয়ে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ মিছিলে মিছিলে সরগম করে তুলছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গন এবং শাণিত ভাষায় উচ্চারণ করলেন চারণ কবির ভূমিকা :

ক. আমি কবি নই– শব্দ শ্রমিক।
শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,
হৃদয়ের কালো বেদনায়।
করি পাথরের মতো চূর্ন,
ছিড়ি পরাণ সে ভুলে পূর্ন।
রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,
হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।
... ...
বুকের ভাষাকে সাজিয়ে রনের সজ্জায়,
আমি বুনে দিই শব্দ-প্রেরনা মানুষের লোহু মজ্জায়।[৭৮]

খ. হাত ধরো-
আমি হিংসার পৃথিবীতে এনে দেবো সুগভীর প্রেম
কবিতার অহিংস-স্বভাব।
হাত ধরো, হাত ধরো– আমি তোমাদের আরাধ্য ভুবনে
এনে দেবো ব্যতিক্রম অভিধান,
তোমাদের তমসা-সকালে আমি পৌঁছে দেবো
সমস্যাহীন এক সূর্যময় রোদ্দুর।
... ...
হাত ধরো, আমি একটি সঠিক নিশ্চয়তা
এনে দেবো সন্ত্রাসের দৈনন্দিন উঠোনে।[৭৯]

গ. কবিতা এখন ক্ষুধার্ত সারা দিন,
কবিতা এখন মলিন বস্ত্র দেহে,
কবিতা এখন প্লাটফর্মের ভিড়ে,
অশ্চিয়তা রাত্রির মতো কালো।

কবিতা এখন মিছিলে ক্ষুব্ধ হাত,
স্বৈরশাসন বিরোধী প্রথম ভাষা।
কবিতা এখন ট্রাকে চাপা দেয়া লাশ,
রক্ত মগজ পেষা মাংশের থুপ।

কবিতা এখন গুলি খাওয়া জমায়েত,
কাঁদানে গ্যাসের ধোয়ায় রক্ত চোখ।
কবিতা এখন অস্ত্রের মুখোমুখি
কবিতা এখন অস্ত্রের অধিকার।

কবিতা এখন বোঝেনা ফুলের ভাষা,
এখন কবিতা জীবনের কথা বলে।
কবিতা এখন বোঝেনা কোমলস্বর,
কবিতা এখন শত মানুষের ধ্বনি।[৮০]

ঘ. বুলেটের বিরুদ্ধে আমাকে আজ
হাতে তুলে নিতে দাও আগুন ও বারুদের ভাষা।[৮১]

স্বাধীন স্বদেশে পর্যুদস্ত কবি হতাশার গ্লানিতে নিমজ্জিত হতে থাকেন। সামরিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা মানুষের স্বাদ-আহ্লাদ এবং স্বপ্নগুলো ছিনিয়ে নেয়। সমকালীন সব কবির মধ্যেই একটা নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। আশাহত বঞ্চনায় অনেক কবির মধ্যেই অশোভন খেদ বেরিয়ে আসে। যেমন, রুদ্র বলেন–

হাজার সিরাজ মরে
হাজার মুজিব মরে
হাজার তাহের মরে
বেঁচে থাকে চাটুকার, পা-চাটা কুকুর
বেঁচে থাকে ঘুনপোকা, বেঁচে থাকে সাপ।[৮২]

ভাতের দাবিতে রুদ্র আরো কর্কশ এবং আরো কঠিন; প্রয়োজন মুহূর্তে এ দাবিতে আদর্শ পরিত্যাগেও রাজি :

আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি,

আমি দক্ষিণ-বাম বুঝিনা, টার্ম বুঝিনা,
নির্বাচনের চার্ম বুঝিনা –
আমার এখন ভাতের দাবি।
অনেক তর্ক টেবিল জুড়ে চল্লো তো ভাই,
অনেক হলো মেরুকরন, গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার
অনেক হলো।
অনেক অস্ত্রবাজীর খেলা, অনেক চমক,
অনেক প্রতিবাদের সভা, বারোই দিবস, তেরোই দিবস,
অনেক স্মৃতিচারন মেলা, স্বৈরতন্ত্র হলো তো ভাই,
অনেক হলো বুট-রাইফেল ঘষা-মাজা।
চোপ হালারা ...
আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি।[৮৩]

মুক্তিযুদ্ধ যার জন্যে, জাতি তা পায়নি; অগণিত শহীদের রক্তে স্নাত বাংলাদেশ আজ সামরিক জান্তার কবলে পড়ে মানুষের মুখের ভাষাও কেড়ে নিয়েছে। শামসুর রাহমান ব্যথা-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে বলেন ঃ উদ্ভট

উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায়; মুক্তিযুদ্ধ,/ হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়'। রুদ্রও অচরিতার্থ আকাঙ্খায় স্বপ্নগুলো পর্যবসিত হতে দেখে আর্তি প্রকাশ করেন :

ক. আমাদের স্বপ্নগুলো
এইভাবে ঠুকরে ঠুকরে খাবে কাক ও শকুন।
আমাদের আকাংখারা
মুখ থুবড়ে পড়বে জমকালো পিচের রাস্তায়।
একাকি বান্ধবহীন আমাদের হৃদপিণ্ডজুড়ে ধ্বংসস্তূপ
জমে উঠতে থাকবে ব্যাংকে সঞ্চিত টাকার মতো।[৮৪]

খ. আমাদের স্বপ্নময় আন্দোলনগুলো
বার বার বুটে ও বুলেটে, আপোষে ও ষড়যন্ত্রে
ঝিমিয়ে পড়েছে।[৮৫]

এমনিভাবে সমাজ-রাজনীতি কাব্য ধারার যেন পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধনেই রুদ্র শক্ত হাতে কলম ধরেছেন এবং এ ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়েছেন। এটা যেন চিরায়ত জীবনেরই প্রতিভাষ্য, গণমানুষের অধিকারবোধে আপোষহীন দৃঢ়তা; জীবনে কাঙ্খিত চাওয়া-পাওয়ার উদগ্র বাসনা। প্রবীনের প্রতি সশ্রদ্ধ আতিথেয়তা বরঞ্চ তাঁদের চেয়ে স্পষ্টবাদিতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে আছেন তিনি।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আলী আহসান, 'আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে', শিল্পতরু প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ৬৭।

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, "কবি আবুল হোসেন", 'করতলে মহাদেশ', শিল্পতরু প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯-১৪০।

৩. মাসুদুজ্জামান, 'বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতাঃ তুলনামূলক ধারা', বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ৩২৭।

৪. জসীমউদ্দীন, "একুশের গান" আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত) 'রক্তাক্ত মানচিত্র', মুক্তধারা, ৩য় প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৪৩।

৫. হাসান হাফিজুর রহমান, "ফেব্রুয়ারীর ঢাকা আমার", রফিকুল্লাহ খান (সম্পাদিত) 'হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী', ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২০৩।

৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, "এফিটাপ", 'মানচিত্র', সাহিত্যভবন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১।

৭. শামসুর রাহমান, "বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত) 'রক্তাক্ত মানচিত্র', পৃ. ৫৭-৫৮।

৮. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, "বাংলা ভাষার প্রতি", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত) 'রক্তাক্ত মানচিত্র', পৃ. ৬৩।

৯. আসাদ চৌধুরী, "আমি একটি কাপুরুষ", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

১০. গোলাম কুদ্দুস, 'ইলামিত্র', (উদ্ধৃত) মালেকা বেগমের 'ইলামিত্র', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬।

১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, "সাতনরী হার", 'সাতনরী হার' বিচিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ৫।

১২. হাসান হাফিজুর রহমান, "স্বদেশ পরিব্রাজক", 'অন্তিম শবের মতো', রফিকুল্লাহ খান (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।

১৩. আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, "আমার দুঃখিনী বাংলা", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।

১৪. ফজল শাহাবুদ্দিন, "নবান্নঃ ১৩৭৬", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

১৫. হুমায়ুন কবির, "বাংলার কারবালা", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

১৬. শামসুর রাহমান, "ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।

১৭. ঐ, "আসাদের শার্ট", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

১৮. হাসান হাফিজুর রহমান, 'অন্তিম শবের মত', রফিকুল্লাহ খান (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

১৯. ঐ, "অবশেষে এল কি সময়", 'যখন উদ্যত সঙ্গীন', বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭২, পৃ. ১৭।

২০. আব্দুল গণি হাজারী, "মাজারেঃ জিব্রাইলের সঙ্গে সংলাপ", 'জাগ্রত প্রদীপে', নওরোজ কিতাবিস্তান, নভেম্বর ১৯৭০, পৃ. ২।

২১. ঐ, "ক্রুশ থেকে (১৯৬৯)" পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

২২. আলাউদ্দিন আল-আজাদ, "ইকড়ি-মিকড়ি", 'রক্তাক্ত মানচিত্র' আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), মুক্তধারা, ৩য় সং, নভেম্বর '৮৭, পৃ. ১২৯।

২৩. আবুল হোসেন, "গৌরিসেন", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত,, পৃ. ১৪৩।

২৪. শামসুর রাহমান, "রাজকাহিনী", আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

২৫. আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ, "একান্ত দেরাজের পাণ্ডুলিপি", 'রক্তাক্ত মানচিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

২৬. আল মাহমুদ, "বোশেখ", 'সোনালি কাবিন', প্রগতি প্রকাশনী, ৪/৪ শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২৩।

২৭. সৈয়দ আলী আহসান, 'আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে', পৃ. ১১৩।

২৮. সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, "মোড়গুলো আমি উড়িয়ে দেবো", সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত) 'মুক্তিযুদ্ধঃ নির্বাচিত কবিতা', নওরোজ বিতাবিস্তান, ফেব্রুঃ '৮৭, পৃ. ৩৮।

২৯. সিকান্দার আবু জাফর, "বাঙলা ছাড়ো", 'বাঙলা ছাড়ো', সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৬১-৬২।

৩০. ঐ, "ইতিহাস চারিণী বাংলা", আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) 'সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী', ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৪০৩।

৩১. হাসান হাফিজুর রহমান, "বীরাঙ্গনা", সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৩২. শামসুর রাহমান, "প্রবেশাধিকার নেই", 'বন্দী শিবির থেকে' অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-১, জানুয়ারী ১৯৭২, পৃ. ১২।

৩৩. ঐ, "পথের কুকুর", ঐ, পৃ. ১৪-১৫।

৩৪. ঐ, "প্রাত্যহিক", ঐ, পৃ. ১৯-২০।

৩৫. ঐ, "মধুস্মৃতি", ঐ, পৃ. ৩১।

৩৬. শহীদ কাদরী, "স্বাধীনতার শহর", সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৭. আল মাহমুদ, "সোনালি কাবিন", 'সোনালি কাবিন'; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩৮. আলাউদ্দিন আল-আজাদ, "বাংলা তোমার নাম", সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

৩৯. সৈয়দ হায়দার, "কেন মুক্তিযুদ্ধ", "ধ্বংসের কাছে আছি', সাতত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ২৯।

৪০. সিরাজ সিকদার (উদ্ধৃত), শহিদুল ইসলাম মিন্টুর "সর্বহারা পার্টির গোপন তৎপরতা" সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ১২ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২১।

৪১. সিরাজ সিকদার, (উদ্ধৃত), ঐ, পৃ. ১৭।

৪২. ঐ, "গণযুদ্ধের পটভূমি" (উদ্ধৃত) জিল্লুর রহমান/আশরাফুজ্জামান, "সিরাজ সিকদার সাফল্যে ও ব্যর্থতায়", সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৫ জানুয়ারী '৮৯, পৃ. ১১।

৪৩. আমজাদ হোসেন, "জাসদ রাজনীতি: জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি", সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৬ জানুয়ারি '৮৯, পৃ. ২০-২১।

৪৪. আলী রিয়াজ, "ভূমিকা", 'সত্তর দশকের কবিতা: অজস্র আগুনের ফুল', অর্কিড, ১৯৯৫, পৃ. ৩।

৪৫. নির্মলেন্দু গুণ, "ইস্ক্রা-২", 'ইস্ক্রা', কাকলী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ৯।

৪৬. ঐ, "ইস্ক্রা- ১৫", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৪৭. ঐ, "ইস্ক্রা- ৬৭", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

৪৮. ঐ, "ইস্ক্রা- ৬৬", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

৪৯. ঐ, "ইস্ক্রা- ৭৪", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

৫০. ঐ, "ইস্ক্রা- ৩৬", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৫১. ঐ, "ইস্ক্রা- ১৪৮", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৫২. ঐ, "আমারর সংশয় থাকবে কেন", 'শান্তির ডিক্রি', বিউটি বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ১৮।

৫৩. ঐ, "প্রলেতারিয়েত", 'নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক কবিতা', বিউটি বুক হাউজ, ১৯৮৯, পৃ. ২৮।

৫৪. ঐ, "দূর হ দুঃশাসন", 'শান্তির ডিক্রি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

৫৫. ঐ, "লাল মলাটের বইগুলি", 'নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক কবিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

৫৬. আল মাহমুদ, "দায়ভাগ", 'আল মাহমুদের কবিতা সমগ্র', অনন্যা প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।

৫৭. ঐ, "সোনালি কাবিন", 'সোনালি কাবিন', ঐ, পৃ. ১০২।

৫৮. ঐ, "তরঙ্গিত প্রলোভন", 'সোনালি কাবিন', ঐ, পৃ. ১০৭।

৫৯. ঐ, "পালক ভাঙার প্রতিবাদে", 'সোনালি কাবিন', ঐ, পৃ. ৯৫।

৬০. ঐ, "সোনালি কাবিন", 'সোনালি কাবিন', ঐ, পৃ. ১০৪।

৬১. আবু বকর সিদ্দিক, "বাংলার বৃষ্টি", সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

৬২. ঐ, "শপথের স্বর", 'রক্তাক্ত মানচিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৬৩. আতাউর রহমান, "আকাশে মেললো ডানা", সমরেশ দেবনাথ ও নিতাই সেন (সম্পাদিত) 'দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, পৃ. ১২।

৬৪. আবুল মোমেন, "চে বা আন্তর্জাতিক গেরিলা", 'দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিবার্দী কবিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৬৫. আবু কায়সার, "আপনার সব জারিজুরি", ঐ, পৃ. ১৫।

৬৬. আসাদ চৌধুরী, "অনুগত যুঁই, তুমি ভাত হও", 'দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা', পৃ. ১৮।

৬৭. আবুল হাসান, "অসভ্য দর্শন", 'রাজা যায় রাজা আসে' খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৫৩।

৬৮. মহাদেব সাহা, "দিন মজুরের গান", 'রাজনৈতিক কবিতা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬৮।

৬৯. অসীম সাহা, "শরণার্থী", 'মুক্তিযুদ্ধঃ নির্বাচিত কবিতা', পৃ. ৮৭।

৭০. হুমায়ুন কবির, "ইস্পাত ও ফুলের ভালোবাসা", 'কুসুমিত ইস্পাত', খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪৩।

৭১. মতিউর রহমান চৌধুরী, "বঙ্গবন্ধু থেকে খালেদা", বাংলা বাজার পত্রিকা, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬।

৭২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", অসীম সাহা (সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র' ১ম খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ১৯।

৭৩. জিল্লুর রহমান/আশরাফউজ্জামান, "সিরাজ সিকদার সাফল্যে ও ব্যর্থতায়", সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৫ জানুয়ারী ১৯৮৯, পৃ. ১২।

৭৪. নূর আলম জিকু (উদ্ধৃত) আমজাদ হোসেন, "জাসদ রাজনীতিঃ জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি", সাপ্তাহিক আগামী, ৬ জানুয়ারী '৮৯, পৃ. ২১।

৭৫. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৭৬. মাহমুদুর রহমান মান্না, "সিরাজ সিকদারঃ এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সমালোচনা", সা. খবরের কাগজ, ৫ জানুয়ারি '৮৯, পৃ. ১৪।

৭৭. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", অসীম সাহা (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৭৮. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, পৃ. ২৫-২৬।

৭৯. ঐ, "প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি", ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।

৮০. ঐ, "কবিতার গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৪।

৮১. ঐ, "আগুন ও বারুদের ভাষা", অসীম সাহা (সম্পাদিত) 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র', ২ খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৪১।

৮২. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি", ঐ, পৃ. ৭০।

৮৩. ঐ, "পাকস্থলি", পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৮৪. ঐ, "স্বপ্নগুলো", পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭।

৮৫. তদেব, পৃ. ৪৮।

তৃতীয় অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় জাতীয় জীবনের হতাশা ও প্রতিরোধ স্পৃহা

বিশ শতকের প্রায় পুরো সময়টা ছিল বাঙালি জাতির জন্য সংগ্রাম মুখর কখনো রাজনীতির স্বাধীনতার জন্য, কখনো স্বাধীন দেশের জন্য এবং সমাজ সভ্যতা ও ভাষা-সংস্কৃতির জন্য বাঙালিকে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করতে হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তো অর্ধ শতাব্দী ধরে চলেছে, পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সিকি শতাব্দী ব্যাপি আন্দোলন করতে হয়েছে। তারপর অনেকগুলো মহাদুর্যোগ অসংখ্য বাঙালির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এ পৃথিবীতে ঘটে গেছে রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব; অন্য দিকে জীবন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী তত্ত্বে এসেছে ডারউইন (১৮০৯-৮২), আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫), ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৫), মার্কস (১৮১৮-৮৩)-এ্যাঙ্গেলস (১৮২০-৯৪) এবং জাতীয় জীবনের ঘন তামসিক হতাশা লাঘব করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে এসেছেন সেরা সেরা বাঙালিরা– নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), শের-ই বাংলা ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), মাস্টারদা সূর্যসেন (১৮৯৩-১৯৩৪), শহীদ ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮) প্রমুখ। তবু এক বিশাল জনগোষ্ঠী বাস করছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে শোষণযুক্ত এ সমাজে; এই পৃথিবীর অষ্টম জনসংখ্যা অধ্যুষিত সদস্য বাংলাদেশ আজো একটি ক্ষুধার্ত মানচিত্র। যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, তার চেতনাই পীড়িত মানুষের কাছে অবসিত। বাঙালির স্বপ্ন তিমিরেই রয়ে গেল; আমাদের আকাঙ্খাগুলো আহসান হাবীবের বিখ্যাত পঙক্তির মতো–'যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত'। অতীতের রক্তের পদচিহ্ন হয়নি আজো শেষ এবং ভবিষ্যতেও সেই ভরসা কই; প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় ঃ 'কত শতাব্দীর ঢেউ/ সময়ের সমুদ্রে হবে লীন/ মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মুঢ়তায় পথ হারাবে।'[১] আমাদের দেশে একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া অন্য সবার ভাগ্যে জুটেছে অনাহার, ব্যাধি, উচ্ছেদ। ইংরেজরা এ দেশ শোষণ করে শাঁস নিয়ে গেলেও মালা রেখে গিয়েছিলো; পাকিস্তানিরা সেই মালা ছিনিয়ে নিয়ে রেখে যায় ছোব্‌ড়া। তারপর আমাদের দেশীয় এলিটরা এই ছোব্‌ড়া চেটে চেটে আত্মোন্নয়নের সিঁড়ি বানিয়ে চলেছেন। কাজেই "পৃথিবী চালায় নিকৃষ্ট মানুষেরা, পৃথিবীটা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের জায়গা নয়, এটা নিকৃষ্ট পাষণ্ডদের উদ্বর্তনভূমি।"[২]

(ক) সামরিক দুঃশাসন

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে, যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য বাঙালি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে, সেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় সামরিক শাসন ব্যবস্থা বাঙালির ঘাড়ে চড়ে বসেছে, সভা-সমাবেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং সন্ত্রাস কবলিত জনপদ জাতি উপহার পেল। সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুবের দশ বছর তো বহুল আলোচিত। সে দিন বাঙালি গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং জাতিগত নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। নব্য স্বাধীন দেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ এবং পিকিংপন্থী সর্বহারা পার্টি এ সশস্ত্র বিপ্লবের লাইন ধরে অগ্রসর হতে থাকলে দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা শাসক শ্রেণীর অবহেলায় ঘটেছে, তা বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে যায়; ফলশ্রুতিতে সামরিক শাসন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রবর্তন, আইন-শৃঙ্খলার নামে হাজার হাজার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীর হত্যা। কর্ণেল আবু তাহেরের ফাঁসি। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ বহু রকম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। খাদ্য সঙ্কট, কৃষি সঙ্কট, শিল্প সঙ্কট, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি। নানা সঙ্কটের জটিলতায় দেখা দেয় অপূর্ণতার অতৃপ্তি, ক্ষুধার যাতনা, জীবনে আনে হতাশা :

আমাদের কৃষকেরা
শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়।
আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।
আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুণ।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকাল মৃত্যু আর
দীর্ঘ শ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।[৩]

জাতির ঘাড়ে চেপে আছে শকুন, জাতির পতাকা কলঙ্কিত করে যায়, পদদলিত করে যায় মনুষ্যত্ববোধ। 'মাংশভুক পাখি'গুলো মানচিত্র কামড়িয়ে খায়, স্বাধীনতা, গণআন্দোলন, ভাষা আন্দোলন সব কিছু কলঙ্কিত করে ওই নষ্ট শকুনেরা :

ওই নষ্ট চোখ
ওই চতুর ঘাতক
ওই ফুলাবৃত শকুন
খেয়ে যাবে, খেয়ে যায় মানুষের শুভ্রধান, পলিমাটি, নীড়,
জোস্নার ধমনী থেকে খেয়ে যায় সৌরভ-কনিকাগুলো।[৪]

মানুষের ভালোলাগার বোধ-শক্তিগুলো একে একে সামরিক জান্তার কবলে হারিয়ে যেতে দেখেন রুদ্র। 'মাংশভুক পাখি'র রূপকে কবি জাতীয় জীবনের এই অবক্ষয়গুলো তুলে ধরেন সন্তর্পণে, কখনো আবার উচ্চকণ্ঠে, কখনো বেদনা, কখনো নৈরাজ্যের নৈসর্গিক আতিথেয়তায়। 'সবুজাভ নিসর্গ', 'প্রিয় ফুল' ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে; সর্বত্র নেই নেই হাহাকার :

প্রেমের নিকটে গিয়ে ফিরে আসি- বুকে ভালোবাসা নেই
জোস্নার নিকটে গিয়ে ফিরে আসি- চোখে স্বাধীনতা নেই
শ্রমের নিকটে গিয়ে ফিরে আসি- বাহুতে বিশ্বাস নেই
মানুষের কাছে গিয়ে ফিরে আসি- দেহে মমতারা নেই
নেই, নেই, ফুল নেই, পাখি নেই, রোদ নেই, স্নেহ নেই,
খেয়ে গেছে গোপন ঘাতক–[৫]

"মাতালের মধ্যরাত্রি" কবিতায় সর্বস্ব খোয়া যাওয়া এক মুক্তিযোদ্ধার করুণ আর্তি আছে। যে একদিন দস্যুর সন্ত্রাসে ভীত না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাক-হানাদার বাহিনীর উপর; ভীষণ বিক্ষুব্ধ এবং সমুদ্রের ঝড়ের মতো যার ছিলো প্রতিরোধ ক্ষমতা। সে এখন ঘরহীন এক মাতাল যুবক। সামরিক শাসকের অন্ধ শাসনে মাঝরাতে পুলিশের বাঁশি শুনে সে ভয়ে কেঁপে ওঠে। কেননা–

তার বাসনার সিন্দুক ভেঙে দুরূহ ডাকাত
ছিনিয়ে নিয়েছে সব গান, স্বস্থির সোনালি ফসল।[৬]

জাগ্রত জনতার বিবেক খুলে দিতে চান রুদ্র, পীড়িত জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ঘাতকের মুখোশ উন্মোচন ঘটাতে চান রুদ্র "প্রজ্বলন্ত লোকালয়" কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আবারো জাগ্রত জনতার বিজয় প্রত্যাশা করেন। যারা জাতির কঠিন সময়ে অজন্মার দুধরাজ সাপের ভয়ে পালিয়ে যেতে চায়, তাদেরকে কাপুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের কবরেই সূর্য সৈনিকদের আগমন প্রত্যাশা করেন :

কাপুরুষ বিনাশিত হলে,
ওদের কবরে জন্ম নেবে আগামীর গুচ্ছ গুচ্ছ সাহসী সন্তান।[৭]

নির্বীর্য, কাপুরুষ, ভণ্ড রাজনীতিকদের রুদ্র বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন, প্রতারক জাতির এসব মুখোশধারীদের কাছে আজ মাতৃভূমির সাধারণ মানুষ জিম্মি। রাজনীতির মোহন ছলাকলায়, আমলাতান্ত্রিক নপুংসতায় জাতির সুস্থ্য গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা যায়, এদেরকে করা যায় না :

বেশ্যাকে তবু বিশ্বাসকরা চলে
রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
জাতির তরুণ রক্তে পুষেছে নির্বীর্যের সাপ[৮]

চাটুকার দীর্ঘজীবী হয়, অসৎ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীর মরণ হয় না, ঘাতকরা নির্বিঘ্নে সরকারের পদলেহনে বেঁচে থাকে :

হাজার সিরাজ মরে
হাজার মুজিব মরে
হাজার তাহের মরে
বেঁচে থাকে চাটুকার, পা-চাটা কুকুর,
বেঁচে থাকে ঘুণপোকা, বেঁচে থাকে সাপ।[৯]

আর বেঁচে থাকে ধর্ষিতা দেশ, দুঃখিতা মাতৃভূমি, বুকে ধারণ করে অসংখ্য কুলাঙ্গার :

সুচাগ্র সুযোগে সাপ ঢুকে গেছে লোহার বাসরে,
বিষের ছোবলে নীল দেহে নামে শীতল আঁধার,
গাঙুরের জলে ভাসে কালো বেদনা ভেলা।
দুঃখিতা আমার, তুমি জাগো বালিয়াড়ি-নদী।
নিখিল ঘুমিয়ে গেছে দিন শেষে রাতের চাদরে,
কামিনীর মিহি চোখে ঘুম এসো রেখেছে চিবুক,
জোনাকিরা নিভে গেছে সংসারের স্বপ্ন শুনে শুনে–
জেগে আছো, শুধু তুমি জেগে আছো আমার দুঃখিতা।[১০]

স্বৈরতন্ত্রী সামরিক ঘাতক সুচতুর জনগণকে আড়াল করে রাখে কালো গাড়ি কালো চশমার আড়ালে :

কি লুকাতে চাও কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ির ভিতর?
ঘাতকের চোখ? প্রতারক মুখ? নীল হিংস্রতা?
কি লুকাতে চাও? নোখ ও নোখের বুনো ব্যবহার?

কাটা জিব খানা, চর্বিল তনু কি লুকাতে চাও?
... ...
কালো কাঁচে গাড়ি কি লুকাতে চাও হননের হাত?
লোভে কামনায় লালায়িত লোল পুঁজ পচা মুখ?
কি লুকাতে চাও কালো কাঁচ গাড়ি পাশবিক থাবা?[১১]

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকেই মুখোশ ও মেকিপনার জালে বন্দী আমরা। স্বাধীনতার সোনালি স্বপ্নগুলো নাগরিক অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সব সামরিক শাসকের ব্যসন-ভূষণে, চালচলনে এঁরা মুখোশ সেটে উপস্থিত হয়। এঁদের সব কথাই স্বার্থ থেকে নিক্ষিপ্ত, কোনো কথাই হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় না। দেশ গোল্লায় যাক, সামরিক ডিনারে মজাদার খাবার পরিবেশন হয়। এঁদের কথা মেকি, চাহনি মেকি, এঁদের শ্রদ্ধা মেকি, স্নেহ-ভালোবাসা মেকি, এঁদের সকল প্রতিশ্রুতি-ই মেকি। আর স্বার্থবাদীরা এঁদের চারপাশে পদলেহন করে চলে :

সামরিক ক্যু হবার পর
সকল কু বাজেয়াপ্ত করা হলো।
কোকিলেরা পাল্টে নিলো পরিচিতি ডাক,
পাখিদের পাঠ্যসূচি তেকে কুহু স্বর পরিত্যক্ত হলো।
জলেদের কুল কুল চলা ফেরা থেমে হলো ল ল ধ্বনি,
কুস্তিগীর কুহীন স্তি নিয়ে জমালো আসর।
... ...
কুলোক সকল লোকে রূপান্তরিত হলেন,
বিভিন্ন প্রথম সারিতে তাদের মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকলো।
নটে গাছটি মুড়োলো–
অতপর কুবিহীন সুসময় বেতারে টিভিতে
প্রকাশিত হতে থাকলো প্রত্যেক দিন।[১২]

(খ) দারিদ্র্য ও সংগ্রাম

আমাদের রাজনীতিবিদরা, সমাজপতিরা যতই জাতির ভাগোন্নয়নের কথা বলেন না কেন, জাতি দিন দিন পিছিয়েই যাচ্ছে। উন্নয়নের এবং দারিদ্র্যবিমোচনের নামে অনেক কর্মসূচি আছে কিন্তু আদৌ দরিদ্রের সংখ্যা কমছেনা। যতো বিপ্লব, যতো যুদ্ধ যাদের জন্য, তারা দিন দিন আরো শোষিতই রয়ে যাচ্ছে। সব সময় বলির

পাঠা হচ্ছে সাধারণ জনগণ্ এদেশে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সাবলীলভাবে নেই বলেই আজ একদল শোষক আর অন্যদল শোষিত। দারিদ্র্য, হতাশা, নৈরাজ্য এসব কোনো দিন সম্পদের অভাবের জন্য ঘটেনা, ঘটে তার অপব্যবহারের জন্যে। স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের দেশে যত সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, সবার কাছেই জনগণ লাঞ্ছিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে।

সাঁত্রের ভাষায় বলা যায় 'সুখস্পৃহা, মৃত্যুভায়, নৈঃসঙ্গ চেতনা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা কিংবা জীবনকে অর্থহীন মনে হওয়া– এসব থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই।'[১৩] যে সমাজ ব্যবস্থায় জনতার বৃহত্তম অংশই মানবেতর জীবন যাপন করে আর মুষ্টিমেয় উদর ফূর্তিতে থাকে, সে ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা বা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বলা যায় না। আমাদের পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসকরা জনগণের সেবক, খাদেম, হিতৈষী বলে আত্মপরিচয় দেয় বটে, কিন্তু কার্যত প্রতিনিধি হিসেবে তারা স্বার্থবাদী এবং শাসক হিসেবে শোষকই। এ দেশের মানুষের শরীরে বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ লেগেছে সেদিন, যে দিন মানুষের মনের মাঝে শাষক শ্রেণী একটা কংক্রিটের পলেস্তারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ বিষণ্ণতাকে খুব সন্তর্পণে যারা অনুভব করতে পারে তারাই বিষণ্ন হয়। মানুষের ভালোমন্দ মানুষকেই বুঝে নিতে হয়, তামসিক অন্ধকার থেকে আলোর মশালে পৌছানোর দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। তবু কিছুটা আশা মানুষের থাকেই, সে আশাও যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ নিরাশার চাদরে গুমড়ে মরে নাগরিক অবক্ষয়ে :

> তাঁতকল কেঁদে ওঠে ক্লান্তির আঘাতে,
> রাজপথ বুকে নিয়ে জেগে থাকে একাকি
> বান্ধবহীন এক ইস্পাত শহর–[১৪]

তারপরও মানুষ একেবারে হতাশ হয় না, অন্তত রুদ্রের মতো প্রতিবাদী কবি মনের অপমৃত্যুর পদ লেহনে হতদ্যম থাকা অস্বাভাবিক। তিনি আদৌ নিরাশাবাদী কবি নন। যদিও পারিপার্শ্বিক উত্তপ্ততায় আত্মসঙ্কট তবু থেকেই যায়; আশা-নিরাশার দোলাচলে এক সময় আশার পাল্লাই ঝুলে থাকে :

> ক. 'অভিলাষী মন চন্দ্রে না পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই,
> কিছুটা তো চাই, কিছুটাতো চাই।
> আরো কিছু দিন, আরো কিছু দিন, আর কতো দিন?
> ভাষাহীন তরু বিশ্বাসী ছায়া কতোটা বিলাবে?
> কতো আর এই রক্ত তিলকে তপ্ত প্রনাম!
> জীবনের কাছে জন্ম কি তবে প্রতারনাময়?
> ... ...

বেদনার পায়ে চুমু খেয়ে বলি এই তো জীবন,
এই তো মাধুরী, এই তো অধর ছুঁয়েছে সুখের সুতনু সুনীল রাত।[১৫]

খ. তবু তো পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে মুখর হৃদয়,
পুষ্পের প্রতি প্রসারিত এই তীব্র শোভন বাহু।[১৬]

গ. ভাষার কিষাণ চোখ মেলে চেয়ে দেখি,
চারি পাশে ঘোর অসম জীবন,
সভ্য পোষাকে পাশবিক বন।
সমতার নামে ক্ষমতাকে করে রপ্ত,
আমি জানি কারা জীবনে ছড়ায় পুঁজ-পোকা-বিষ-তপ্ত–
জানি আমাদের কারা ধুতুরার ফুলে অন্ধ করেছে অবেলায়,
ছুঁড়ে দিয়ে গেছে নষ্ট নগ্ন বেদনায়।
আমি সেই পোড়া ভিত ভেঙে জেগে উঠেছি জীবনে,
আমি সেই কালো ঘোড়ার লাগাম ধরে আছি টেনে।
বুকের ভাষাকে সাজিয়ে বনের সজ্জায়,
আমি বুনে দিই শব্দ-প্রেরনা মানুষের লোহু মজ্জায়।[১৭]

রক্তপাতহীন কোনো বিজয়ে আনন্দ নেই, যতো দুঃখ-বেদনা, যতো কষ্টসাধ্য জয়, তার ততো আনন্দ-উল্লাস বেশি। রুদ্র সেই বিজয়ের পক্ষপাতি :

ক. হননের রক্তপাত শেষে
বিনাশের ধ্বংশযজ্ঞ শেষে
নীলিমার মতো শুভ্র স্নিগ্ধ তনু যে দ্বীপ উঠেছে জেগে
সে আমার রক্ত, মাংশ, হাড়, করোটির কষ্ট দিয়ে বোনা
একখানি স্বপ্নধোয়া হৃদয়ের তাঁত।
সে-আমার নোতুন সবতভূমি সাগরের চর,
আমার গৃহের সুখ, জীবনের নিশ্চিত প্রহর।
এইখানে আবার সাজাবো নীড়, সোনালি সময়,
এইখানে অঘ্রানের চাঁদ সমস্ত বছর দেবে নির্ভার পূর্নিমা।[১৮]

খ. নষ্ট যুবক ভ্রষ্ট আঁধার কাঁদো কিছুদিন
কিছুদিন বিষে দহনে দ্বিধায় নিজেকে পোড়াও
না হলেও মাটির মমতা তোমাতে হবেনা সুঠাম,
না হলে আঁধার আরো কিছুদিন ভাসাবে তোমাকে।
অতোটা প্রেমের প্রয়োজন নেই
ভাষাহীন মুখ নিরীহ জীবন
প্রয়োজন নেই- প্রয়োজন নেই
কিছুটা হিংস্র বিদ্রোহ চাই কিছুটা আঘাত
রক্তে কিছুটা উত্তাপ চাই, উষ্ণতা চাই
চাই কিছু লাল তীব্র আগুন।[১৯]

গ. একদিন আকাশ কালো মেঘে
ঢেকে গেলে
সমস্ত সংসার স্তব্ধ
অরন্য হয়ে যাবে
আসন্ন বিক্ষোভের প্রসব বেদনায়।
একদিন মেঘেরা জীবিত হয়ে
ঝড় হলে
জীবন্ত সমস্ত ঘরবাড়ী
একাকার হয়ে যাবে
রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্ম যন্ত্রনায়।[২০]

(গ) ক্লেদাক্ত জনজীবনের অবসান

হত্যা, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, নগরজীবনের বীভৎসতা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ইত্যকার দুর্বিপাকে পড়ে বাংলার জনজীবন রাষ্ট্রজীবন ও সমাজ বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির মাঝে বেদনা, অসহায়ত্ব, নৈঃসঙ্গ, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতির জালে এমনভাবে জাড়িয়ে গেছে যে, ওসব ছাড়া যেন আমাদের কোনো প্রাপ্তিই নেই; তার উপর সামরিক শাসনে গোদে ফোড়ার মতো এনেছে মিথ্যাচার, শ্রেণী বৈষম্য, ভণ্ডামি, প্রতারণা, ধর্মের খোলস প্রভৃতির পচা সংশ্লেষণে নাগরিক সভ্যতায় আজকের মানুষ হযে দাঁড়ালো ন্যাকড়ার মতো পরিত্যক্ত। সব সমকালীন কবির

মধ্যে তাই নাগরিক হতাশার পাশাপাশি দুঃশাসন থেকে মুক্ত হবার স্পৃহা দেখা দিয়েছে; কারণ এভাবে তো আর মানুষের জীবন চলে না; রুদ্রও তাই হত্যা-সন্ত্রাস-রাহাজানি-ছিনতাই-এর বিরুদ্ধে, দুঃশাসনের সমূলে উৎপাটনে– রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শাণিত করেন কলমের ভাষা, দুর্বার গণবিস্ফোরণের সমরসজ্জা :

হত্যা আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ব্যথিত জীবন,
আজ বড়ো দুঃসময়- ইটের দেয়ালে বন্দি ফুলের চিৎকার
ওই শোনো কাতর কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে নিষিদ্ধ বাতাসে
কথা বলো, কথা বলো অমিতাভ।
শানিত শোনিতে জ্বেলে প্রতিবাদী আগুনের লাভা
একবার বোলে ওঠো: দুঃশাসন আমি মানিনা তোমাকে,
একবার বোলে ওঠো: ভুল মানুষের কাছে নতজানু নই।
পৃথিবীতে তিনভাগ জল–
ওদের জানিয়ে দাও প্লাবনে পাহাড় ধসে, ধ'সে যায় মাটি
শিলার বিপুল মাংশ খ'সে পড়ে দুর্বিনীত জলের আঘাতে।[২১]

যেখানে লোকালয় আজ 'ভয়ার্ত শ্মশান', 'মৃত্যুহিম' এবং 'স্বস্থির অস্থিতে জ্বলে মহামারি বিষণ্ন অসুখ', সেখানে মৃত্যুকে থামাতে হবে, বিলাস, ব্যসন-ফ্যাশন চূর্ণ করে গান, পাখি, সোনালি সকাল ফিরিয়ে আনতে হবে, সবুজের সাথে হবে আমাদের কোলাকোলি, সে সময় কবে আসবে; এমন আর্তি, এমন বেদনা রুদ্রের অসংখ্য কবিতায় পাওয়া যায়, যা সমকালীন সূচিগ্রস্থ সমাজ জীবনের অবসানের প্রেরণা দিতে থাকে অনবরত। যা ধীরে ধীরে জনমানসে গণচেতনা এবং প্রতিরোধ স্পৃহাকে চাঙা করে তোলে। প্রকৃতির নির্ভরতায় তিনি খুঁজে পান বিপ্লবী প্রেরণা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. জোস্নায় দাঁড়ায় কালো বিরোধী ঘাতক
হননের রুক্ষ বসন মাখা তার তন্ত্রে তনুতে,
মৃগহীন, দ্রাক্ষাহীন আমি জাগি সাবুজিক কোলাহলে
বোধিদ্রুম, এখনো কি আসেনি সময়।[২২]

খ. আমার পরান প্রিয় এই চর, এই শস্যের মাটি,
ওরা চায় তাকে মরুভূমি আর শ্মশান বানাতে,
তমাল শিরীষ কেটে তাই ওরা বুনেছে খোরমা তরু

এই পলি মাটি চরে।
কোটি কোটি বুক এক বুকে আছে মিশে,
অস্থিতে মাখা তিতুমীর আর সূর্যসেনের লোহু,
অশোকের ঘন ছায়ার মতোন মায়ের প্রেরণা বুকে
কারে তোর এতো ডর?
কার ডরে তোর পাথর কঠিন সিনা হয়ে আছে নত?[২৩]

গ. আমার দুদিক, চতুর্পাশ বদলে যাচ্ছে,
সোনার হরিণ আমি তো খুঁজিনা শ্রীমতী জীবন
আমি তো ডাকিনা ব্যাকুল দুহাতে খ্যাতির শিখর।
শুধু আমি আমার এই কষ্ট আমার মুছে নিতে চাই,
নগরের রুখো গ্রাস থেকে সেই গ্রাম খানি মোর
দুধভাত, মিঠে, রূপশালি ধান, সেই গ্রামখানি
কেড়ে নিতে চাই কেড়ে নিতে চাই কেড়ে নিতে চাই।[২৪]

ঘ. একবার বৃষ্টি হোক, অবিরাম বৃষ্টি হোক
উষর জমিনে,
নিরীহ রক্তের দাগ মুছে নিক জলের প্লাবন,
মুছে নিক পরাজিত ব্যর্থ বাসনার গান, বৃষ্টি হোক–
বনভূমি, বৃক্ষময় হাত তবে প্রসারিত করো,
মেঘের জরায়ু ছিঁড়ি নামুক জলের শিশু
জন্মের চিৎকার ভরে দিক অজন্মা ভুবন।
... ...
কতিপয় রক্তপায়ী জীবন
কতিপয় জন্মভুক প্রানী
রক্তের উৎসব খ্যালে আমাদের প্রানের উঠোনে।
বৃষ্টি হোক, একবার বৃষ্টি হোক–
দ্বিধার আকাশ ছিঁড়ে ঝরুক প্রেরনা-আর্দ্রজল।[২৫]

ঙ. আমারে বানাও ফের আগুনের শিখা,
আমারে বানাও ফের জলবতী মেঘ।
আমারে বানাও ফের শস্যময় ভূমি
যতোটা সাহসী হাত, যতোটুকু তুমি।[২৬]

(ঘ) স্বৈরশাসক ও সন্ত্রাসকবলিত নগর জীবন

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সন্ত্রাস-ছিনতাই জীবনের অঙ্গাঙ্গি দোসর হয়েছে, রাষ্ট্রীয় জীবনে সন্ত্রাসের, হত্যার লালন পালন করা হয়েছে। এদেশে সন্ত্রাস-রাহাজানি নাগরিক জীবনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামক অস্ত্রের ব্যবহারে গণ আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের তত্ত্বে বিশ্বাসীদের বিপন্ন করে তুলেছে। এক সামরিক সন্ত্রাস থেকে আরেক সামরিক সন্ত্রাসে জনবিচ্ছিন্ন শাসক গোষ্ঠীর পদপলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সফলতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে মানব সমাজে গহনতম তমশার উৎসারণ ঘটিয়েছে। আমাদের দেশে সামরিক সন্ত্রাসবাদ মুক্তির দীশা না হয়ে একটা ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিক্রিয়ার পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সন্ত্রাস দমন করতে আরেক সন্ত্রাস বা ক্যু'র উদ্ভব হয়েছে। এক সামরিক সন্ত্রাস জন্ম দিয়েছে আরেক সামরিক সন্ত্রাসের। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে ঘন অমানিশা, বঞ্চনা, শোষণ এবং অত্যাচার তখন তা পাল্টা সামরিক সন্ত্রাসে ফেটে পড়েছে। মানুষ নতুন করে কিছু শব্দের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে লাগলো; ছিনতাই, মাস্তানি, চাঁদাবাজ, চাপাবাজি, ঘাপলা, গ্যাওড়াকল, আঁতেল, চামচা, গ্যাঞ্জাম প্রভৃতি শব্দ সচেতন কবি-সাহিত্যিকও ব্যবহার শুরু করলেন। যুব সম্প্রদায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ায় জাতীয় জীবনে আরো অপরাধ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। হতাশ যুবক, বিপথগামী যুবক চাঁদাবাজীর সাথে জড়িয়ে পড়লো।

যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে এক সময় জাতির যুব সম্প্রদায় রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সফল স্বাধীনতার জন্ম দিলো; স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা, পদস্খলণ, বৈষম্য, দুর্নীতি যুব সম্প্রদায়কে হতবাক এবং বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। লুট-তরাজের এবং অস্ত্রের ঝনঝনানির রাজনীতি যুব সম্প্রদায়ের জন্য অনুসরণীয় আকর্ষণে পরিণত হলো। দেশে সামরিক সন্ত্রাসের পথ এভাবে সুগম হলো এবং সামরিক শাসন রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও মাস্তানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত এবং সংহত করার জন্য উচ্চতর রাজনৈতিক সন্তাসবাদ লালিত পালিত হয়ে তার শাখা পল্লব গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এতে সমাজের উচ্চতর কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু ক্ষমতা এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার পায়তারা স্বরূপ সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল কর্মীদের উপর, বৈপ্লবিক পন্থার উপর প্রতিহিংসা চাপিয়ে দিয়ে হত্যা

এবং সন্ত্রাসকেই জাতীয়করণ করা হয়েছে। সমাজ জীবনে সন্ত্রাস স্বাস্থ্য, শক্তি এবং বীরত্বের লক্ষণে পরিণত হলো। অশোভন কাজগুলোই শোভন হলো এবং সন্ত্রাসই সভ্যতার নিয়ন্ত্রক, জীবনের প্রভু এবং সন্ত্রাসই ক্ষমতার ধারণ, বাহক ও পরিবর্তনের হাতিয়ার হলো। কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষ বড়ই অসহায়, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা তাদের রাইফেলের নলে জিম্মি করে রেখেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাস ফ্যাসিবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কত খুন আর অপমৃত্যু ঘটেছে প্রতিদিন ছোট্ট এ দেশটির গ্রামে গঞ্জে; শহরে-নগরে। দিন দিন আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলোতে খুন-খারাবি ও ধর্ষণের সন্দেশ হয়েছে। স্বাধীনতায় আমাদের বড়ো পাওনা হলো আত্ম সঙ্কট; না-বোধক বেদনায় নিমজ্জন। অনেকে আবার নরকে থেকেও স্তব গানে মুখর ছিলেন, একটুখানি সামাজিক স্বীকৃতি এবং সুবিধাবাদী সিঁড়ির উচ্চে আরোহণের জন্যে। দিবাস্বাপ্নিক ঘোরে আমাদের কবি বিজয় স্তবগানে ৫২, ৬৯, ৭১-এর ক্লেদ, বীর্যতার এবং নৈরাজ্য অবসানের পরিক্রমা পেরিয়ে কাস্তে-হাতুড়ির বিশ্ব বিজয়ী আস্ফালনে মাতোয়ারা হয়ে থাকলেন। আশার কুহকের জালে জীবন চক্র জড়াতে মূল ভীত যেখানে নড়বড়ে, তার আশার শিকল বাঙালির সর্বাঙ্গে জড়াতে গিয়ে ঘোরতন্ত্রার বেশে লেলিন, মাও, চেবা, ক্যাস্ক্রো হয়েছেন। তবু তারা সত্য ভাষণ দিয়েছেন, কুহক ও অমানিশার জাল ছিন্ন করে সাহসী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন; ক্ষুধা-দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষক-শ্রমিক ও সর্বহারার কল্যাণে সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেছেন; কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদীতায়, ক্ষমতা লোলুপ চক্রান্তে পড়ে সে শ্রেণী সংগ্রাম নেতৃত্ব দিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বিভিন্ন জনপদে তারাই আবার আতঙ্ক এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। এক সামরিক সন্ত্রাসকে দমন করতে নিজেরাই আরেক সন্ত্রাসের জন্ম দিলো। তবু আমাদের গণচেতনার কবিরা, সমাজ-চেতন ঘটালেন এবং জাতীয় জীবনের জঞ্জাল সামরিক সরকার হঠানোর জন্য সংগ্রামশীল মানুষকে জাতীয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেন। তাঁরা আশার বাণী শোনালেন, নিরাশাগ্রস্থ জাতিকে তমসার অতল থেকে ভোরের শুভ সকালের দরোজায় উপস্থিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালালেন, যার দ্বারা পরবর্তী গণঅভ্যুত্থানের রাস্তা পরিষ্কারও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমাজ জীবনে যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিলো সামরিক সরকার, তার শেকড় উৎপাটন করা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তাদেরকেও নির্ভর হয়ে থাকতে হচ্ছে ঐ বৃত্তির উপর আস্থা ও সহযোগিতা করে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সমাজ জীবনের এসব জঞ্জালের কথা বলেছেন, মানুষকে সজাগ করেছেন, সমতার মন্ত্রে উদ্দীপ্তও করেছেন। মানবিক মূল্যবোধের অফুরন্ত সম্ভাবনা যে আমাদের আছে, তার কথা বলেছেন, আমাদের জাতীয় জীবনের করুণ দিকগুলোর উল্লেখ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সৎসাহস সঞ্চার করেছেন। দুঃখ-ক্লেদ-মৃত্যু-মহামারির শুধু বিকর্ণ বিবরণ এবং হতাশার গ্লানির বিবরণে তাঁর কবিতা ঠাসা নয়। যেখানে অবক্ষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে আবার আশার আলো জ্বালাতে চেয়েছেন, এটা জাতির জন্য কম পাওনা নয়। সমাজ জীবনে জেঁকে বসা স্বৈরশাসনের অবসানের জন্য গণ মানুষকে একত্রিত করা এবং

আন্দোলনের পথ সুগম করে প্রকৃত স্বাধীনতার সুফল জনগণের মাঝে ফিরিয়ে দিতে তাঁর শ্রম-মেধা-মননকে সম্মিলিত করে উচ্চকিত হয়েছেন, চিৎকার করেছেন এবং সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন, এটা কম সাহসের ব্যাপার নয়। সময়ের প্রতিটি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবিতার শাণিত উচ্চারণ এবং কবিতাকে সমসাময়িক বাস্তবতায় উপস্থাপন করেছেন। শুধু মন্ময়তার চাষাবাদ যে কবিতা নয় এবং কবিতা যে সমাজ-রাজনীতিরও অনুষঙ্গ, তা সগর্বে প্রচার করেছেন; এতে যে কবিতার সতীত্ব হরণ হয়নি এবং কবিতার বিষয়পুঞ্জে ও শব্দপুঞ্জে সমকালীন প্রসঙ্গও গভীর ও লিরিকধর্মী হতে পারে, তা প্রমাণিত করতে পেরেছেন। পোড়া জমিতে ফসলের আবাদ করেছেন, কৃষক-শ্রমিকের বুকের আশা ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। দেশে ফসলি বিপ্লবের কথা বলেছেন, মাঠে-ঘাটে বাঙালির বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন; অরাজকতার বিরুদ্ধে এটাও একটা প্রতিবাদ। কৌম সমাজের বাঙালির অহিংস আচরণকে এভাবে আবাদে আবাদে ভরিয়ে দিতে চাওয়া একটা বড়ো মনেরই পরিচায়ক। হিংসা-হত্যা-রাহাজানি ভুলে জাতি আবার আবাদে মগ্ন হবে, এ ধরনের কবিতাগুলো সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় ফসলি বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. মুহূর্তের চূর্ন পরমানু ডেকে বলে : ওই দ্যাখ রে অবোধ
ওই তোর হারানো অতীত, ওই তোর পরানের ভূমি।
কিছু তুই চাষাবাদ শেখ, শিখে রাখ জমিনের ভাষা
গর্ভিনী রমনী তোর এই ক্ষেতে বুনেছিলো ফসলের বীজ
এই ক্ষেতে রমনীর তামাটে শরীর আর সকল্যান বাহু
একদিন শস্যের সুগন্ধ মেঘে ফিরে গেছে অঙনের নীড়ে।[২৭]

খ. সত্যের লাঙলে চিরে এই পোড়া বুকের জমিন
আমিও ফসল হবো, হবো আমি শস্য ভরা ক্ষেত,
সোনালি অঙ্গনে তুমি আঁটি আঁটি ধান তু'লে নিও।
আবার নবান্ন কোরো, অতিথিরে নারায়ন জেনে
শাকান্ন, ঝোল, আমসত্ব, খেজুর-পাটালি
কাসার থালায় এনে খেতে দিও শীতল পাটিতে।[২৮]

গ. এ-ধান আমার
আমার অস্থি মজ্জায় তার গন্ধ রয়েছে মিশে,
আমার লাঙল যে-নারীকে চ'ষে জঠরে বুনেছে বীজ

ভাতার না-হোই আমি তবু তার শিশুর জনক হবো।
গহিন গাঙের নোনাজলে ফোটে টগবগ কোরে বুকে
ভেঙে পড়ে পাড় বিশাল বৃক্ষ প্রপিতামহের ভিটে
আসে জল, আসে বারুদ প্লাবন দরিয়ার বিক্ষোভ।[২৯]

ঘ. কবে পাবো? কবে পাবো আল্‌হীন একখণ্ড মানব-জমিন?
পরবাস-থাববেনা, থাকবেনা দূরত্বের এই রীতিনীতি।
মহুয়ার মদ খেয়ে মত্ত হয়ে থাকা সেই পার্বনের তিথি
কবে পাবো? কবে পাবো শর্তহীন আবাদের নির্বিরোধ দিন।[৩০]

সামরিক সন্ত্রাস জাতির ঘাড়ে এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে, কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিবাদে না ফেটে উপায় ছিলনা। মুক্তিযুদ্ধের সফলতা রুগ্ন রাজনীতি নয় এবং সামরিক সন্ত্রাস আমাদের রাজনীতির অঙ্গন এমনই উত্তপ্ত করেছে যে, রুদ্রের মতো সচেতন কবিদের সারাক্ষণ রাস্তায় নামিয়ে রাখলো। অন্য দিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা জণ্ডিস রাজনীতির কবলে পড়ে সর্বত্র ক্ষুধার ও দারিদ্র্যের এবং সন্ত্রাসের বদৌলতে কবিতার পঙতিতে পঙতিতে ঘোষিত হলো অসহায়ত্ব, নৈঃসঙ্গ্য, বিভীষিকা, দুঃস্বপ্ন, রুগ্ন প্রেমের উদ্বৃত জ্বালা, আর্তি এবং বেদনা। নয় মাসের কঠিন সংগ্রামে যারা জীবনপণ লড়াই করেছে, তারা যুদ্ধ ময়দানে নয়, ক্ষুধার লাম্পাট্যে তারা স্বাধীন স্বদেশে মারা গেল। মুয়াজ্জিনের ক্ষীণ কণ্ঠে সেই ক্ষুধার ঘোষণা দেয় ঃ 'পাঁজরের হাড়ে তার শব্দহীন বেজে ওঠে ক্ষুধার আজান/ রাত্রি শেষ। পাখি ডাকে। আরেক আঁধার তবু পৃথিবী ভাসায়'।[৩১] চারদিকে চলছে নির্বিবেকের রাজত্ব। তাই রুদ্রের কবিতায় আমরা খুঁজে পাই মানবিক আবেগ-উপলব্ধির সারাৎসার; সত্যের নির্লজ্জ প্রকাশ এবং সামাজিক সমস্ত কলুষিত আবর্জনার বিপক্ষে ঘোষিত হয় উত্তেজিত কবিতা; এক নায়কত্বের অবসানে জনমানসের সামনে শোষিত এবং অত্যাচারিত মানুষের ভয়াল চিত্র। আদিম ক্ষুধা নয়, মানুষের দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় ভারাক্রান্ত বাংলার বাতাস; মৃত্যু আর ক্ষুধার রাজত্ব :

ক. দেহের আগুনে নয়, ক্ষুধার আগুনে পোড়া এইসব বুক,
জীবনের মাংশে এক বিষ ফোড়া, জীবনের গভীর অসুখ।[৩২]

খ. কী দিয়ে জুড়াই জ্বালা, নিভাই জঠর? জীবনের শূন্য ডালে
কী করে ফুটাই পাতা? চারিদিক ঘিরে আসে সর্বনাশা কাল।[৩৩]

গ. রাত নামে, মৃত্যুময় রাত নামে শরীরের ঘরে,
এই রাত জোস্নাহীন, জোনাকিও নেই এই রাতে।

কেবল আঁধার, এক ভাঙনের বিশাল আঁধার,
কেবল মৃত্যুর ছায়া স্বপ্নময় দুটি চোখ জুড়ে।[৩৪]

ঘ. বিষের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়েছে ঘাতক সময়
নগ্ন এই দুই চোখে সর্বনাশা অপচয় জ্বলে,
সময় দিয়েছে তুলে এই হাতে অফুরন্ত ক্লেদ,
আর দিছে রক্তে মাংশে জীবনের তপ্ত অন্ধকার।[৩৫]

পনেরো বছরের সামরিক সন্ত্রাস জাতীয় জীবনে যে অমানিশার সৃষ্টি করেছে, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের চাপে পড়ে অসুস্থ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত দেশে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের গলা টিপে হত্যা করেছে; ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার ঝলসানো শুধু রুটি নয়, কোরীয় কবি কিম চি হা'র "ক্ষুধা" কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়, ক্ষুধা মানুষকে কতোটা উন্মাদ বানাতে পারে :

দীর্ঘ উপোস আর মাটি ঘস্টে
এ বিশাল শূন্য জঠর টেনে টেনে আমি
পাগল এখন।
আমি সারা দেশটা খাবার দাবার হীন
ক'রে রেখে যাবো।
তারপর যাবো সিউল, যাবো
পথে পথে খাবার সংগ্রহ ক'রে-ক'রেঃ
মাছের কাঁটা, গাছের শিখড়,
কুকুরের এঁটো হাড়গোড়,
ডিম, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট
লোহার টুকরো।
পুরুষ ও নারী,
যা-কিছুই পুষ্ট, নধর–
এমনকি মানুষের মাংশ হলেও– তা খাবোই।
উফ্, এমন অসহ্য ক্ষুধার্ত আমি
পারলে রৌপ্য মুদ্রাও খাই।[৩৬]

বাংলাদেশে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত পনেরো বছরের সামরিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুদ্রের কবিতা শোষিত ও দুঃখী মানুষের পক্ষে ছিল, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা পুরোপুরি উত্তেজনাকর; নৈরাজ্যের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত কবি একটু নিশ্চয়তার জন্য হাহুতাশ করেছেন, রাজপথ মিছিলে মিছিলে সরব করেছেন, এবং চিৎকার করিয়ে বেড়িয়েছেন বাংলার সভা-সমিতি এবং প্রতিটি গণআন্দোলনে। মঞ্চ সরব কবি জাগিয়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষের বিবেক বোধকে। নৈরাজ্যের, নৈরাশ্যের অতলে তলিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের বাংলাদেশে আজ নিশ্চয়তা নেই। ক্যু, হত্যা, ষড়যন্ত্র, অবৈধ দখল, লুটপাট, চাকরি ও পদ দখল, অর্থ-বিত্ত-বৈভব উপার্জন, দুর্নীতি-লাম্পট্যের অভাবিত বিস্তার, আইনের শাসনের অবজ্ঞা এবং সংবিধান ধ্বংস। এই অবস্থা হলে কোনো কবি-সাহিত্যিক সচেতন-বিবেকবান মানুষের মনের মধ্যে নৈরাজ্য চেতনা, হতাশাবোধ জাগ্রত না হয়ে পারেনা। রুদ্রের কবিতায়ও হতাশা ও নৈরাজ্য এসেছে, তা এসেছে সেই হতাশা ও নৈরাজ্য উত্তরণের জন্যই। যা দেশের জীর্ণ, বিদীর্ণ ও বিবর্ণ পতাকার এবং গ্লানির পরিচায়ক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. আমাকে জবাই করে নৈরাজ্যের নিরাকার চাকু,
অস্থির অশ্বের ক্ষুর অবিশ্বাস আমাকে পোড়ায়।[৩৮]

খ. মা, এই পরাধীন শরীরে কোথাও মুক্ত আকাশ নেই, মাঠ নেই–
রক্তে মাংশে খরার পতাকা উড়িয়ে রেখেছে ভিন্ন শাসক সেনারা।[৩৯]

গ. স্বদেশের রুগ্ন দেহে উল্লাসে মত্তজীবন-কুকুর-শকুন–
তাদের কলুষ হাত ধরে রাখে জাতির পতাকা।
হে আমার প্রতারনা–রুগ্ন লোভের কালিমা– হে আমার ক্ষয়
বিশ্বাস থেকে খসে পড়ো অনাবশ্যক হলুদ পাথর
খ'সে পড়ো, মৃত্যু হও।[৪০]

ঘ. আজ আর বৃষ্টি নেই– আজ শুধু জ'মে আছে মেঘ
জীবন বিরোধী মেঘ,
অরন্য-জীবন নেই আজ আছে জীবনে অরন্য–
পশুরা গিয়েছে বনে সে-ভূমিকা নিয়েছে মানুষ।[৪১]

ঙ. দ্বিমুখি সত্যের নিকটে খণ্ডিত তরুন তাপস,
আর কতো মৃত্যু মথিত হবো, মর্মস্থলে পোড়াবো নিজেকে।

আপন কথার কাছে আপনার না-বোঝা গ্লানির ক্লান্তিতে
কতো আর নিরুক্ত বিশ্বাস বুকের ভেতরে রেখে বাড়াবো দীর্ঘশ্বাস!
প্রিয় মুখ– প্রিয় পাখি– প্রিয় পাওয়া ফিরে যাবে
ভেজা চোখ করুন কাতর !![৪২]

পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করা গর্বের বাংলাদেশ, সবুজের বুকে লাল সূর্যের উদ্ভাসনে পতাকা বুকে নিয়ে ভুল চালনায়,– নাবিকের ভুল সিদ্ধান্তে জাতির বুকে চেপে বসা দুঃশাসনের ভিত দিন দিন মজবুত হলো, একে আর ঝেঁড়ে তাড়ানো যাবে না, আরেকটি রক্তাক্ত বিপ্লবের দরকার, আরেকটি সমতার আন্দোলন; শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বে মাটির বুকে আবার শস্যের ফসল হবে, কৃষকের মুখে হাসি হবে; এমন আশা রুদ্রের কবিতার শরীর জুড়ে। কিন্তু যখন তা হচ্ছে না– দুঃশাসন শকুনের মতো কামড়ে ধরেছে জাতির পতাকা, তখন আরো বিষণ্ন-বেদনা বুকে গুমরে ওঠে, স্বাধীনতাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে চান :

দিন তো এলো না!
পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে ছিঁড়ে নেয়া সেই ভূমি
দুর্ভিক্ষের খরায় সেখানে মন্বন্তর এলো।
হত্যায় আর সন্ত্রাসে আর দুঃশাসনের ঝড়ে
উবে গেল সাধ বেওয়ারিশ লাশে, সাদা কাফনের ভিড়ে,
তীরের তরীকে ডুবালো নাবিক অচেতন ইচ্ছায়।[৪৩]

যে যুবক একরাশ স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গেল, জীবন বাজি রেখে স্বপ্নের নীড়ের জন্য লড়াই করলো; স্বাধীন দেশে সে তার প্রাপ্য পেলো না, অবহেলা-লাঞ্ছনার শিকার সে, জীবনের কঠিন বাস্তবতায় আজ তার ভিটে নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। অথচ জাতির কুলাঙ্গারেরা, শকুনেরা সুখে আছে। রক্ত উত্তাল করা স্মৃতিগুলো, নয় মাস ব্যাপি সংগ্রামের মুখর দিনগুলো তাকে তাড়া করে, আজ স্বাধীন দেশে সে অবহেলিত। "চিঠি পত্রের গল্প" কবিতায় রুদ্র আবার স্বৈরাচারের মুখোশ উন্মোচন করতে চান :

বাজারে চালের হু হু বেড়ে যাওয়া দাম,
মরিচ তেলের কৃত্রিম সঙ্কট,
প্রশাসন জুড়ে লুটের মহোৎসব,
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই–
চিঠিগুলো রোজ চুরি করে কে বা কারা?
আমার সকল দুর্ভাবনার কথা,

দুঃশাসনের সকল স্বৈরাচার,
চতুর্পার্শ্বে রাতের বাড়ানো থাবা–
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই–
মাথার উপরে খড়্গ রয়েছে খাড়া,
বাঘের থাবায় অসহায় খরগোশ,
পিচের সড়কে রক্তের কারুকাজ,
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই–
মিছিলের পরে পুলিশের খুনী ট্রাক,
সুবিধাবাদের রমরমা রাজনীতি,
সংলাপে সুখি নেতাদের নটিপনা–[৪৪]

ঙ) চিত্ত চায় শুধু বিত্ত

স্বৈরশাসনের কল্যাণে সমাজে অসৎ মানুষেরা বসে আছে টাকার স্তূপের উপর, অর্থ-আভিজাত্য সব ওদের করতলে। এরা স্বৈরশাসনের পদলেহনে ব্যস্ত, এদের গোপন জিভ সামরিক সরকারের পা চেটে চলেছে, আর প্রাচুর্যের অট্টালিকা গড়ছে। অথচ জনতার দিকে যাদের মুখ, যারা জনকল্যাণের জন্য চিৎকার করে যাচ্ছে, মিছিল মিটিং প্রতিবাদ করছে, তাদের ভাগ্যে সরকারী সন্ত্রাসী পেটুয়া বাহিনীর ষ্টীম রোলার। নিকৃষ্ট লোকেরা, কেউ কালোবাজারি, কেউ অসৎ ব্যবসায়ী, কেউ উৎকোচ গ্রহণকারী, মাস্তান, গুণ্ডাদের জীবন উৎকৃষ্ট। যেমন :

ষড়যন্ত্রের গোপন কালো মেঘ চারপাশে আজ,
বিধ্বস্থ হয়েছে দ্যাখো বিশ্বাসের সুগভীর ভিত।
মিছিলের অগ্রভাগে যারা হাঁটে নিশ্চুপ গম্ভীর,
বুলেটের সামনে তারা কখনো দাঁড়ায়না জানি–
তাদের রয়েছে ঘর সুসজ্জিত নরোম বিছানা,
রয়েছে বাণিজ্য ব্যবসায় আধুনিক দ্রুত যান,
নিশ্চিত আগামি আর পরিপুষ্ট ব্যাংকের ব্যালেন্স,
এরা কি ভাঙতে চাবে কোন দিন বৈষম্যের খাঁচা?[৪৫]

একজন স্বৈর শাসকের পদলেহনকারী আমলা আর একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার চেহারা কেমন, "মানুষের মানচিত্র"-এর ২২নং কবিতায় তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। যেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা

যুদ্ধ জয় করে বিজয় গর্বে দেশে ফিরে এসেছে, তার মৃত্যু হয়নি, অথচ নিজ স্বাধীন ভূমে আজ তার লাশ, তাও আবার চেনা যায় না। জীর্ণ-শীর্ণ ক'খানা হাড় :

উপরে তাকাও, দ্যাখো ওই মুখ চেনো তুমি, ওই যে মানুষ?
শকুনের মতো চোখ, ঠোঁটে রক্ত, কালো শুকনো জমাট রক্ত,
নোখে লেগে আছে দ্যাখো শিশুর মগজ-মাংশ, কুমারীর লজ্জা।
আর দ্যাখো একজন যুদ্ধের মানুষ কী বিমর্ষ, রুগ্ন, ম্লান–
সেই প্রিয় মুখ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাচ্ছো না
সেই চেনা দেশ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাচ্ছো না
সেই বাংলাদেশ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাবে না
ত্রিশ লক্ষ লাশের উপর ওই ছিন্ন ভিন্ন জাতির পতাকা।[৪৬]

যে শাসকই থাকুক না কেন, যেই মসনদে আসীন হোক– আমাদের আমলাতান্ত্রিক রাঘব বোয়ালেরা তার স্তুতিতে ব্যস্ত, নিজেদের আদিম ক্ষুধা, ব্যসন-ফ্যাশনে আর প্রাচুর্যে মাতোয়ারা, রুদ্রের কবিতায় স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদদের নৃশংস চেহারা ফুটে ওঠেছে; অল্প দামে এখন মগজ-ঘিলু বিক্রি হয় রাজনীতির মাঠে, অভাবী দেশে সামরিক স্বৈরাচারীরা স্বল্পমূল্যে মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারে, পেয়ে যায় পা-চাটার দলদের :

মাংশের দোকানে আজ পেয়ে যাবে পণ্ডিতের কিমা,
বিশ টাকা সেরে পাবে তাজা মধ্যবিত্তের পাঁজর,
খাশির সিনার পাশে চমৎকার তরুনের রান,
নগরে বেশ্যার মতো পেয়ে যাবে নেতার কলিজা।
বিত্তের সামালে ব্যস্ত বিত্তবান বিভিন্ন লেবাসে,
একবার সামরিক, একবার বিচিত্র সংসদ,
একবার গণতন্ত্র, একবার অস্ত্রের সঙ্গিত–
মসনদে একমুখ, হেলমেট, ভিন্ন শুধু নাম।[৪৭]

বিত্ত-বৈভব আর প্রাচুর্যের চূড়া স্পর্শ করতে সামরিক সহায়করা নিজেদের মূল্যবোধ হারিয়ে এক সময় নরকের দিকেই এগিয়ে যায় :

তুমি তো পেয়েছ কেবলই সুরার সৌরভ,
নেবু গন্ধ নারীর ত্রিভুজ

আর অবিরল শারীরিক উলঙ্গ উৎসব।
কেবল তোমার চোখে সেঁটে ছিলো
কাড়ি কাড়ি টাকার বাণ্ডিল,
ক্ষমতার মসৃন পিচ্ছিল এক সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
তুমি তো পৌঁছেছো
নরকের নিসঙ্গতা-মাখা সোনালি চূড়ায়।[৪৮]

আভিজাত্যের প্রাসাদ শীর্ষে সরকারের তোষামোদ করে কারা আরোহণ করতে পারে এবং এতে কি যোগ্যতা সরকার মশাই যাচাই করেন, রুদ্রের "যোগ্যতা"– কবিতায় তার বর্ণনা :

পায়ের গন্ধের প্রতি যার আছে দুর্ণিবার ঝোঁক,
যে শিখেছে পা চাটার ছলাকলা, বিচিত্র কৌশল,
কুকুরের মতো যার লাথি খেতে আহ্লাদ জাগে।

স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে রেখে পশ্চাতের মাংশময় ভূমি
যে পারে প্রভুর জন্যে এনে দিতে লাথির আরাম,
'জ্বী হুজুর' ছাড়া আর সব শব্দ যে গিয়েছে ভুলে।

যার কোনো স্মৃতি নেই, ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখ নেই,
কি স্বপ্নে কি জাগরণে হুজুরের জুতো মোবারক
জেগে থাকে মাথার ভেতরে যার মস্তিষ্কের মতো।

একান্ত তারই জন্য হুজুরের দরোজাটা খোলা,
এ-সময়ে সেই পাবে সৌভাগ্যের সুগোপন সিঁড়ি।[৪৯]

সভ্যতার মোড়কে এসব বিনাশী মানুষ সমাজে নিত্য ডেকে আনে মৃত্যু, রক্ত, লাশ; 'শ্বাপদ-স্বভাব মাখা লোভাতুর দাঁতের কৌশলে' জাতির রুগ্নতাকে করে চাষাবাদ এবং ধ্বংশ, ক্ষয়, লেলিহান ক্রোধ ঢেকে রাখে বুকে। এঁদের সম্পর্কে রুদ্র বলেন :

ক. কতিপয় হিজড়া-পণ্ডিত আর মুর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে
মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো।
(ক্লান্ত ইতিহাস/ উপদ্রুত উপকূল)

খ. কুকুরে শকুনে টেনে ছিঁড়ে খায় মায়ের শরীর এই জনপদে,
ঠেকাতে পারিনা– কণ্ঠ বাহুতে ঝুলে আছে তালা রাজার এনাম।
(বিশ্বাসের হাতিয়ার/ উপদ্রুত উপকূল)

(চ) জীর্ণ সভ্যতা

আধুনিক যুগের জয়গানে আর অট্টালিকার চাকচিক্যে এবং নিয়ন আলোর বন্যায় আমরা নগরকে যতই বিচিত্র সাজাই না কেন, সভ্যতার যান্ত্রিকতায় হত্যা-পাপ-গ্লানিগুলো চাপা থাকেনা, যতই পলেস্তারা মারিনা কেন, রক্তের গন্ধ নাকে এসে লাগে। বিশ শতকের প্রবাহিত রক্তের বন্যা আজকের সভ্য সভ্যতাকে কলঙ্কিত করেছে, তারপরও দুঃখ ভারাক্রান্ত বেদনাগুলো চাপা দিয়ে বলি 'সভ্যতা অপরূপ'। যদিও লেগে আছে 'আজো আদিম জীবন, বিশ শতকের ধুলো'।[৫০] অভাব-দারিদ্র্য মুখোশধারী সভ্যতা কতটুকু তার প্রতিকার করতে পেরেছে :

মাথার খুলির প'রে, মগজের তলদেশে
সারারাত সারাদিন সাড়ে তিনশত কোটি কাক
ঠোকরায় বিরতিবিহীন।
অভাব–অভাব আসে ঝাঁক ঝাঁক বুনো শুয়োরের মতো।[৫১]

যেখানে আজো মৃত্যুর হিমশীতল আবহ, সামরিক জান্তা ঘাড়ের উপর উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলছে; সেখানে সভ্যতার গুণকীর্তনের দরকার নেই, রুদ্র বলেন :

কারা তবে মুখী হয়, নীলিমায় ওড়ায় ফানুস!
কারা এই দুঃসময়ে চ'ড়ে ফেরে অলীক জাহাজ?
ঘরভরা মৃত্যুহিম, লোকালয় ভয়ার্ত শ্মশান।
গান নেই, পাখি নেই, শব্দ নেই– নিশব্দ থামাও
এ ভীষণ বেদনার রক্তচোখ, ডাকাত নৈশব্দ ...[৫২]

সর্বত্র তাজা বারুদের গন্ধ, সামরিক সন্ত্রাসে নিরুপায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন, 'জনপদে জ্বলে শোকের মলিন চিতা'[৫৩] এবং 'ক্ষুধায় কাতর মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে'[৫৪], সেখানে সভ্যতার কীর্তনের স্তুতির, আর শকুনদের জন্য তোরণের দরকার নেই। হিরের চমকের নিচে সভ্যতা লুকিয়ে রাখে নোংরা, বিদঘুটে

অন্ধকারগুলো, রুদ্র তা টেনে বের করতে চান; "মানুষের মানচিত্র- ১৮" কবিতায় রুদ্র নগর কেন্দ্রে গড়ে ওঠা পতিতা এবং এর নোংরামু তুলে ধরে বীভৎস সভ্যতার বুকে চপেটাঘাত মেরেছেন :

নর্দমার পচা কফ, কালো রক্ত, বীর্য, মুত, মাতালের বমি,
বাতাসে মদের গন্ধ, বেসুরো গজল আর খিলখিল হাসি।
ঘুমন্ত শিশুর পাশে পিষ্ট হয় ন্যাংটা দেহ, ভাড়াটে শরীর,
স্টোভে ভাত ফোটে, দরোজায় গেঁথে থাকে দালালের ধূর্ত চোখ।[৫৫]

বৃত্তের চূড়ার শোভন মানুষগুলো নিজেদের প্রয়োজনে কতগুলো ক্ষতের দ্বারা নাগরিক ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, এরা জৌলুসের জন্য এবং বিকৃতি মানসিকতার জন্য নোংরা পতিতার ধারক ও বাহক; সুরা-নারীসঙ্গের জন্য গড়েছে আবাসিক নিসঙ্গ প্রাসাদ এবং ভ্রাম্যমান নগর গণিকার ভীড়ে সভ্যতার বিবর্ণ মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে "ইটের নিসর্গ" কবিতায়। দুটি অংশ এমন :

ক. স্বেচ্ছাচারী পুরুষেরা নগরের রঙিন গুহায়
বিচিত্র বিকৃতি আর কামনার অন্তহীন ক্লেদে
রেখেছে সজীব কোরে নারকীয় নষ্ট অন্ধকার,
রেখেছে সাজিয়ে পাপ, অনাচার সুদৃশ্য মোড়কে।[৫৬]

খ. চক্ষু ফেরাও কেন? তাকাও দ্যাখো হে সভ্য নগর,
হে সচতেন সভ্যতা, তোমার পুঁজি ও বিলাসের চিহ্ন,
তোমার বিজ্ঞান, তোমার অগ্রযাত্রার ইতিহাস
ধারন করেছে ওই নগ্ন, জীর্ন ক্ষুধার্ত শরীর।[৫৭]

"এক্সরে রিপোর্ট" কবিতায় মেকি সভ্যতার বদৌলতে নগর জীবনে বিভিন্ন অবহেলিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানবেতর জীবন যাপনের চিত্র আছে, বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে বাধ্য হয়ে দুঃখী মানুষগুলো এবং তাদেরকে ঘিরে স্বার্থবাদী মানুষের বিচিত্র উল্লাসের, আনন্দ-মৌজের চিত্র বর্তমান; যা আমাদের সামরিক সভ্যতার দান :

বিষন্ন হাসপাতাল থেকে স্বজনের কাঁধে হাত রেখে
বাড়ি ফিরে যাবে অঙ্গহীন কলেজ তরুন।
নিহত শ্রমিকটির বউ
শরীর বেচবে শেষে শরীরের টানে,
হাত ভাঙা টোকায়ের হাতে উঠবে ভিক্ষার থালা,

আর আহত হবার অপূর্ন বাসনা বুকে নিয়ে
ছাউনিতে ঝিমুবে পুলিশ।
... ...
শিল্পীরা আঁকতে বসে যাবে দুটি সন্তান যথেষ্ট,
গলাবাজ গায়কেরা গেয়ে উঠবে নোতুন বাংলাদেশ ...
পাঁচতারায় উথাল উপচে পড়বে
কৌটোবন্দি ভল্লুকের ফেনা।[৫৮]

অথচ এই সামরিক সভ্যতার স্তুতিতে প্রতিদিন ছাপা হয় অসংখ্য পত্রিকা। তার নিচে অসহায় মানুষের করুণ আর্তি, কারো কানে পৌছায় না। দু'মুঠো অন্নের সংস্থানে ন্যাংটো টোকাইরা ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে বেড়ায়। এটা সভ্যতার ধ্বজাধারীদের 'রক্তমাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পোকা-ধরা ক্ষত/ছুঁয়ে আছে জীবনের সবকটি ফুল'[৫৯] অথচ বাইরে প্রচণ্ড খরা, স্তব্ধ অন্ধকার। সভ্যতার নভোযানগুলো শ্রমিকের মৃত্যু পরোয়ানায় গড়ে ওঠে ছুটে যাচ্ছে অন্য সুদূরের গ্রহের পানে, গোপনে রেখে দগ্‌দগে ক্ষত :

লাঙলের ফলার আঘাতে
মাটি থেকে উঠে আসে চকচকে ক্ষুধা,
বস্ত্রকলে ক্ষয়কাশ, জঙধরা শ্রমিকের হাতে
পাকা আপেলের মতো অনিশ্চিত দিনমান।

সামান্য খাদ্যের 'পরে ঝাপিয়ে পড়ে অসংখ্য রুগ্ন থাবা,
অথচ রোদের রঙ অবিকল; সূর্য ওঠে,
বাতাসেরা বয়ে আনে নিসর্গের অমলিন ঘ্রান,
সভ্যতার স্তুতিকোরে প্রতিদিন ছাপা হয় অজস্র কাগজ।[৬০]

কি দরকার ছিল এমন সামরিক সভ্যতার, তাই কবির বিপন্ন হৃদয়ে সভ্যতা মলিন-বিচূর্ণ হয়, বিস্ময় বোধ করেন সভ্যতার গ্লানিময় চূড়াকে "পান করো রঙিন শিখর!/ এতো ঘাম দিয়ে/ সভ্যতা সাজাচ্ছে তার মখমল চূড়া।'[৬১] "চিত্রনাট্য- ২" কবিতায় বলা হয়েছে 'মানুষ মরছে বিষে, বোমায়, চাকুতে, বুলেটে ও বেয়োনেটে এই সভ্যতায়। মৃত্যু ছাড়া মানুষের অন্য কোন পরিচয় নেই।'[৬২] "গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়" কবিতার মধ্যে রুদ্রের আরো ক্ষোভ, আরো খেদ ঝরে পড়ে :

আমি ফেরাতে পারিনা সভ্যতার অবিরল ক্ষতি,
আত্মরমনের ক্লেদ, জলে ভাসা পুষ্পের সংসার,
শিশুর মড়ক, আমি ফেরাতে পারিনা মহামারি,
ভ্রূণ হত্যা, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হননের হাত ...[৬৩]

(ছ) স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্ন

একনায়কত্ব সামরিক সন্ত্রাস আমাদের স্বপ্ন-স্বাদগুলো একে একে ধ্বংস করেছে, এখন স্বপ্নগুলো বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে; স্বপ্নহীনতাই এখন বাঙালির সম্বল, স্বাধীনতা পেয়েও স্বাধীনতা এখন বোঝাই করা নৌকোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রুদ্রের কবিতায় তাই স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নের ফেরী, জঞ্জাল এবং বোঝা। যে যুবক যুদ্ধে গেছে, স্বজন হারিয়েছে; যে শ্রমিক কৃষক এক বুক আশায় বল্লম-সড়কি নিয়ে হানাদারের মোকাবেলা করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, তারা এখন স্বপ্নহীন অতল গুহ্বরে নিমজ্জিত; জলপাই বাহিনী যখন তখন কেড়ে নিচ্ছে তাদের প্রাণ; গণতন্ত্রের মুক্তির সংগ্রামে তাদের দিতে হচ্ছে আবার বুকের তাজা রক্ত। সমাজ থেকে এই বৈষম্যের খাঁচা ভাঙতে হবে; কিন্তু যে স্বপ্ন বুকে ছিল, সেই স্বপ্ন কই, কোথায় :

ক. স্বপ্নহীনতাই দেখি আজ পায় স্বপ্নের মর্যাদা,
অযোগ্যরা হয়ে ওঠে স্বপ্নদ্রষ্টা, কর্নধার মাঝি।[৬৪]

খ. দেখছি এখন স্বপ্নেরা ভাসে জলে,
সাঁতরায় রাজহংসের অনুরূপ।
বেগতিক বুঝে হয়ে আছি নিশ্চুপ,
পড়েছি বেতাল অভাবিত গ্যাড়াকলে।
স্বপ্ন ডুবিয়ে নির্ভর হতে চেয়ে,
ডুবছি এখন স্বপ্নের বোঝা বয়ে।[৬৫]

আজ স্বপ্নবান প্রাণবন্ত আত্মাগুলো ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, আমরা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সংবিধান কাউকেই বাঁচিয়ে রাখতে পারছিনা, স্বৈরতন্ত্র আমাদের রক্তে হোলি খেলে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মানুষকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছে; 'বিত্তের বিনাশী চাকায়' আমাদের স্বপ্নগুলো পদদলিত, বিভিন্ন নেশাদ্রব্য এখন আমাদের স্বপ্ন, সিফিলিস ও গনোরিয়া প্রবাহিত এখন আমাদের রক্তে। কেননা একুশ, মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন এখন কফিনে মোড়া, বুটের নিচে চাপা :

ক. আমাদের স্বপ্নময় আন্দোলনগুলো
বার বার বুটে ও বুলেটে, আপোষে ও ষড়যন্ত্রে
ঝিমিয়ে পড়ছে।
... ...
আমাদের স্বপ্নগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কাক ও শকুন ॥[৬৬]

খ. ঠিক যেন এক জোড়া বুটের নিচে দীর্ঘকাল
চাপা প'ড়ে আছে আমাদের কাঙ্খিত জীবন,
ঠিক যেমন রাইফেলের ডগায় গাঁথা বেয়োনেট
এফোঁড় ওফোঁড় কোরে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন–[৬৭]

স্বপ্নহীন দুঃস্বপ্নের করাতে রুদ্র ফালা ফালা হতে থাকেন, নৈরাজ্য, গ্লানিবোধ, নিঃসঙ্গতা এখন তাঁর সঙ্গি। সভ্যতার দালান কোটা আর চাকচিক্যের নিচে চাপা পড়ে আছে স্বপ্নগুলো। বুকের ভেতর দুঃস্বপ্নেরা এখন কবর খোড়া নিয়ে ব্যস্ত এবং লক লকে জিভ নিয়ে ঘাতক তাঁকে কামড়াতে আসে, এখন কবির এবং গোটা দেশের অবস্থা 'লখিন্দরের লোহার বাসর'। পাখিহীন, স্বপ্নহীন দালান কোঠার ভিড়ে কবির চাওয়াগুলো এখন– 'শঙ্খচিলের কান্না ভেজা দুপুর বেলা'। হতাশা, ক্লেদগুলো, দুঃস্বপ্নের বোঝাগুলো পাণ্ডুর চাঁদের থেকে জোস্না কেড়ে নিয়েছে, তাই–

দু চোখ বেয়ে সকাল ঝরে, উল্টে পড়ে স্বপ্নবাটি।
আমার এখন নিজের মধ্যে নিজের কফিন,
সমস্ত রাত করাত কলের কষ্ট-ধ্বনি–
এখন আমার সমস্তটাই পিরামিডের মগ্নমমি ॥[৬৮]

এভাবে আমাদের স্বপ্নগুলো চাপা পড়ে গেছে চিত্তের নিচে, বৈভবের জঠরে। এরাই এখন সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার ব্যবস্থাপক। অর্থ-টাকা, রক্ষিতা, মাদকদ্রব্য, চোরাচালনি এবং হত্যার মতো ঘটনাগুলো সামরিক সরকারের মদদপুষ্টে এরাই আমাদের রুগ্ন চেতনাগুলো জাগিয়ে তুলেছে। সামাজিক উন্নাসিকতায় নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ সত্ত্বেও এদের মধ্যে প্রত্যাশিত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনারূপ মানবিকগুণের ধারণ করতে পারছেনা। হিংসার উন্মত্ততায় এরা দুর্বলদের দমনে-পীড়নে উৎসাহী। আমাদের দেশে বিত্তশালী রাজনীতিবিদদের মধ্যে সন্ত্রাসী চরিত্র, ক্ষমতার মোহ এতোটাই প্রাণীসুলভ হিংস্রতায় অসহিষ্ণু যে, তাদের মধ্যে ছাগবলি ও নরবলিতে কোনো পার্থক্য থাকলোনা। জান-মাল বিপন্ন করে হলেও আমাদের এই বিত্তশালীরা জাঙ্গলিক জীবন-যাপনে উৎসাহী শুধু উচ্চাশী আকাঙ্খার জন্যই। এদের অঢেল বিত্ত আছে,

মনুষ্যত্ব নেই। অথচ এদের উপরই দায়িত্ব পড়েছে সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার। মানুষের জীবন-ধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো, উপকরণগুলো এরা একের পর এক হত্যা করে চলেছে। খুন করে চলেছে আমাদের সজাগ মানসিকতা বোধকে। তারপরও মানুষের স্বপ্ন থাকে, আশা থাকে, উদ্যম থাকে। রুদ্র একজন আশাবাদী বিপ্লবী কবি, নৈরাজ্যের হতাশার গ্লানির জঞ্জালগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে তাঁর সময় লাগেনা, আগুনে পুড়ে হলেও স্বপ্নগুলো আবার জাগিয়ে তুলতে চান; কঠিন সংগ্রামে হলেও কাঙ্খিত বস্তু ছিনিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর। স্বপ্নহীন ভোঁতা হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বদেশে স্বপ্নগুলোর আবার আবাদ করতে চান —

ক. সূর্যাস্তের দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে
যে স্বপ্নগুলো,
সে স্বপ্ন মুষ্টিবদ্ধ,
সাহসের সপ্রতিভ ফনা,
যে স্বপ্ন জীবন
অগাধ বিস্তীর্ন এক ব্রহ্মাণ্ড-জীবন
কেবলি জীবন–
সে রকম স্বপ্নে পুড়ে তুমি হও চিত্রল হরিন।
কষ্ট পাও।
কষ্ট পেতে পেতে
তুমি হয়ে ওঠো ফাল্গুনের প্রথম পূর্নিমা।[৬৯]

খ. কিসের এমন প্রেরণা পেয়েছে মন
নষ্ট আঁধারে শ্রেষ্ঠ বাসনা খোঁজে,
বুকের অসুখে সুখের স্বপ্ন লিখে
ঘন দুর্যোগ
তবু সে ভাষা, বেহুলার সাম্পান ...
তোমাকে পাবার প্রস্তুতি বাড়ে বোধে
তোমাকে পাবার প্রেরনায় জাগি রাত।
নৈরাজ্যের খড়গের তলে মাথা,
ঘাড় কাত করে তবু দেখি রোদ
কতোটা পেরোলো অমা॥[৭০]

দেশে অকাল, বন্ধ্যাত্ব, ভাঙন চলছে তারপরও রুদ্রের মতো কবির স্বপ্ন থাকে, হৃদয় জুড়ে সজাগ স্বপ্নদের আনাগোনা, একদিন দুঃশাসন থেকে স্বদেশ মুক্ত হবে; স্বপ্ন বিতাড়িত নয়, নেড়িকুত্তার দংশনেও স্বপ্ন থাকে, রুদ্রের "স্বপ্নের বাস্তুভিটে" কবিতায় এমনই সুর। কিঞ্চিৎ আশাহত– মানুষের হৃদয় থেকে স্বপ্নকে বিদায় দেয়া সম্ভব নয়, স্বপ্ন বিদূরিত হলে সমস্ত আন্দোলন, ত্যাগ, রক্ত বৃথা যাবে; ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের প্রতিশোধ নিতে স্বপ্নকে সচল রাখতেই হবে :

ভস্মিভূত বসতবাড়ির ছাই-এর তলে স্বপ্ন থাকে,
স্বপ্ন থাকে গুলিবিদ্ধ বালিহাঁসের নরম বুকে
স্বপ্ন থাকেই।
নৈরাজ্যের চাকায় পেষা
অন্ধকারে রন্ধ্রে চাপা
তিক্ত তুমুল স্বপ্ন থাকে।
স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন থাকেই–
দুর্ভিক্ষের রুগ্ন হাড়েও স্বপ্ন থাকে।
... ...
স্বৈরাচারে ছিন্ন ভিন্ন দেশটি তবু স্বপ্ন থাকে
অবহেলায় ধুলোয় পড়া বীজটিতেও স্বপ্ন থাকে।[৭১]

বস্তুত জাতির বুকে যতই চেপে বসুক না কেন তামসিক হতাশা, তারপরও আশায় বাঁধে মানুষ বুক, একদিন এই অমানিশার অবসান হবে; তাই প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে ওঠে রুদ্রের কবিতায়।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র, (উদ্ধৃত), বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', প্রকাশভবন, কলিকাতা- ১২, এপ্রিল '৬৯, পৃ. ১২৮।

২. হুমায়ুন আজাদ, নরকে অনন্ত ঋতু, আগামী প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ৮২।

৩. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", অসীম সাহা (সম্পাদিত) 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাসমগ্র' ১ম খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ১৬১। এখন থেকে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'-এর স্থলে 'ঐ' এবং 'অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' এর স্থলে 'ঐ' সংকেত ব্যবহৃত হবে।

৪. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, পৃ. ২৭।

৫. তদেব, ঐ, পৃ. ২৮।

৬. ঐ, "মাতালের মধ্য রাত্রি", ঐ, পৃ. ৩২।

৭. ঐ, "প্রজ্বলন্ত লোকালয়", ঐ, পৃ. ৩৬।

৮. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি-১", ঐ, পৃ. ৬৬।

৯. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ১২", ঐ, পৃ. ৭০।

১০. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার-১", ঐ, পৃ. ১৪৩।

১১. ঐ, "কালো কাঁচ গাড়ি", ঐ, পৃ. ১৮০।

১২. ঐ, "রূপকথা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

১৩. (উদ্ধৃত) মামুনুর রশীদের কলাম, সাপ্তাহিক আগামী, ১৭ মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৬।

১৪. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "আধখানা বেলা", ঐ, পৃ. ২০।

১৫. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, পৃ. ১৭।

১৬. তদেব, ঐ, পৃ. ১৮।

১৭. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, পৃ. ২৬।

১৮. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, পৃ. ৩৮।

১৯. ঐ, "অবেলায় শংখধ্বনি", ঐ, পৃ. ৬০।

২০. ঐ, "একদিন রক্তাক্ত ঝড়ের শেষে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

২১. ঐ, "দুর্বিনীত জলের সাহস", ঐ, পৃ. ৫৯।

২২. ঐ, "বেলা যায় বোধিদ্রুমে", ঐ, পৃ. ৬৫।

২৩. ঐ, "বিশ্বাসের হাতিয়ার", ঐ, পৃ. ৬৩।

২৪. ঐ, "কাঁচের গেলাশে উপচানো মদ", ঐ, পৃ. ৭২।

২৫. ঐ, "বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা", ঐ, পৃ. ৮১।

২৬. ঐ, "স্বপ্ন-জাগানিয়া", ঐ, পৃ. ৯৯।

২৭. ঐ, "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন-৩", ঐ, পৃ. ৮২।

২৮. ঐ, "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন-৭", ঐ, পৃ. ৮৪।

২৯. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, পৃ. ৯০।

৩০. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-১", ঐ, পৃ. ১০১।

৩১. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-১৯", ঐ, পৃ. ১১৬।

৩২. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-১৮", ঐ, পৃ. ১১৫।

৩৩. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-১৯", ঐ, পৃ. ১১৫।

৩৪. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার-৩", ঐ, পৃ. ১৪৪।

৩৫. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার-৫", ঐ, পৃ. ১৪৬।

৩৬. কিম চিহা "ক্ষুধা", অনুবাদ : আবুল মোমেন; 'তৃতীয় বিশ্বের কবিতা', সোহরাব হাসান/সুলতানা নাহার (সম্পাদিত) সমাজ গবেষণা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী '৮৯, পৃ. ৪৯।

৩৭. ড. হাসানউজ্জামান, 'সামরিক রাজনীতির চালচিত্রঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২৩।

৩৮. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্, "ফিরে এসো নিশ্চয়তা", ঐ, পৃ. ২০৮।

৩৯. ঐ, "মা-র কাছে ফেরা", ঐ, ২খ, পৃ. ১৩১।

৪০. ঐ, "শস্যের বিশ্বাস", ঐ, ২খ, পৃ. ১২২।

৪১. ঐ, "খামার" ঐ, পৃ. ৯৩।

৪২. ঐ, "মুখরিত মর্মমূল" ঐ, পৃ. ২১।

৪৩. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি-৭", ঐ, পৃ. ৬৮।

৪৪. ঐ, "চিঠিপত্রের গল্প", ঐ. পৃ. ১৩৬-১৩৭।

৪৫. ঐ, "বেহুলার ভেলাভাসে সময়ের তুমুল তুফানে", ঐ, ২খ, পৃ. ৬২।

৪৬. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-২২", ঐ, পৃ. ১১৮।

৪৭. ঐ, "অস্ত্র চাই", ঐ, পৃ. ১৮৮।

৪৮. ঐ, "চোখ খুলে ফ্যালো", ঐ, ২খ, পৃ. ২৫।

৪৯. ঐ, "যোগ্যতা", ঐ, ২খ, পৃ. ২৪।

৫০. ঐ, "পরাজিত নই পলাতক নই", ঐ, পৃ. ৪০।

৫১. ঐ, "পৃথিবীর পৌঢ়স্তন", ঐ, পৃ. ৬০।

৫২. ঐ, "নিঃশব্দ থামাও", ঐ, পৃ. ৬৪।

৫৩. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, পৃ. ৯০।

৫৪. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি", ঐ, পৃ. ৬৯।

৫৫. ঐ, "মানুষের মানচিত্র-১৮", ঐ, পৃ. ১১৪।

৫৬. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইটের নিসর্গ", ঐ, পৃ. ১৮৪।

৫৭. তদেব, পৃ. ১৮৫।

৫৮. ঐ, "একসরে রিপোর্ট", ঐ, ২খ, পৃ. ১৭।

৫৯. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, ২খ, পৃ. ২২।

৬০. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, ২খ, পৃ. ২২।

৬১. ঐ, "পান করো রাত্রি", ঐ, ২খ, পৃ. ৩৪।

৬২. ঐ, "চিত্রনাট্য-২", ঐ, ২খ, পৃ. ৪৬।

৬৩. ঐ, "গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়", ঐ, ২খ, পৃ. ৪৯।

৬৪. ঐ, "বিষ বিরিক্ষের বীজ", ঐ, ২খ, পৃ. ১০১।

৬৫. ঐ, "খুটিগুটি ও অন্যান্য কবিতা-৪", ঐ, ২খ, পৃ. ১১৩।

৬৬. ঐ, "স্বপ্নগুলো", ঐ, ২খ, পৃ. ৪৮।

৬৭. ঐ, "শিকল-সামাজিক", ঐ, পৃ. ১৯০।

৬৮. ঐ, "দুঃস্বপ্নের দালান কোঠা", ঐ, পৃ. ১৯৯।

৬৯. ঐ, "আত্মরক্ষা", ঐ, পৃ. ১৯৮।

৭০. ঐ, "বেহুলার সাম্পান", ঐ, পৃ. ২০২।

৭১. ঐ, "স্বপ্নের বাস্তুভিটা", ঐ, ২খ, পৃ. ৩৩।

চতুর্থ অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় স্বদেশ চিন্তা ও সাম্যবাদী আন্দোলন

একুশের প্রেরণা এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কবিতায় একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ভাব–ভাষা প্রকাশে এদেশের কবিতা আরো অনেক শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল হতে পেরেছে। পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির অনুভবে-চিন্তা-মননে একটা নির্ভিকতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। কবিতা রাজনীতি এবং সমাজ কলুষতার ব্যাপক ব্যবহারে দীপ্ত এবং প্রতিবাদী চরিত্রকে বুকে ধারণ করে একটা অসাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর এদেশের কবিতায় কবিতার ফর্ম এবং প্যাটার্নের নতুন আঙ্গিক সন্নিবেশ ঘটেছে। কবিতা সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আরো শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং বর্ণিল অভিজ্ঞতায় শোষক বিরোধী অভিন্ন সত্তায় মেলাতে পেরেছে প্রায় সচেতন সব কবিকেই। কবিতা ও সমাজ-রাজনীতির কৃত্রিম বিরোধটাও এভাবে ঘুচে গিয়েছে। কবিতাকুসুমে লেগেছে ইস্পাতের দৃঢ়তা এবং রাজনীতির সংশ্লেষণে তা আরও মানবিক সুবাসে জারিত হয়েছে। সর্বগ্রাসী কবিতা সামাজিক শুচিবায়ু ও সতীত্বপনাকে হরণ করে শব্দপুঞ্জের গভীর গীতলতায় শিল্পমাধুর্যময়ী হতে পেরেছে। আর যাঁরা তা পেরেছেন তাঁদের কবিতার চেতনাগত বৈপরিত্যেও অসাধারণ জাতিসত্তার ছোঁয়াচে গৌরবমণ্ডিত হতে পেরেছে এবং বিরাট এক জনমণ্ডলির আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে।

তবে কবিতার ক্ষেত্রে সমাজ-রাজনীতির চেতনা বিশ শতকে যে আলোড়িত হয়েছে, তা অনুপ্রাণিত করেছে একমাত্র সমাজতন্ত্র। পূর্ব-পশ্চিমের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক যাঁরা সাম্যবাদী, তাঁরাই এ রাজনীতির ধারার পূর্ণতা সাধন করেছেন। রুশ বিপ্লবের সৃষ্টি দস্তয়ভস্কি (১৮২১-৮১), গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), চিলির নেরুদা (১৯০৮-৭৩), নাৎসি বিরোধী ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬) এবং ফরাসি দেশের আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২) ও এলুয়ার (১৮৯৫-১৯৫২) তো আছেনই। তারপর জার্মান হাইনে, স্পেনীয় থেসার ভেলিয়েখো, তুর্কির নাজিম হিকমত, চেক প্রজাতন্ত্রের হোলুব। এর পাশাপাশি আছেন সেনেগালের লিওপোল্ড (জ. ১৯০৬) সেংঘর, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, মোজাম্বিকের মার্সেলিনো, গিনির আহমদ সেকোতুরে, এঙ্গোলার অগাস্টিনোসহ আরো অনেকে। এঁরা কম বেশি সবাই সংগ্রামশীল রাজনৈতিক কবি। এ উপমহাদেশের সচেতন কবিরা এঁদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর আমাদের দেশের কবিরা, যাঁরা রাজনীতি সচেতন; তাঁরা পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুদে (১৯০৯-৮২), সমরসেন (১৯১৬-৮৬), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৩), সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন নানা মাত্রিকতায়। আর বাঙালির মাথার উপরে আসীন সবসময়ের জন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই প্রেক্ষাপটে রুদ্রের কবিতায় সাম্যবাদ ও স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যেতে পারে।

(ক) পীড়িত স্বদেশ ও সাম্যের অধিকারবোধ

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যজীবনের শুরু এবং শেষ মোটামুটি ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সন, এই পনেরো বছর কম বেশি পুরোটাই সামরিক শাসক আওতাধীন। এর মধ্যেই রুদ্রের কবিতার শাখা-পল্লব বিকশিত হয়। আর এমন সময়ই রুদ্র কবিতা চর্চা শুরু করলেন, যখন জাতীয় জীবনে অর্জিত স্বাধীনতার ভাঙন ধরেছে; মহামারি-ক্ষুধা-দারিদ্র্য-হাহাকার এবং গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে– স্বাধীনতার পতাকা জড়িয়ে ধরেছে শকুন এবং কাকেরা, নানাবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনায় আমাদের সমাজ-রাজনীতির অঙ্গনে অসহায়ত্বের রাজত্ব। পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত কারণে জাতীয় জীবনের তামসিক বিপর্যয়ে রুদ্র কোথাও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, কোথাও নিঃসঙ্গ তামসায় নিমজ্জিত, আবার কোথাও হতাশা ও প্রত্যাশার জালে জড়িয়ে পড়েন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগতবোধে আত্ম সঙ্কটে জর্জরিত হতে থাকেন। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের এই টানাপোড়েনে রুদ্রের স্বপ্ন ও সংগ্রামের অভিযাত্রা। যে কাজ একজন সমাজ ও রাজনীতিকের, সে কাজটিই রুদ্র করতে এগিয়ে চলেন, তা হলো, পীড়িত দেশ থেকে জঞ্জাল সরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, গণতন্ত্রের মানস প্রতিমাকে ফিরিয়ে এনে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য তাঁর কবিতা অসুন্দরের প্রলোভনে কোন দিন সমর্পিত হয়নি। দাবি আদায়ে এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর কবিতা দ্রোহ চেতনায় উজ্জীবিত এবং স্বরগ্রাম উচ্চকিত। সমাজ-রাজনীতি ও মাটির সংলগ্নতায় কবি অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্ষমাহীন। চুয়াত্তরের মহামারি ও দুর্ভিক্ষের সময় বাস্তবতার কবি কঠোর ইস্পাতের মতো; রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন :

কবিতাগুলো ফিরিয়ে নাও রবীন্দ্রনাথ
যন্ত্রনার নরকে হচ্ছি নিঃশেষ
ক্ষুধার্ত মাটিতে তোমার কবিতাগুলো
বড়ো অবাস্তব।
আজ থেকে ওসব বাতিল সব বাতিল
এই তুমুল ঘোষনা ঘোষিত হলো।
চেয়ে দ্যাখো এ চোখে স্বপ্ন নেই
কোনো কল্পনার শিশুগাছ হচ্ছে না বড়ো
দ্যাখো কোনো প্রেম নেই হতাশা ছাড়া
এ দুটি চোখ শুধু স্বাক্ষী হয়ে আছে।[১]

এ উত্তাল সময়ে কবি তাই সুকান্ত-নজরুলকে স্বাগত জানালেন– 'হয়তো তোমার মাঝেও খুঁজে পাবে/ নিউটন, শেলী, সুকান্ত অথবা নজরুলকে'।[২] কবির কালগত নৈরাজ্যিক বাসনা দানা বাধতে থাকে সমকালীন করাল গ্রাসে; বীভৎস মাতৃভূমি, বিপর্যস্ত সমাজ দেহ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কিছুই করার থাকেনা; বিশ্বাস, অবিশ্বাস, পরিণাম বা পরিণামহীনতা এখন তাঁর কাছে তাৎপর্যহীন। মোহচ্ছন্নতার জাল ছিন্ন করে রুদ্র মাটি ও মানুষের দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন; ক্ষুধার্ত মানুষের ভারে পীড়িত স্বদেশকে মুক্ত করার বাসনা মঞ্চে মঞ্চে ঘোষিত হলো :

গন্ধহীন, স্পর্শহীন শাদা রাত পোড়ায় স্বদেশে,
বুকের ভেতরে জানি গর্জে ওঠে এক লাখ ক্ষুধিত এঞ্জিন
এক লাখ মত্ত প্রপেলার ঘোরে ওই মাথার ভেতরে।[৩]

ঘোর অমানিশার তলে ডুবতে যাওয়া স্বদেশ, আবার জাগাতে হবে; রুদ্রের কবিতা ভাষার চেতনা পেয়ে যায়, শাণিত হতে থাকে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা এবং বুকের বেদনা অবক্ষয়ের বেলাভূমিতে নতুন উদ্যমে বারুদের আচ্ছাদনে পরিপুষ্ট হতে থাকে; 'চারিপাশে ঘোর অসমজীবন/ সভ্য পোষাকে পাশবিক বন/ সমতার নামে ক্ষমতাকে কোরে রপ্ত',[৪] উত্তপ্ত হয়ে যায় রুদ্রের শব্দ-ভাষা ও বর্ণমালা :

ভাষা-সৈনিক আমি জানি শুধু যুদ্ধ,
আমার সমুখে আলোর দরোজা রুদ্ধ,
তাই বারুদে সাজাই কোমল বর্ণমালা,
তাই শব্দে শান্নিত আনবিক বিষ-জ্বালা
ধূর্জটি-জটা পেতে রোধ করি অবক্ষয়ের সংশয়,
আমার এ হাতে শব্দ কাস্তে ঝলসায়।[৫]

যে বাসনার ভূমিকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করতে চেয়েছেন কবি, সে স্বদেশ ভূমি জন্মেই আতুড় ঘরে বৈষম্যের ছোবলে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ভুল নেতৃত্ব আর সিদ্ধান্তের অপ্রতুলতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তিগুলো হারাতে লাগলো, ঘাতকের সুযোগ করে দিলো হানা প্রদানে, চতুর শ্বাপদ মওকা পেয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে স্বদেশ ভূমি :

বিজয়ের ব্যথিত মিছিল তবু কেন চলে ভুলের ভুবনে
কেন তবু ভুল জীবনের পায়ে রেখে আসে পুষ্পের প্রনাম?
বুকের তিমির ভেঙে সুপ্রভাতে আমাদের দ্যাখা হয়েছিলো,
সুরম্য আলোর নিচে জেগে ওঠা আমাদের স্বপ্নধোয়া দ্বীপ–

তবু সেই নিশ্চিত প্রহর আজো আসেনি এখানে,
তবু সেই অঘনের পূর্নচাঁদ ছড়ায়নি জোস্নার আরক।
আমার ভাষার কণ্ঠরোধ কোরে আছে আজো চতুর শ্বাপদ,
আজো শুধু স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে
উজ্জ্বল বিষন্ন ফুল।[৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শাসক শ্রেণীর অপশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নেতা-নেতৃত্বের কলহ, মতাদর্শগত চেতনার ভিন্নতা ও শত্রুতা, দেশ উন্নয়নে ব্যর্থতা, মহামারি-দুর্ভিক্ষের কারণে জনমনে ক্ষোভ, একদলীয় বাকশালী শাসনের কুপ্রভাবে সদ্য স্বাধীন দেশে বাক স্বাধীনতা হরণ ও দুর্নীতির প্রভাবে সামাজিক জীবনে অবক্ষয় ও অসন্তোষ, যার কারণে বিপন্ন স্বাধীনতা ফলপ্রসূ হতে পারেনি, বরং প্রতিবিপ্লবের একটা সুযোগ সরকার নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছে, যে প্রতিবিপ্লব ধ্বংস ডেকে এনেছে জনজীবনে। এ সময়ে রুদ্রের কবিতায় হতাশা, অবক্ষয়গত বিপন্নবোধ জাগিয়ে তুলেছে; শাসক শ্রেণীর সামান্য ভুলের কারণে তাঁর মনে অনুশোচনা :

পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে ছিঁড়ে নেয়া সেই ভূমি
দুর্ভিক্ষের খরায় সেখানে মন্বন্তর এলো।
হত্যায় আর সন্ত্রাসে আর দুঃশাসনের ঝড়ে
উবে গেল সাধ বেওয়ারিশ লাশে, সাদা কাফনের ভিড়ে
তীরের তরীকে ডুবালো নাবিক অচেতন ইচ্ছায়।[৭]

"বৈশাখি ছেনাল রোদ" কবিতায় এ সময়ের খরার চিত্র আরো করুণভাবে ফুটে উঠেছে :

বৈশাখি ছেনাল রোদ ঘরখানা পোড়ালি আমার !
আমার সবুজ মাঠ, নধর ফসল,
আমার অঙ্গন, ভিটে তরমুজ, রাই,
আমার দুধেল গাই, অন্নদানা, গাভিন ঘরনি
বৈশাখি ছেনাল রোদ, সর্বনাশা, পোড়ালি সকল।[৮]

একটা ঘাতক সময়ের মুখোমুখি আমরা জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে পাপ, তার অসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে গোটা দেশের জনগণকে; নাগরিক সমাজে বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে, জলপাই বাহিনীর নিরীহ মানুষের উপর অহেতুক অত্যাচার, প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠরোধ করছে, হত্যা-খুন-জখমে গোটা দেশ

তাদের হাতে জিম্মি; সে কারণে সমাজে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার, পীড়িত স্বদেশ এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. বিষের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়েছে ঘাতক সময়-
নগ্ন দুই চোখে সর্বনাশা অপচয় জ্বলে,
সময় দিয়েছে তুলে এই হাতে অফুরন্ত ক্লেদ,
আর দিছে রক্তে মাংশে জীবনের তপ্ত অন্ধকার।[৯]

খ. নগর-নরকে নাগরিক গ্লানিবোধ
আমরা ছিঁড়ছি স্বপ্নের শবদেহ–[১০]

গ. নগরের সুরম্য নিবাসে,
ঝকঝকে মুখগুলো কি সহজে হয়ে ওঠে শ্বাপদসংকুল!
রক্তমাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পোকা-ধরা ক্ষত
ছুঁয়ে আছে জীবনের সবকটি ফুল–
মাগো, দরোজা খোলো মা ... ...
লাঙলের ফলার আঘাতে
মাটি থেকে উঠে আসে চকচকে ক্ষুধা,
বল্কলে ক্ষয়কাশ, জঙধরা শ্রমিকের হাতে
পাকা আপেলের মত অনিশ্চিত দিন মান।[১১]

ঘ. বাইরে ক্ষুধার খরা, স্তব্ধ অন্ধকার।[১২]

ক্ষুধা, অন্ধকার, হাহাকারে জর্জরিত গোটা দেশ; রুদ্রের কবিতায় সামরিক সরকারের ব্যর্থতার বিষণ্ন চিত্রের পর চিত্র বর্তমান, যা এদেশের সচেতন মানুষকে সংগঠিত করার একটা প্রয়াস মাত্র। গোটা জনমণ্ডলি এই দুঃশাসনে ও শোষণে উৎকণ্ঠিত, দেশের আপামর জনতা রুগ্ন, পীড়িত, অসুস্থ্য; একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার জালে আবদ্ধ গোটা দেশ, বীভৎস, ভালোবাসাহীন এবং স্বপ্নহীন ফাঁদে আটকা পড়ে আছে; ক্ষুধা আর দারিদ্র্য এখন জীবনের অপর নাম :

আমাদের কৃষকেরা
শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়।
আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।

আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর
দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।[১৩]

এই দুঃশাসনের কবলে সর্বস্ব হারানোর জন্য আমাদের কৃষক-শ্রমিক-যুবকরা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, ঊনসত্তরের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েনি, আজ জাতির ঘাড়ে অপয়াদের উলঙ্গ নৃত্য, স্বদেশ ভূমিতে সংগ্রামী যুবক শ্রেণী একাকীত্বের করাতে দীর্ণ, নেশার ঘোরে আবদ্ধ; স্বপ্নহীন বান্ধবহীন-বিশ্বাসহীন এক বৈষম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে চলেছে সামরিক যুদ্ধবাজ লোকগুলো। এক বেদনাময় অসহায়ত্বের আবর্তে আটকা পড়ে আছে বাংলাদেশ। রুদ্র আবার আমাদের গৌরবময় আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ অসমঘোর অমানিশার অবসানে বদ্ধ পরিকর। এই দুঃশাসনের করাল গ্রাস গোটা দেশ তছনছ করে চলেছে। সে দিকে ইংগিত করছেন রুদ্র একেবারে টানা গদ্যের ভাষায় :

যে-তরুন ঊনসত্তুরের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
যে-তরুন অস্ত্রহাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছে।
যে-তরুনের বিশ্বাস স্বপ্ন-স্বাদ,
স্বাধীনতা উত্তরকালে ভেঙে খান খান হয়েছে।
অন্তরে রক্তাক্ত যে তরুন নিরুপায় দেখেছে নৈরাজ্য,
প্রতারনা আর নির্মমতাকে।
দুর্ভিক্ষ আর দুঃশাসন যার নিভৃত বাসনাগুলো
দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করেছে।[১৪]

স্বপ্নের স্বদেশে এখন এই যুবকের কোন মূল্য নেই– তার দিকে তাক করে আছে আগ্নেয়াস্ত্র :

বন্দুকের ঠাণ্ডানল, তার দিকে তাকাও সতর্ক চোখে,
ভুলে যেওনা, তোমার জন্যে নির্ধারিত বুলেটটির চে'
কম মূল্য এখন তোমার।[১৫]

অপরদিকে যারা এই অপশাসনের দোসর, তাদের পোয়া বারো; তারা সুখে আছে, বিত্ত তাদের নাদুস-নুদুস করেছে, তাদের আত্মীয়-পরিজন মহা আনন্দে আছে; স্বদেশে এই ষড়যন্ত্র যেখানে বিদ্যমান, যেখানে এই বৈষম্য; সে সমাজে পরিবর্তন আসবে কি করে? প্রশ্ন সেখানে। যাদের দ্বারা গণমিছিল স্বার্থবাদীতা তো সেখানেও ভিত গড়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন হয় পদদলিত। দু'টি দৃষ্টান্ত :

ক.	ষড়যন্ত্রের গোপন কালো মেঘ চারপাশে আজ,
বিধ্বস্ত হয়েছে দ্যাখো বিশ্বাসের সুগভীর ভিত।
মিছিলের অগ্রভাগে যারা হাঁটে নিশ্চুপ গম্ভীর,
বুলেটের সামনে তারা কখনো দাঁড়ায়না জানি-
তাদের রয়েছে ঘর সুসজ্জিত নরোম বিছানা,
রয়েছে বানিজ্য ব্যবসায় আধুনিক দ্রুতযান,
নিশ্চিত আগামী আর পরিপুষ্ট ব্যাংকের ব্যালেন্স,
এরা কি ভাঙতে চাবে কোন দিন বৈষম্যের খাঁচা?[১৬]

খ.	আন্দোলন বিক্রি কোরো কেউ কেউ সেজেছে সেয়ানা,
সুবিধার চর্বি মেদে চকচকে তাদের জীবন!
রক্তপায়ী ড্রাকুলারা নিরুদ্বেগ আজো বেঁচে আছে।
পা-চাটা কুকুরগুলো প্রকাশ্য ও গোপন রাস্তায়
আখের গোছায় আজ মানুষের মৃত্যু বিক্রি কোরে।[১৭]

মানুষের মুখোশগুলো কবি মেলাতে পারেন না, নৈরাজ্য অস্থিরতা বিপর্যস্ত আন্দোলন পীড়িত করতে থাকে রক্তস্নাত সোনার বাংলা; স্বদেশের এই দুর্দশায়, জাতীয় জীবনের এই মেকিপনায়, সভ্যতার এই জীর্ণ-দীর্ণ দীর্ঘ ও স্থায়িত্বের সময়কাল কবির মধ্যে আত্ম সঙ্কটকে জাগিয়ে তোলে, আত্মঘাতী বিনাশকে ফেরাতে পারেন না; "গলে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়" কবিতার শেষাংশে তাই বিমূর্ত হয়ে উঠেছে, অব্যক্ত বেদনাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে; মহামারি, ভ্রূণ হত্যা, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হননের হাত তাঁর গ্রীবার দিকে ছুটে আসছে, অক্ষমতাগুলো সরাতে পারছেন না; বিশ্বাসহীন সময়কে গতিরোধ না করতে পারার আততি আজ রক্তাক্ত করছে নিজ ব্যক্তি বোধকে :

টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফ্যালো আমার চেতন,
বিশ্বাসের স্থবির শরীর চাবুকে রক্তাক্ত করো,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছুঁড়ে দাও আমার আত্মাকে।
মানুষের মৌলিক মুখোশ আমি খুলতে পারিনা,
শুধু পুড়ে যেতে পারি, পুড়ে যাই, পোড়াই সৌরভ,
রাতের আগুন এনে নিবেদিত সকাল পোড়াই।[১৮]

তারপরও রুদ্র ওই যুবক শ্রেণী, কৃষক-শ্রমিক, নূর হোসেনদের মধ্যে আন্দোলনের প্রেরণা, প্রতিরোধ-প্রতিশোধ স্পৃহার মাধ্যমে অধিকার বোধ জাগ্রত করতে চান। এদের মধ্যেই বিপ্লবী আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত করেন। অপশাসনের শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করবে ক্ষুধার্ত মানুষ। রক্তের বদলা নেবে কৃষক-শ্রমিক-জনতা। স্বদেশ থেকে আবর্জনাগুলো দূর করতে এগিয়ে আসবে সম্মিলিত মানুষের জীবন বাজি সংগ্রাম :

আগুন জ্বালাবে   এই গুলিবিদ্ধ মানুষের বুক,
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে।
শৃঙ্খল ছিঁড়বে   এই ট্রাকে চাপা যুবকের হাড়,
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে।
... ...
শোষন হটাবে   এই গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের লাশ,
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।
গ্রেনেড ফাটাবে   এই ক্ষুধাজীর্ন দলিত মানুষ
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।
কুয়াশা ছিঁড়বে   এই কৃষকের প্রানবন্ত চোখ,
এই স্বপ্ন আগুন জ্বালাবে।[১৯]

স্বদেশের বুক নূর হোসেনদের তাজা রক্তে স্নাত, শবমেহেরদের রক্তাক্ত দেহ বস্ত্রহীন পড়ে থাকে সবুজ বাংলার কোলে; বাংলাদেশের সামরিজ রাজনৈতিক, ইতিহাসে আমাদের 'নূর হোসেন' আজ পুরাণ চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে, যা শত বৎসরের ব্যবধানে গণতন্ত্র আন্দোলনের জীবনদানকারী 'জীবন্ত কবিতার প্রতিবাদ' হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলার রক্তাক্ত গণতন্ত্রের মিছিলে রুদ্রসহ সমকালীন সচেতন কবিরা নূর হোসেনকে পুরাণের চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন। স্বৈরশাসকের জলপাই বাহিনীর বলি নূর হোসেনকে নিয়ে কবি শামসুর রহমান লেখেন :

বুঝি তাই মধ্যরাতে নূর হোসেনের কবরের-
সোঁদা মাটি ফুঁড়ে কান্না প্রায়
আওয়াজ বেরোয়-
'তবে কেন আমার তরুণ বুকে হায়েনার দাঁত বিদ্ধ হলো?
তবে কেন আমার স্বপ্নেরা আজ শেয়ালের মলে
মিশে যায় অবলীলাক্রমে?
তবে কেন হায় মুক্তিযুদ্ধ শকুনের চঞ্চুতে কয়েদি হয়'?[২০]

"প্রাণপাখি গুড়ুম" কবিতায় কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) নূর হোসেনকে পৃথিবীর সমস্ত মতাদর্শের দৃষ্টান্ত হিসেবে সূর্যসেনের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন, সমস্ত আন্দোলনের প্রতীক হয়ে নূর হোসেনকে উপস্থাপন করেছেন :

আমাকে দেখুক
আত্মা অনাত্মা আমেন আমেন
সূর্যসেন নূর হোসেন;
আমাকে দেখুক
তন্ত্রমন্ত্র সমাজতন্ত্র
স্বৈরতন্ত্র রণতন্ত্র;[২১]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ নূর হোসেনের রক্তাক্ত বিপ্লব, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশে উজ্জ্বল প্রতিভাত হতে দেখেন :

রক্তাক্ত ফাল্গুন জ্বলে কার্তিকের উন্মাতাল দিন,
নূর হোসেনের দেহ দীপ্ত তেজে ঝলমল করে।[২২]

"আগুন ও বারুদের ভাষা" কবিতায় রুদ্র সম্মিলিত মানুষের গড়া প্রতিরোধ যা আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী এবং বিপ্লবী আন্দোলনের হাতিয়ার; সেই প্রাচীর গড়তে চান নূর হোসেনের বুকের ভাষাকে সম্বল করে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এই অমোঘ বাণীর তেজে। তারপরও বুকের আর কতো রক্ত ঢালতে হবে সেই কাঙ্খিত গণতন্ত্র উদ্ধার করতে; স্বৈরশাসনের কবলে স্বদেশ আজ অপশাসনে বন্দী, দুঃশাসনের অবসানে আর কতো মিছিল, গণজমায়েতের প্রয়োজন? তবুও মানুষ নূর হোসেনের রক্তে নতুন করে রাজপথে নামে :

আমি জানি, সম্মিলিত মানুষের চেয়ে
কখনোই বেশি নয় অস্ত্রের ক্ষমতা।
আমি জানি, মিলিত মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর
প্রকৃত প্রকাশ
তবু আর কতোবার 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' বুকে লিখে
বুলেটের সামনে দাঁড়াবো?
হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যাবে বারুদের ক্ষমাহীন বিষ।[২৩]

স্বৈরাচারের বলি নূর হোসেন বাংলার মাটি রক্তাক্ত করেছে বুকের রক্তে; বাতাসের কণার সাথে রক্তের কণারা মিশে স্বৈরতন্ত্র বিরোধীদের আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছে। আগামীর ফর্সা দিনের বীজ বুনে যায় নূর হোসেন–

মাটিতে আমার রক্তের বীজ বুনি
মাটিতে আমার জন্মের গান শুনি,
ভাঙা জীবনের কংকালে ওড়ে আগামীর শুভদিন।[২৪]

(খ) প্রেম ও প্রকৃতির ভাবনায় বিপ্লববোধ

আমরা পূর্বেই বলেছি, রুদ্রের কবিতার চাষাবাদ হয়েছে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন স্বৈরশাসনের সময়ে। রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসন এবং রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড সব কিছুই সামরিক বাহিনীর হাতে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বিপন্ন দেশে অস্ত্রবাজী, ক্যু, হত্যা, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, অবৈধ দখল, আইনের অপশাসন, সংবিধান ধ্বংস, সামাজিক জীবনে বৈষম্যের প্রাচীর দাঁড় করেছে সামরিক সন্ত্রাস। মহাসড়কের দু'পাশের চোখ ধাঁধানো অট্টালিকা, বিপনীবিতান এবং হোর্ডিং-এর মুখোশ খুলে ফেললেই বেরিয়ে আসবে চট-পলিথিনের তৈরি জীর্ণ কুটিরে মানবেতর জীবন যাপনের করুণসব কাহিনী। মেকি সভ্যতা আমাদের প্রেম-ভালোবাসা, প্রকৃতি-নিসর্গ সব ধ্বংস করেছে; পাঁচতারা, তিনতারা হোটেল গড়েছে, সুশোভিত চীনা-থাই রেস্তোরাঁ, পেস্ট্রি শপ, বার, স্ন্যাক্স জাতীয় উদর পূর্তির বিলাশের পাশাপাশি রয়েছে উচ্ছিষ্ট খাদ্য নিয়ে কুকুরে মানুষে জৈবিক কাড়াকাড়ি। এক দিকে যেমন অমৃতের ছড়াছড়ি আরেক দিকে তেমন গরলের প্লাবনে মানুষের মন থেকে মমতাবোধ, সহনশীলতা, সৌন্দর্য চেতনা কেড়ে নিয়েছে। হত্যা আর গলাবাজি এবং গালাগালি আমাদের জাতীয় জীবনে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়েছে; মৃত্যুর যে বেদনা, সেই বেদনাটুকুও কেঁড়ে নিয়েছে সামরিক সন্ত্রাস, আমাদের সহজাত প্রবণতাগুলো মাড়িয়ে গুমড়ে সদর্পে চলেছে স্বৈর শাসকেরা। আশির দশকে তাই বাংলা কবিতা নেমে এসেছে রাজপথে; অধিকার প্রতিষ্ঠায় হয়েছে উচ্চকিত; সামরিক আস্ফালনের বিরুদ্ধে শাণিত করেছে কবিতার ভাষা। হারানো প্রেম, ভালোবাসা, মাধুর্য, সৌন্দর্য, প্রকৃতি, মাটি ও মানুষের ঘ্রাণ পেতে মাতোয়ারা রুদ্র তাই পাথেয় হিসেবে মানুষ কোন দিকে যাবে তার প্রসঙ্গ তুলেছেন "আধখানা বেলা" কবিতায় :

হরিতকি-হেমলক, বারুদের পিপাসা,
কারে তুমি বেছে নিলে হৃদয়ের নিবিড়ে?
হে-পথিক, কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়,
নির্মান, নচিকেতা, বিনাশ, না, স্বাস্থ্য?

সারারাত কাঠ কাটে ঘুনপোকা গোপনে,
সারারাত ধরে তরু বোনে কিছু ফুলকে,
বোনে কিছু সকালের কুসুমের তনিমা-
হে পথিক, কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়!
আধখানা বেলা আছে, আর বাকি কুয়াশা ...[২৫]

জন্ম যখন এই নৈরাজ্যে, মানুষের চরিত্রগুলো যখন মূল্যহীন, জন্মভূমি শকুনের পায়ের তলায় পিষ্ট, কাকের যেখানে উল্লাস; রুদ্র সেখানে প্রেম-ভালোবাসায় আমাদের নিসর্গের বেলাভূমিতে ফসলের উৎপাদনের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের উপযুক্ত জবাব দিতে চান নিজের দহনগুলোকে দমন করার জন্য, ক্লান্তি-অবসাদ দূর করতে প্রেম পারিজাত ফোটাতে চান মাতৃজঠরে :

জন্মের ক্লেদে ভেসে যাওয়া জননী বাহুখান
আমার সংসারে থাকুক লোকের ঘৃনায়
তুমি শুধু ফসলে সাজিয়ে বুক ফিরে এসো
প্রাপ্যের উল্লাসে।
পথচলা আমার থাক, তোমার থাকুক শুধু পথ।
আকণ্ঠ গ্লানিরা আমার বেড়ে উঠুক প্রিয়তম ক্ষত,
তোমার থাকুক শুধু শেফালি-সকাল,
বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া ফসলিম চোখের সংসার।[২৬]

ধ্বংস, গ্লানিমাখা আকাঙ্খা, কঙ্কাল-মৃত্যু, পুষ্টিহীন শিশু, সূর্যহীন-জোস্নাহীন এক করুণ অন্ধকার দুর্ভিক্ষের মতো চেপে বসেছে মাতৃভূমির পাললিক জমিনে। স্বপ্নমাখা প্রিয় ফুলগুলো পাণ্ডুর হয়ে যায়; সুনিদ্রার রাতগুলো লাল নক্ষত্রগুলো, স্বাধীনতাগুলো ওরা কেড়ে নিয়েছে, মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলো বেঁচে আছে; মমতা নেই, ফুল নেই, ভালোবাসা নেই, পাখি নেই, রোদ নেই, স্নেহ নেই, সব খেয়ে গেছে ওই ঘাতক শকুন :

ওই ফুলাবৃত শকুন
খেয়ে যাবে, খেয়ে যায় মানুষের শুভ্রধান, পলিমাটি, নীড়,
জোস্নার ধমনী থেকে খেয়ে যায় সৌরভ-কনিকাগুলো।
ঋতু বদলের ভোরে
আমাদের শাখা থেকে তরুন কৃষ্ণচূড়া,
আমাদের ভালোবাসা থেকে সুনীল সবুজ বিক্ষোভগুলো

ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ওইসব নষ্ট শকুন। ওই সব মাংশভুক পাখিরা
আমাদের চোখ থেকে খেয়ে গেছে দৃষ্টির স্বাধীন বসবাস।[২৭]

"মাতালের মধ্যরাত্রি" কবিতায় কবির কণ্ঠলগ্ন প্রেম রক্তের গহিনে মারমুখি জনতার মতো ভীষন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সবকিছু দলিত মথিত করার উন্মত্ত বাসনা দানা বেধে ওঠে; কেননা মাতৃভূমির 'বাসনার সিন্ধুক ভেঙে দুরূহ ডাকাত ছিনিয়ে নিয়েছে সব গান, স্বস্থির সোনালি ফসল'।[২৮] "প্রিয় দংশন বিষ" কবিতায় কবি আর ভালোবাসার আশ্লেষিত চুম্বন কামনা করেন না, চুম্বনের দংশনে চান বিষে ভরা দ্বিমুখি সাপের ছোবল। 'নীল প্রদাহের তীব্র প্রবাহমানতা' ছড়িয়ে দেবে দ্বন্দ্ব : 'দংশন চাই বৈরী বিরোধ, দংশন চাই বিষ/ তন্ত্রে তনুতে বিষমাখা দাঁত দংশন করো প্রেমে।' এবং 'দংশন করো রক্তে ও বুকে, দংশনে পাবো তুমি/ দংশনে পাবো বেদনায় ধোয়া তোমার পৃথিবীটাকে'।[২৯] প্রেমে ও প্রকৃতির মধ্যে এভাবে সভ্যতার ছোবলে কবি নৈরাজ্যিক হতাশায় প্রতিরোধের বীজ বুনে যান। "কার্পাশ মেঘের ছায়া" কবিতার শুরু হয়ে যায় এভাবে :

শিমুল শাখারা তবু এতো লাল হয়ে ওঠে আজো,
আজো এতো রক্তময় হৃদয়ের মতো শুষ্ক বাতাসে ছড়ায়
লোহিত সুঘ্রান।[২৯]

"প্রথম পথিক" কবিতায় তাই কবির প্রশ্ন :

কালো ফুল, কালো হৃদপিণ্ডের শেষতম খেয়া বলো, বলো আমি
কতোখানি বিক্ষোভ হবো, কতোখানি রক্ত হবো?

"ফসলের কাফন" কবিতায় রুদ্র কামনা করেন যেন ভরা ফসলের মাঠে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে–

জেনে যাবো ঋনমুক্ত, আমাদের কাঙ্খিত পৃথিবী এলো।
ভরা শস্যের প্রান্তরে যদি মৃত্যু হয় তবে আর দুঃখ কিসে
জেনে যাবো শেষ হলো বেদনার দিন ফসল ফলেছে মাঠে,
আমাদের রক্তে শ্রমে পুষ্ট হয়েছে
ওই শস্যের প্রতিটি সবুজ কনা।[৩০]

কিন্তু মরা-মারির দেশে সে দিন তো আসেনা, সামরিক সন্ত্রাস আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্নগুলো মাড়িয়ে দিয়ে যায়, অব্যক্ত বেদনাগুলো বুকের মধ্যে চারিয়ে ওঠে আর অবোধ ভালোবাসাগুলো অব্যক্তই থেকে যায় ঃ 'আমাদের প্রিয় কথাগুলো, গল্পগুলো, প্রিয় স্বপ্নগুলো/ সেই শৈশবের মতো কতো দিন প্রান খুলে বলিনি কোথাও।/ আহা, কতো দিন আমরা আমাদের ভালোবাসার কথা বলিনি'।[৩১] ঘাতক মানুষের সংশ্রব ছেড়ে কবি তাই বিশ্বাসী

তরুতলে আশ্রয় নিতে চান ঃ 'ওই তরুতলে বিশ্বাসী ছায়া, ওই গৃহ ছায়া অবিনাশ,/ শরীর এখন ক্লান্তির কাছে নুয়ে আসে ঘোর অবসাদে-/ অবরোধ খোলো, আমাকে তোমার ওই ছায়াটুকু দাও'।[৩২]

তারপরও জনপদে মৃত্যুর হাহাকার ডেকে আনে কালো সময়। এই মৃত্যুকে থামাতেই হবে, না হয় জীবনের কাঙ্খিত বস্তুগুলো ফিরে আসবেনা। "নিশব্দ থামাও" কবিতায় রুদ্র বলেন :

ঘরমরা মৃত্যুহিম, লোকালয় ভয়ার্ত শ্মশান।
গান নেই, পাখি নেই, শব্দ নেই- নিশব্দ থাকাও
এ-ভীষণ বেদনার রক্তচোখ, ডাকাত নৈশব্দ ...
মৃত্যুকে থামাও, বলে আয় পাখি, আয় মুখরতা,
একবার ডেকে ওই এই কালো নির্মম সকালে।
লোকালয় গান হোক– জনপদ, নিসর্গ জানুক
এখনো পাখির আছে, গান আছে জীবনের ভোরে।[৩৩]

'কালো সময়ের ক্লেদ'গুলো কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না, নিষ্ফলা প্রান্তরে ভাঙনের ক্ষত নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। স্বপ্নের সংশয়ে সারা বেলা কেটে যায় সময়, স্বাধীন দেশে পরবাস জীবনে থেমে আসে গাঢ় অন্ধকার; কেননা, 'কতিপয় জন্মভুক প্রানী/ রক্তের উৎসব খ্যালে আমাদের প্রানের উঠোনে'।[৩৪] তুব আশা থাকে লুকানো বুকের মাঝে, অজন্মার আঁধার পেরিয়ে একদিন সব গ্লানি মুছে দেবে বৃষ্টির ঝাপটা :

ভালোবেসে প্রিয় সেই মাটির সিঁথানে যদি রেখেছি হৃদয়
তবে আজ বৃষ্টি হোক, অবিরল বৃষ্টি হোক উষর জীবনে,
ধুয়ে যাক জমাট রক্তের দাগ, পরাজয়, গ্লানির পৃথিবী।[৩৫]

এভাবেই রুদ্রের আবাদ ব্যক্ত হয় :'এই ধুলো, ক্লান্তি, ভুল, জীর্ন দুঃখগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফিরে যাবো স্বর্ণগ্রামে'।[৩৬] অথচ নারী ও নদী যান্ত্রিক স্রোতে বাঁধা পড়ে আছে, নদী এখন জালে আবদ্ধ খরগোশের মতো, উচ্ছল হরিণগুলো বাঁধা পড়ে আছে সুচতুর শিকারির পাতানো ফাঁদে আর 'তুমিও তো নেই প্রকৃতির সেই নারী,/ শস্যস্বপ্নে শ্রমবান শ্যামলিমা'।[৩৭] এই সামাজিক নিষ্ফলা প্রান্তরে আবার সবুজের স্বপ্নের রেনু মাখাতে হবে, সেজন্য আজকে কাঙ্খিত মেঘ ও বৃষ্টির কাঝে আমাদের যেতে হবে, বৃষ্টি ভেজাবে এদেশের রুক্ষ মাটি এবং তাতে ধুয়ে যাবে প্রথাগত সব মলিনতা; এসো প্রেম-ভালোবাসার মোহনীয় নারী আমরা– বৈরী স্বর্ণলতার আঁস্তাকুড়ে,/ পরগাছা মুখি বিরান বিরোধিতায়/ এসো অমলিন সবুজের ভাষা লিখি,/ চলো দুই জনে

শিখি বৃক্ষের প্রেম ॥'[৩৮] এই প্রেম ও প্রাকৃতিক ভালোবাসায় রুদ্র পেয়ে যান সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজের উপাদান :

আমার জিভ
আমি তাকে রূপশালি ভাতের সুঘ্রান দিতে চাই।
দিতে চাই শুভ্র শেফালির মতো শাদা ভাত।
তুমি আমাতে তৃষ্ণার্ত করেছো সকাল।
তুমি স্বপ্নের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছো আমার পথ।
আমার বোধ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো মানচিত্রের দিকে
আমার স্মৃতি তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো ইতিহাসের দিকে
আমার আকাঙ্খা তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আগামির দিকে
আমার আগামি
আমি তাকে পেতে চাই শ্রেনীহীনতার রোদে।
আমি তাকে মানুষের প্রাকৃতিক চেহারায় পেতে চাই
মানুষের পৃথিবীতে।
আমার আগামি
আমি তাকে শ্রমময় উৎসবের দিন দিতে চাই
দিতে চাই বৃক্ষ ও হরিনের মতো নিরাপদ প্রান।[৩৯]

এভাবেই কবি খুঁজে পেতে চান তৃষ্ণার্ত রমণে মীমাংসিত নারীকে; আর সেজন্যই কবি সমস্ত উদাসিনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। আর এভাবেই 'আমাদের পুরুষেরা সুলতানের ছবির পুরুষদের মতো/ স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ আর প্রচণ্ড পৌরুষদীপ্ত হবে।/ আমাদের নারীরা হবে শ্রমবতী, লক্ষ্মীমন্ত আর লাবন্যময়ী।/ আমাদের শিশুরা হবে পৃথিবীর সুন্দরতম সম্পদ/ আমরা শস্য আর স্বাস্থ্যের, সুন্দর আর গৌরবের/ কবিতা লিখবো'।[৪০] প্রকৃতির জল-বাতাসে প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন কবি এবং সেই দ্রোহী রূপ বাস্তবে সমাজে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেন; জল-বাতাসের মতো তীব্রতর হবে গণ মানুষের বিপ্লবী আন্দোলন, তখন কোনো ঘাতকের পালানোর পথ আর থাকবে না :

এই জল, এ বাতাস তুমি ঠেকাবে কিভাবে?
বুকের ভেতরে জল ফনা তুলে বাতাসে মাতম নিয়ে আসে
লতাগুল্ম আবরন ছিঁড়ে খুঁড়ে জেগে ওঠে তরুর ফসল,

কিশোরী কৈশোর ঠেলে ফুলে ওঠে বক্ষময় মাংশময় শোভা-
তুমি তারে কি দিয়ে ঠেকাবে?
কোথায় পালাবে বলো!
শরীরের সাথে সাথে তাড়া কোরে ফেরে প্রান, জলের নাগিনী।[৪১]

"দূষিত দুপুর" কবিতায় ফলের সম্ভারে সমস্ত খরা হাহাকারের অবসান ঘটাতে চান কবি– 'আমাকে ফলতে দাও নৈরাজ্যের দুষিত দুপুরে,/ হতে দাও শস্য-ভার-অবনত সোনালি খামার।[৪২] "পাললিক উদ্ধার" কবিতায় এ-কথাটিকেই অন্যভাবে বলেছেন রুদ্র– 'আমাদের তীর্থ হোক অঘ্রানের শস্যপূর্ণ ফসলের মাঠ'।[৪৩] একদিন রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশের মাটি ফলবতী হবে, ফসলের সুষম বণ্টন হবে; এটাই নারী প্রকৃতির মধ্যে বিপ্লববোধ জাগ্রত করতে চায় রুদ্রকে– 'জলন্ত আকাশ ঢাকে এক ঝাঁক জলের কনিকা,/ নিমেষে উর্বরতা নেচে ওঠে শস্যের সতেজ গ্রীবায়/ ফসলের সুষম বিন্যাসে'।[৪৪]

(গ) একনায়কত্ব স্বৈরশাসন ও বিপ্লবাত্মক প্রেরণা

রুদ্রের কবিতার সিংহভাগই হচ্ছে সামরিক স্বৈরাচারী সকরারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপ চাপিয়ে দেন তখনকার সরকার 'বাকশাল' গঠন করে। এর পরে পনেরো বছর সামরিক বাহিনী দেশ পরিচালনা করেছে, কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে। আইয়ুব-ইয়াহিয়াদের কাছ থেকে লক্ষ আত্মার রক্তক্ষরণে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তি, তা আবার এই দেশীয় সামরিক জান্তার দ্বারা কলুষিত হয়। আমাদের জানা দরকার যে, সামরিক সরকার যেহেতু একটা ডিক্টেটরশিপ একক ব্যক্তি কিংবা একক কোনো দলের বিষয়, সেহেতু তা কোন না কোন ধারায় একটা 'ইজমের' শিবিরভুক্তি হবেই। আবার এঁদের একটা মাত্র 'ক্রাসি' পছন্দ, আর তা হলো অটোক্রাসি বা স্বৈরতন্ত্র। অন্যদিকে এক নায়কের পক্ষে একা কাজ করা সম্ভব হয় না, ফলে তাঁকে একটা শিক্ষিত, চৌকস, বাধ্য এবং অনুগত নিজস্ব শ্রেণী বা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হয়; এই গোষ্ঠী বা দল কখনো একক রাজনৈতিক দল হতে পারে; যেমন স্বাধীনতা-উত্তর বাকশাল গঠন। আবার এই নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে একনায়ক শাসক রাষ্ট্রযন্ত্রটি সচল রাখার জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের উপর ন্যস্ত করে। কাজেই সামরিক বাহিনী কোন সময় 'পূত পবিত্র' ব্যাপার নয়। সেই প্রাচীন দাস রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আজকের নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো তাদের শক্তিশালী শোষক শ্রেণীর এক নায়কত্বের হাতিয়ার রূপে সমাজ-রাষ্ট্রে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন কালাকানুন আইন, কিশোর সংশোধনাগার পরিচালনার মানসিকতা নিয়েই দেশে দেশে একনায়কেরা স্বৈরতন্ত্র চালু করেন। একনায়কেরা দেশের সবাইকেই একসময়

দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত করেন। একনায়কের শক্তি প্রয়োগকারী ভূমিকা সাম্যবাদী দেশেও হতে পারে; যদিও তা করা হয়ে থাকে মেহনতি জনগণের স্বার্থের নামে। সেজন্য রাশিয়ায় ও পূর্ব ইউরোপে দলিত-মথিত মানুষ সমাজতন্ত্রকে বিদায় জানিয়েছেন। রাশিয়ায় বরিস প্যাস্টারনাক সোনিয়ভস্কি ও সোল জেনেৎসিন-এর মতো সাহিত্যিক, শাখারভের মতো বিজ্ঞানী, আঁদ্রে আমারলিকের মতো ঐতিহাসিক নিন্দিত, ধিকৃত, দণ্ডিত, নির্বাসিত কিংবা বহিস্কৃত হয়েছিলেন। চীনের সুসাহিত্যিক তিংশিং-এর ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা সবার জানা।[৪৫] স্ট্যালিনের সময় তো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথাও হয়ে পড়েছিল বিপদজনক। পূর্ব-ইউরোপের আলেকজান্দার ভাট ও স্টেকলভ-এর মতো বহু কবি সাহিত্যিকের বিপর্যয়ও আমাদের জানা।

একনায়কত্ব স্বৈরশাসন হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতা। এখানে ব্যক্তি মানস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় শোষিত হয় এবং জাতির একটা অংশ দীক্ষা পায় বর্বরতার। গোটা সমাজ দেহ রূপান্তরিত হয় একটা কোয়ারেন্টাইন বা নিষিদ্ধ শিবিরে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে এক সময় দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ-আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপরে উপরে তারা জনকল্যাণ, গণতন্ত্র– যত কথাই বলুন না কেন, মূলে তাদের কাছে অস্ত্র ও সন্ত্রাসই হয়ে দাঁড়ায়– রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। সামান্যতম বিরোধীতায় এরা কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলে এক নল থেকে আরেক নলে অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে যা তৈরি শক্তির দ্বারাই আরেক শক্তির উদ্ভব। জাতির ঘাড়ে চড়ে বসেছে শকুনি শাসন ব্যবস্থা– অধিকতর শক্তির দ্বারাই স্বৈরশাসনের উত্থান ঘটেছে। অথচ পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী শোষকদের জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্যই বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হয়েছিল। 'স্বাধীনতার সুফল' সকলের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি আজো আছে সকল নেতৃত্বের। কিন্তু সেই 'সুফল' নামক বস্তুটি কি, কবে তা পরিপক্ক হবে এবং কখন তা জনগণ পাবে, এর সঠিক জবাব কারো কাছে নেই। এক মায়া মরীচিকা যার পেছনে ছুটে চলেছে কোটি কোটি মানুষ। সামরিক স্বৈরশাসনে জাতীয় হীনমন্যতাবোধ জাতিকে ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, শোষণমূলক-পীড়নমূলক সমাজ ব্যবস্থা, সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়, ক্যু-শক্তির দাপট, আত্ম শক্তিতে অনাস্থা, আত্মবিস্মৃতি, সামাজিক ও জাতীয়চেতনার অভাবে জীবন এখানে বিপর্যস্ত, পঙ্গু এবং বিকৃত– 'দুগ্ধবতী গাভিদের ভরাট ওলান চোষে অজন্মার দুধরাজ সাপ', তারপরও যারা চুপ চাপ বসে থাকে, তাদের প্রতি রুদ্রের ভাষা শালিনতাবোধ হারিয়ে ফেলে :

শালা সব বেজন্মার জাত,
অভাবি মায়ের মুখে থুতু দিয়ে ওরা যায় গনিকার ঘরে।
তাদের চিহ্নিত করো, খুলে দাও মুখোশের বিচিত্র লেবাস,
নাড়ার বোলেন জ্বেলে ওই সব ভীরু মুখ পোড়াও আগুনে।[৪৬]

যেখানে অবরোধ জীবনের চারিদিকে, সেখানে মানুষ পালাবে কোথায়? তাকে অনুশোচনার এক কালো কুকুর তাড়িয়ে ফিরবে: 'তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে?/ সারাক্ষণ ছায়ার মতো সাথে-সাথে ঘুরবে ঘাতক,/ অনুশোচনার কালো এক কুকুর/ তোমায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে ফিরবে'[৪৭]– তোমার পক্ষে কোথাও নিশ্চুপ অথর্ব হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, 'আগুন লেগেছে দেশে-গ্রামগঞ্জ-নগরে নিভৃতে,/ পুড়ে যায় দুধভাত, রাইশস্য, নবান্ন, নলেন গুড়'।[৪৮] বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না, অথচ ঘরে ঘরে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়, স্বৈরতন্ত্রী এক 'সুশ্রী তনু ইঁদুর এসে দেহে/ কাটে জীবন-স্বপ্ন-শুভতরু।'[৪৯] ডিক্টেটরিয়াল নীতি ও পদ্ধতি আমাদের মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধসমূহ চরমভাবে অবদমিত ও অবমানিত করে যায়, আমরা টের পাই না :

ক্ষুধার শয্যা পেতে এক মন্বন্তরের ক্ষুধিত শকুন
মননের হাড় থেকে ছিঁড়ে খায় বোধিপ্রেম, সুস্থতার মাংশ,[৫০]

অনুশোচনা আর ঘৃণাতে এই অবক্ষয় বিতাড়িত হবে না, এর জন্য চাই আগুন, রুদ্রের মন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে, সামাজিক শৃঙ্খলায় পীড়িত হতে হতে :

ও মন, আমি আর পারি না ...
বাঘের থাবায় হরিন ঘায়েল,
হায়রে আমি হাত পা বাঁধা
ঠিক সাঁকোটির মধ্যিখানে
দুই দিকে দাঁত, দুই দিতে নোখ,
দুই দিকে দুই বন্য শুয়োর এবং ঘৃনা
শুধুই ঘৃনা–
ও মন শুধু কি ঘৃনায় শস্য ফলে?
মাটির জন্যে মমতা কৈ?
ভালোবাসার জন্যে সে লাল আগুন কোথায়?[৫১]

স্বৈরতন্ত্রী শাসকেরা জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য উন্নয়নের বিরাট ফর্দ সভা-সমিতিতে গেয়ে বেড়ান। গোটা জাতিকে খুবই শ্রুতি সুখকর ও লোভনীয় কোনো না কোনো প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস তাঁরা দিতে থাকেন। দেশকে অন্যায়-দুর্নীতি-অবিচার মুক্তির ঘোষণা তাঁরা দেন এবং সরকার বিরোধীদের তাঁরা দেশদ্রোহীর পর্যায়ে ফেলেন। জনগণের চোখ ধাঁধাঁনোর জন্য তাঁরা দেশের বহিরঙ্গে পলেস্তারা লাগাতে থাকেন, ভেতরের ক্ষতের চিহ্নগুলো ঢাকতে থাকেন। দেশের চেহারা পাল্টে– 'স্কাই স্ক্রপার' অট্টালিকা আর সুদৃশ্য ভবনের বিচিত্র

সমাহার ঘটাতে থাকেন; প্রকৃতি নিধন করে চাকচিক্যের নগর গড়ে তোলেন। রুদ্র এই বৈষম্যের প্রতিবাদ জানান, মেকি সভ্যতার ফানুস থেকে জনগণকে সতর্ক করতে কবিতাকে টেনে আনেন রাস্তার মানুষের কাছে। ব্যঙ্গ করেন "রাস্তার কবিতায়" পুঁথি সাহিত্যের আদলে :

আহা বঙ্গদেশ, ২,রঙ্গবেশ, কতো রঙের খেলা,
তন্ত্রে-মন্ত্রে যুদ্ধ চলছে, চলছে শিল্প-মেলা।
আমরা চুনোপুঁটি, ২,গুটি সুটি থাকি ঘরের কোনে,
রুই বোয়ালের বড়ো বুদ্ধি বড়ো যে তার মানে।
তবু যে টুকু বুঝি, ২,তাই পুঁজি, তাও যে হয় মিস্,
গাছ পালা কাইটা ঢাকার বানাইছে প্যারিস।
... ...
ভাইরে বিশ্বাস করো, ২,বুকে বড়ো ব্যথার আগুন জ্বলে,
আর্ত মানুষ পিষে ওরা সুখের দালান তোলে।[৫২]

কবিতা তাই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী আকার ধারণ করে : 'কবিতা এখন প্লাটফর্মের ভিড়ে,/ অনশ্চিয়তা রাত্রির মতো কালো।/ কবিতা এখন মিছিলে ক্ষব্ধ হাত,/ স্বৈরশাসন বিরোধী প্রথম ভাষা।/ কবিতা এখন ট্রাকে চাপা দেয়া লাশ,/ রক্ত মগজ পেষা মাংশের থুপ।/ কবিতা এখন গুলি খাওয়া জমায়েত,/ কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় রক্ত চোখ।'[৫৩] কবিতা এখন প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে জানাতে উৎসুক– 'মরিচ তেলের কৃত্রিম সঙ্কট,/ প্রশাসন জুড়ে লুটের মহোৎসব' এবং কবিতা আরো জানাতে চায়– 'দুঃশাসনের সকল স্বৈরাচার,/ চতুর্পার্শে রাতের বাড়ানো থাবা'র মধ্যে প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে : 'মিছিলের পরে পুলিশের খুনী ট্রাক,/ সুবিধাবাদের রমরমা রাজনীতি,/ সংলাপে সুখি নেতাদের নটিপনা'।[৫৪] আমাদের দেশে স্বৈরশাসকের জারিজুরি রুদ্র ঘোঁচাতে চান এভাবে। খল নেতৃত্বের প্রতি তাঁর অবোধ ঘৃণা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে তাঁদের দীর্ঘ দিনের ঘাতকী শাসন আর মিথ্যাবাদী প্রতিশ্রুতির কথা এবং তাঁদের পেটুয়া বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহা :

এখন তোমাকে আর ঘৃনা করতে চাইনা,
আমি থুতু দিতে চাই জলপাই বাহিনীর মুখে–
যারা শিশু একাডেমী, নীলক্ষেত রক্তে ভিজিয়েছে,
যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে গুলিবিদ্ধ লাশ,
বুটের তলায় পিষে যারা খুন করেছে মানুষ;
আজ সেই জলপাই বাহিনীর রক্ত নিতে চাই॥[৫৫]

আশির দশকের সামরিক স্বৈরাচার শাসনামলে দেশে লাশের পর লাশ পড়ে থেকেছে, সামরিক বাহিনীর হাতে মানুষ জিম্মি; কোন প্রকার সমালোচনা স্বৈরশাসক পছন্দ করেন না, বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে গণআন্দোলন দানা বাঁধলেই স্বৈরশাসকের ভয়; সেখানেই চলে বর্বর বাহিনীর ষ্টিম রোলার। আবার গণসমর্থন পেতে স্বৈরশাসক ধর্মের আশ্রয় নেয়, রুদ্র তাই স্বৈরশাসককে 'সাম্প্রদায়িক শকুন' বলেছেন এবং স্বৈরশাসকের মসনদ প্রীতিকে তুলনা করেছেন 'লোভাতুর কুকরের'[৫৬]– সাথে। বৃষ্টি হলে স্বৈরশোষণে নিহত লাশগুলো আবার দাঁড়াতে চায়, "লাশগুলো আবার দাঁড়াক" কবিতায়– স্বৈরনির্যাতনের বীভৎসতা আছে এবং বিপর্যস্ত পরিবেশের বর্ণনা বিদ্যমান– 'পরিচিত শেয়ালেরা সারারাত হল্লা কোরে ফেরে/ উপরে শকুন ডাকে, শকুনের এখনো সুদিন।/মাংশের ঢেকুর তুলে নেড়িকুত্তা বেঘোরে ঘুমায়–/ মাটি কাঁপে, লাশগুলো আবার দাঁড়াতে চায়'।[৫৭] সামরিক বাহিনীর বিচিত্র নির্যাতনের বর্ণনা আছে– "কনসেন্টেশন ক্যাম্প" কবিতায়, গণমানুষের আন্দোলনে জলপাই বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের বীভৎসতা থেকে বিপ্লবের উত্তরণের আভাস পাওয়া যায় এতে; এখানে দু'টি অংশ উল্লেখ করা হলো :

ক. তাকে চিৎ করা হলো।
পেটের উপর উঠে এলো দুই জোড়া বুট, কালো ও কর্কশ।
কারন সে তার পাকস্থলীর কষ্টের কথা বলেছিলো,
বলেছিলো অনাহার ও ক্ষুধার কথা।
... ...
তার দুটো হাত–
মুষ্টিবদ্ধ যে হাত মিছিলে পতাকার মতো উড়েছে সক্রোধে,
যে-হাতে সে পোষ্টার সেঁটেছে, বিলিয়েছে লিফলেট,
লোহার হাতুড়ি দিয়ে সেই হাত ভাঙা হলো।
সেই জীবন্ত হাত, জীবন্ত মানুষের হাত।[৫৮]

খ. সে এখন মৃত।
তার শরীর ঘিরে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়ার মতো
ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত, তাজা লাল রক্ত।
তার থ্যাতলানো একখানা হাত
প'ড়ে আছে এদেশের মানচিত্রের উপর,
আর সেই হাত থেকে ঝড়ে পড়ছে রক্তের দুর্বিনীত লাভা-[৫৯]

কোনো দাবি-দাওয়া, কোনো সমালোচনা সামরিক স্বৈরাচারী বরদাস্ত করতে পারে না। বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকারেরও ওই একই প্রবণতা। মিছিল-মিটিং, ধর্মঘট, বিক্ষোভের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং তা থেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি নির্দেশ আসে আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য। "সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি" কবিতায় রুদ্র এসব সৈনিকের বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা কোন্ পক্ষে যাবে, কেন তারা নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচারের টার্গেট প্রাক্‌টিস করছে, তারা কোথা থেকে এসেছে এবং কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তারা, তার বর্ণনা আছে। "ঘোষণাঃ ১৯৮৪" কবিতায় স্বৈরাচারী সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের যোগ্যতাহীনতা ও কুকর্মের ব্যঙ্গ আছে এবং সবশেষে স্বৈরশাসনের অবসান :

আমরা এই দুঃস্বপ্নের অবসান চাই
আমরা এই দুর্ভাবনার অবসান চাই
আমরা এই দুর্ব্যবস্থার অবসান চাই।[৬০]

"নৈশভোজ '৮৩" কবিতায় সামরিক ডিনার টেবিলে মন্ত্রী, আমলা, প্রাক্তন গেরিলা, বাম দলত্যাগী নেতাদের বিচিত্র ব্যসনের ব্যঙ্গ আছে, জনগণের শ্রম ও রক্তাক্ত আন্দোলনের নির্যাসের সংশ্লেষণ ঘটেছে স্বৈরাচারী ব্যসনের সাথে। যেমন :

টেবিলে পূর্নিমা-শাদার পরে সাজানো খাবার-
চাষার চামড়া দিয়ে তৈরী করা মোঘল পরোটা,
রক্তের হালুয়া আর শ্রমিকের যক্ষা, সিফিলিস।
ধর্ষিতা নারীর সুপ, কাটামাথা অজ্ঞাতনামার।
নিহত ছাত্রের লাশ, গুলিবিদ্ধ, রক্ত মাটিমাখা,
বুলেটের কোর্মা আর বুটে পেষা শিশুর কাবাব।
ডিসজোড়া চমৎকার নিহত জয়নালের রোস্ট,
আধাসিদ্ধ গণতন্ত্র আর তাজা মানুষের জিভ্,
ভয়ানক চেয়ে থাকা পুলিশের উপড়ানো চোখ-
ডিনার টেবিল জুড়ে মনোরম খাদ্য আয়োজন।[৬১]

স্বৈরশাসক আনুগত্য আদায়ের জন্যে এসব নেতৃস্থানীয় অমানুষগুলোর দ্বারা মসনদ ও তোষামোদ আদায় করে নেয়। মাঝারি গুণসম্পন্ন এসব স্বার্থবাদীরা এ শাসকের কোনো সমালোচনা করে না। নিজের প্রতিটি কাজে সক্রিয় সহযোগিতা, একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে তোষামোদ ও বাহবা না পেলে স্বৈরশাসকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তাদের তোষামোদ আদায়ের জন্যই বিচিত্র অনুষ্ঠান ও ভোজের আয়োজন করা

হয়। এসব নেতারা স্বৈরাচারের গুণকীর্তনে পটু, 'মহামান্য', 'মাননীয়', 'শ্রদ্ধেয় স্যার' ইত্যাদি বলায় এঁরা পটু। স্বৈরাচারী ক্রীতদাস এঁরা, স্বৈরশাসককে দেশ প্রেমিক অভিধায় ভূষিত করে। এশীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই সামরিক শাসন এসেছে পুরনো ঔপনিবেশিক প্রভু বা সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দেশীয় সহযোগী মুৎসুদ্দী ও উদীয়মান এসব ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। ক্ষমতার দণ্ড হাতে নিয়ে তারা রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের সুবিধা মতো ঢেলে সাজাতে শুরু করে। যেহেতু দেশ শাসনও একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, তাই সামরিক শাসকরাও দেশ গড়ার নামে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। তাছাড়া নিরংকুশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক লেবাস ধারণের প্রয়োজনীয়তা জড়িত। তাই সামরিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে বেসামরিক আমলা, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ ও সুবিধাভোগী আমলাদের একটা আঁতাত গড়ে ওঠে এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে এঁরা নিজেদের খায়েশ নিবৃতের বাসনায় মত্ত থাকেন। এই চক্রকে নিয়েই স্বৈরাচারীরা দেশের মেহনতী জনতাকে শোষণ করেন। আইন-শৃঙ্খলার দারুণ অবনতির অজুহাতে রাষ্ট্রযন্ত্র ধখল করে এসব স্বৈরাচারীরা মসনদ দখল করে আজীবন এসব পা-চাটাদের নিয়ে ক্ষমতার দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়ে যান; তাই ব্যারাকে ফিরে যাবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি একটা বড়ো ভাওতা মাত্র। 'মিলিটারী-পলিটিক্স সিস্টেম'-এর দোহাই পেড়ে স্বৈরাচারীরা সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধেরই চেষ্টা চালাতে থাকেন সামরিক বাহিনীর দ্বারা। দিন দিন আইন-শৃঙ্খলার আরো বেশি অবনিত হয় এঁদের শাসন-শোষণে। এঁরাই সুষ্ঠ রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যক্রমের পরিবেশ জঘন্যভাবে বার বার কোনঠাসা করছেন। তাই বাঙালির চরিত্রের সাথে অসংখ্য মনি-মুক্তোর মতো জড়িত হয়ে আছে অসংখ্য বিশেষণ– প্রতারক, ভণ্ড, ক্রীতদাস, লোভী, নিন্দুক, নির্লজ্জ, চক্রান্ত পরাষণ, বিশ্বাসঘাতক, দায়িত্বহীন, অবিবেচক, অমানবিক, খল, বাচাল, চিৎকার পরায়ন ইত্যাদি অভিধায় বাঙালি আজ ভূষিত। স্বৈরাচারের 'লকলকে জিভ' গোটা দেশকে পরিণত করে 'লখিন্দরের লোহার বাসর'।[৬২]

স্বার্থবাদী এই নৈরাজ্যিক পরিবেশে সুষ্ঠুবোধ হারিয়ে রুদ্র হয়ে পড়েন প্রতারক সমাজে আত্মপ্রকাশের বাঁধা স্বরূপ নারী সংসার এবং তাঁর সাম্যবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্রকেও অহেতুক ভাবার প্রেরণা বোধ; বিশেষ করে বাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে রুদ্র আপোষহীন এবং এদেরকে ভাবেন আত্মপ্রকাশের জন্য সবচেয়ে বড়ো বাঁধা হিসেবে :

> তুমি মানে প্রতারনা, শোকেসে সাজিয়ে রাখা কার্ল মার্কস, লেলিন,
> মানে সভামঞ্চে শ্রমিক শ্রেনীর পক্ষে তেজী শব্দাবলী,
> মানে চার ইঞ্চি ফোমে গা ডুবিয়ে
> নগ্ন স্তনে হাত, চোখে স্বপ্ন–

ব্যালকনিসহ বাড়ি,

ব্যক্তিগত দ্রুতযানে স্মৃতিসৌধ দেখে আসা।[৬৩]

সামরিক স্বৈরশাসনে 'সুস্থতার ভূমিকায় ভাঁড়েরা মানিয়ে যায় অবিকল'[৬৪], অথচ লাম্পট্যের খ্যামটামো নাচোনে গোটা দেশ বাড়তে থাকে 'নিদ্রাহীন রাত্রির প্রহর'।[৬৫] দেশের 'কোথাও সুস্থতা নেই। এ সময়ে শোষণের সুশোভন নামই সুস্থতা'।[৬৬] কেননা, স্বৈরশাসনের বদৌলতে আমাদের সমাজে 'কুলোক সকল লোকে রূপান্তরিত হলেন/ বিভিন্ন প্রথম সারিতে তাদের মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকলো।/ নটেগাছটি মুড়োলো–/ অতঃপর কুবিহীন সুসময় বেতারে টিভিতে/ প্রকাশিত হতে থাকলো প্রত্যেক দিন'।[৬৭] রুদ্র এই অসামঞ্জস্য এবং সুবিধাবাদী-স্বার্থবাদী নপুংসক রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্যঙ্গের ভাষায়; তাঁর ধারালো ও শাণিত ভাষা এঁদের বিরুদ্ধে তিক্ষ্ণ চাবুকের বান মেরেছে। আরো কটি দৃষ্টান্ত :

ক. আমলা থাবার নিচে শিল্পকলা,
গলা, পচা, কাড়াকাড়ি তাই নিয়ে-[৬৮]

খ. জলোচ্ছাসে ভেসে যাক
নম্র প্রলেতারিয়েত।
পাঁচ তারায় বাড়ুক শ্রমিকের রক্তে ভরা গ্লাস।
আর তার গন্ধ শুঁকে সৌখিন বিপ্লববাদি
গেয়ে উঠুক চিয়ার্স-চিয়ার্স-চিয়ার্স ...[৬৯]

গ. বুটের ডগায় হাসে স্বদেশের প্রাকৃতিক শ্যামলিমা,
আর দু একটি দল ছুট শাদা দিগন্ত-কবুতর
উড়ে যেতে চেয়ে দ্যাখে পায়ে বাঁধা প্রতারক শৃঙ্খল।[৭০]

ঘ. উন্নয়ন রাজনীতি চর্চা কোরে উন্নত করেছে যারা ক্যাশ,
ব্যক্তিগত চেকনাই, লাবন্য শোভন মেদ স্বাস্থ্য সমাচার,[৭১]

ঙ. কেবল তোমার চোখে সেঁটে ছিল
কাড়ি কাড়ি টাকার বাণ্ডিল,
ক্ষমতার মসৃন পিচ্ছিল এক সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
তুমি তো পৌঁছেছো
নরকের নিসঙ্গতা-মাখা সোনালী চূড়ায়।[৭২]

আমাদের বাংলাদেশে স্বৈরাচার ও পীড়নের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈষম্যের দেয়াল। রাষ্ট্রীয় কার্যালয়, ধনপতিদের স্বার্থবাদী বিত্তের গড়া বিরাট বিরাট প্রাসাদ দেখে মনে হয় এক একজন লৌহমানব দাঁড়িয়ে আছে; এর বুঝি আর অবসান হবে না। কিন্তু রুদ্র মনে প্রাণে চান এই দেয়ালের অবসান হবে, হারানো মানুষের গৌরব আবার ফিরে আসবে এবং বৈষম্যের দেয়ালগুলো মাড়িয়ে বাংলাদেশে গণমানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবেই। এই অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের দেয়ালের পতন আসন্ন। সেনাশাসনের গড়া এই দেয়াল একদিন ভেঙে যাবে। রুদ্র সেই স্বপ্ন দেখেন, সে আশা বাঁচিয়ে রাখে অন্ধকার-কদর্যপূর্ণ সমাজটাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল, দেখছোনা পথ বন্ধ।
এখন তোমাকে ফিরতেই হবে
ফনা তোলা সামটির দিকে,
মুখোমুখি
দাঁড়াতেই হবে-ঠাণ্ডানল, বন্দুকের
সামনে দেয়াল।
… … … … …
এখন জলোচ্ছাসের মতো শুধু স্থলভাগে
ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক মুহূর্তটি চেনা দরকার।[৭৩]

খ. স্বৈরাচারে ছিন্নভিন্ন দেশটি তবু স্বপ্ন থাকে,
অবহেলায় ধুলোয় পড়া বীজটিতেও স্বপ্ন থাকে।[৭৪]

গ. এই তো আবার আমি দাঁড়িয়েছি কৃষ্ণপক্ষ পৃথিবীর তীরে।[৭৫]

ঘ. পাললিক মাটি, জল, অরণ্য ও শস্যের সন্তান,
তাকাও সূর্যের দিকে, শিখে নাও বিপুল দহন।
আত্মার ভেতরে ফিরে জ্বলে ওঠো রক্তের ভাষায়–
ভাষায় কে, মাটিতে শিকড় যার রয়েছে প্রোথিত।[৭৬]

ঙ. শোষনের বিষে ভরে গেলে সর্বত্র
মুষ্টিবদ্ধ হাত জেগে ওঠে প্রতিবাদে
একথা তোমরা জানো।
রাজপথ রঞ্জিত হলে নিষ্পাপ রক্তে
আগামী সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়।[৭৭]

(ঘ) সম্মিলিত সাম্যবাদের

মানুষ এ পৃথিবীতে আসবার চল্লিশ লাখ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, নৃবিজ্ঞানীদের এমনই ধারণা। আর আমাদের এতদাঞ্চলে মানুষের যাপিতকাল ধরা হয় মাত্র দশ হাজার বছরের। এই দশ হাজার বছরের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় সম্বন্ধে আমাদের এখনো স্পষ্ট ধারণা জন্মায়নি। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী মর্গান এ সময়টাকে বলেছেন বন্যদশা (সেভেইজারি), এটাকেই কেউ নিষাদ সমাজের যুগ, আবার কেই আদিম সাম্যবাদী সমাজের যুগ বলেন। তাই সমাজ পরিবর্তনের ধারায় আমরা পাঁচ প্রকার সমাজের কথা জানতে পারি; সেগুলো হচ্ছে : আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্তবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ। আদিম সমাজে মানুষ সাম্যবাদী ধরনেরই ছিল; প্রকৃতি আর প্রাণী থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী। বাংলার মানুষ তখন দলবদ্ধ হয়ে বন-জংগলে বাস করতো, নদী ও সমুদ্র থেকে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা ছিল কৌম সমাজের লোক; বন্য প্রাণী থেকে বাঁচার জন্য সংঘবদ্ধভাবে থাকতো। এদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এদের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদ ছিলনা, সবাই এক সাথে খেতো। তাই সে যুগে বর্ণবাদী বা শ্রেণী বিভাগ হড়ে ওঠেনি; তারা ছিল শ্রেণীহীন। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সেদিকে ইংগিত করে বলছেন :

> পৃথিবীতে মানুষ তখনো ব্যক্তিস্বার্থে ভাগ হয়ে যায়নি।
> ভূমির কোনো মালিকানা হয়নি তখনো।
> তখনো মানুষ শুধু পৃথিবীর সন্তান।[৭৮]

ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী অবস্থাকে ভারতীয় সাম্যবাদ বলা হয়ে থাকে।[৭৯] তবে সমাজে সব কিছু পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ধরণ। আর এ দুটোরই সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে নতুন নতুন সমাজ। আদিম সমাজেও সেজন্য টোটেম নেতা এবং কুলপতিদের নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ায় এক ধরনের স্তর বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ধনসঞ্চয়ের স্পৃহা দেখা দেয় এবং এতে করেই এ উপমহাদেশে কালক্রমে পরিবার ও গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত আদিবাসী অষ্ট্রিকরা কৃষি প্রধান এবং গ্রামীণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। লৌহযুগে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে এবং সমাজে সম্পদ ভিত্তিক শ্রেণীর জন্ম হয়; আর এভাবেই শ্রেণীভেদ দেখা দিল। তারপরও তখনো অতটা হানাহানি শুরু হয়নি, কেননা তখনো অষ্ট্রিক সমাজে ব্রাহ্মন্য ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। নারীরা চাষাবাদ করতো, পুরুষেরা শিকার করতো এবং মিলেমিশে আহার ও নৃত্য করতো। রুদ্র বলেন :

> আমাদের নারীরা জমিনে শস্য ফলায়
> আর আমাদের পুরুষেরা শিকার করে ঘাই হরিন।

আমরা সবাই মিলে খাই আর পান করি।
জ্বলন্ত আগুনকে ঘিরে সবাই আমরা নাচি
আর প্রশংসা করি পৃথিবীর।[৮০]

তখনো আমরা শুধু আর্য, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান বলে বাঙালির তখনো কিছু ছিলোনা এবং আর্যের আগমন তখনো ঘটেনি এবং শ্রেণীভেদ ও প্রভুত্বের মোড়লীপনার আবির্ভাব তখনো প্রকাশ পায়নি। 'বস্তুতঃ বাংলায় খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে কৃষি-অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত শাসন শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে সেখানে সামাজিক স্তর বিন্যাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে'।[৮১] "আমরা অনার্য" কবিতায় এদিকে ইংগিত করেই রুদ্র বলেন :

কৃষি সভ্যতার আদি সোনালিমা পতাকা উড়িয়ে
আমরাই বাজিয়েছিলাম স্নিগ্ধ জীবনের বাঁশি।
সুষম বন্টন আর গ্লানিহীন শ্রমের সময়
দিয়েছিলো আমাদের আনন্দের উন্মাতাল দিন।
আমরা দেখিনি আগে বৈষম্যের বৈদিক কুঠার,
শোষনের কালো চাকা, ক্ষমাহীন করাল চাবুক,
আমরা দেখিনি কোনো মানুষের রক্তমাখা দাঁত।
শিল্পের নিমগ্ন তারে চিলো রাখা শোভন আঙুল,
আমাদের কণ্ঠে ছিলো প্রাকৃতিক সুরের সৌরভ,
আর ছিলো বুকজোড়া আদিগন্ত নগ্ন ভালোবাসা।[৮২]

আদিম কৃষি সভ্যতা আর ভ্রাতৃত্ববোধ; শৃঙ্খলাবদ্ধ এই মানুষের ইতিহাস আমাদের জানতে দেয়া হয়নি; রুদ্রের কবিতায় সে দিকেও ইংগিত আছে– 'তোমাকে জানতে দেয়া হয়নি তোমার পূর্বপুরুষের সুপ্রাচীন সভ্যতার কথা,/ কৃষিকর্মে সুনিপুন, শিল্পে সমাহিত আর সাগর বাণিজ্যে ডিঙা সপ্ত মধুকর।'[৮৩]

(২)

আদিম সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজের ভেতরে ধীরে ধীরে ব্যক্তিমালিকানাবোধ জাগ্রত হলো এবং জমির মালিকরা দাসদের বিভিন্ন কাজে; বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খাটাতে লাগলো। তারপর আর্যরা এলো, স্থানীয় আদিবাসীদের হটিয়ে অথবা গোলাম বানিয়ে সাম্য সমাজে শ্রেণীভেদের শোষণ দাঁড় করালো। এমন কি প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের যে সিন্ধু সভ্যতার কথা আমরা জানি, সেখানেও দেখা যাচ্ছে

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় যে সব অধিবাসীরা ছিলো, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে সেখানে জেঁকে বসেছিলো এবং এ দু'টো নগর শাসন করতেন পুরোহিত রাজা। বৈশ্য এবং শূদ্ররা ছিল সেখানে নিচু স্তরের লোক এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তাদের উপর অত্যাচার চালাতো; পরে অবশ্য আর্যদের আগমনে এ নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।[৮৪] কৃষি উৎপাদনে দাস সমাজে ধাতু নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অবিষ্কার হলো; কিন্তু জীবন ধারণের জন্য দাসরা প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো। একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া অন্য সবার ভাগ্যে জুটেছে অনাহার, ব্যাধি এবং উচ্ছেদ। এভাবেই দাঁড়িয়ে যায় দাস ও মালিকের মধ্যে শ্রেণীসংঘাতের এবং শোষক ও শোষিতের মধ্যে ভেদাভেদের দেয়াল। এ প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেন : 'সত্য যুগে সর্বাধিক বিকাশ প্রাপ্ত দাসপ্রথার প্রথম উন্মেষ থেকেই শোষক ও শোষিতে সমাজে শ্রেণীভেদ ঘটে। এই বিভেদ পুরো সত্যযুগ জুড়েই অব্যাহত রয়েছে। শোষণের প্রথম রূপ দাস প্রথা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য।'[৮৫]

দাস সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর মধ্যযুগে কৃষি-অর্থনীতির আর এক নাম সামন্তবাদ বা ফিউডালিজম গড়ে উঠলো। ইংরেজ আগমনের পূর্বে প্রায় তেরোশো বছর ধরে চলেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। 'ভূমি নির্ভর অর্থনীতি, সেনা নির্ভর রাজনীতি এবং ধর্ম ও ঐতিহ্য নির্ভর সংস্কৃতি ছিল জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রধান দিক নির্দেশক।'[৮৬] আর জাতি বর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষয়িত্র, বৈশ্য, শূদ্র– এই চার বর্ণ যেন সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের চার এস্টেট।[৮৭] এ সামন্তবাদ সমাজের ব্যবধান ছিল বিরাট। ব্রাহ্মণ ও ক্ষয়িত্রদের নিয়ে সমাজে শাসক শ্রেণী গঠিত এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের সমম্বয়ে গড়ে ওঠে শাসিত গোষ্ঠী। অভিজাতরা তাদের জমিগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং দাসদেরও মুক্তি দিয়ে জমিতে বসিয়ে দেয়া হলো। এটা একদিকে তাদের স্বাধীন করা হলো বটে, অপরদিকে ঠিক তাদেরকে দাসও করা হলো, কেননা জমি তো জমিদারেরই থাকলো। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু; এই যে গালগপ্পো সেটা শ্রমিক শ্রেণীর আদৌ ছিলনা, ছিল শ্রম নিয়ন্ত্রনকারীদের। এভাবে প্রাচীন সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো; শাসক শ্রেণী উৎপাদক ও অধিকারবিহীন শূদ্ররা ছিল দাসতুল্য, কার্ল-মার্কস বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'মর্যাদাহীন রুদ্ধ স্রোত এই নিশ্চেষ্ট জীবন, জড়ের ন্যায় এই জীবনযাত্রা, উৎকট, উদ্দেশ্যহীন ... এই পরিস্থিতি মানুষকে অবস্থার প্রভু না করে তাকে বাহ্য অবস্থার দাস করে তুলেছিল। পরিবর্তনশীল এক সামাজিক অবস্থাকে এক অপরিবর্তনীয় পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়তিতে রূপান্তরিত করেছিল'।[৮৮] "ইশতেহার" কবিতায় রুদ্র এই শ্রেণী বিপর্যয় তুলে ধরেছেন এভাবে :

কৌম জীবন ভেঙে আমরা গড়লাম সামন্ত সমাজ।
বন্য প্রানীর বিরুদ্ধে ব্যবহাযোগ্য অস্ত্রগুলো

আমরা ব্যবহার করলাম আমাদের নিজের বিরুদ্ধে
আমাদের কেউ কেউ শ্রমহীনতায় প্রশান্তি খুঁজে পেতে চাইলো।
দুর্বল মানুষেরা হয়ে উঠলো আমাদের সেবার সামগ্রী।
আমাদের কারো কারো তর্জনী জীবন ও মৃত্যুর নির্ধারক হলো।[৮৯]

ভারতবর্ষে দাসত্বের প্রথা ছিল বহুকাল ধরেই এবং মানুষ কেনা-বেচাও চলতো। ক্রীতদাসদের হয় ঘরোয়া কাজে অথবা কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানো হতো। 'এমন কি ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ওয়ারেন হেস্টিং-এর গভর্ণমেন্টও কয়েদী ডাকাতদের স্ত্রী-পুত্রকে দাস-দাসীর বাজারে বিক্রি করেছে'।[৯০] সে যাই হোক, বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের ছিল। গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থার এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষ ছিল শৃঙ্খলিত। কার্ল মার্কস বলেছেন, 'সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির প্রধান আকার হল একদিকে ভূমিসম্পত্তি আর তার সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস-শ্রম, আর অন্যদিকে দিন মজুরের শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্র পুঁজিওয়ালা ব্যক্তি মানুষের শ্রম নিয়ে'।[৯১] এটা স্মরণীয় যে, ভারতে শিলালিপি ও সাহিত্যে 'সামন্ততন্ত্র' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও তারা ইংল্যাণ্ডের সামন্তদের মতো নিজেদের কোনো সংগঠন বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; এটি মূলত একটা সাহিত্যিক প্রয়োগ মাত্র। অন্যদিকে মুদ্রাভিত্তিক আর্থিক জীবন ও গ্রামীণ অঞ্চলে বাণিজ্যের বিকাশের ফলে মুসলমান শাসনামলে জমির উপর কৃষকদের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ভেতর গুটিকয়েক ভূমি মালিক ছাড়া ব্যাপক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মজুরই থেকে যায়। এ সময় বাংলার সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এক ধরনের লগ্নিপুঁজির ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজে পেশাদার মহাজন শ্রেণীর জন্ম হয়।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলদের ক্রম পতনের কালে সামন্তবাদের পতন ঘটতে থাকে এবং সামন্ত শ্রেণী এলিটদের চক্রাকারে আবর্তন ঘটতে থাকায় যারা ব্যবসা ও অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করছিল তারাই ক্রমশ ধনী হয়ে উঠতে থাকে। সেটাকে সামজবিজ্ঞানী পেরেটোর ব্রাহ্মণদের স্থান মুসলমান উলামাদের দখল করার কথা বলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভারতের মুসলিম সমাজ মুখ্যতর ছিল শহরকেন্দ্রিক। এক আকবরের সময়েই কমপক্ষে ১২০টি বড় শহর ও ৩২টি ছোট শহর ছিল। ব্যবসা ও দাদনি কারবারের প্রসার ঘটতে থাকে। সেই থেকে গ্রামে-গঞ্জের কৃষকরা মহাজনের স্বার্থের কাছে বলি হতে থাকে। রুদ্রের ভাষায় :

আমাদের নির্মিত যন্ত্র শৃংখলিত করলো আমাদের
আমাদের নির্মিত নগর আবদ্ধ করলো আমাদের

আমরা ব্যবহার করলাম আমাদের নিজের বিরুদ্ধে
আমাদের কেউ কেউ শ্রমহীনতায় প্রশান্তি খুঁজে পেতে চাইলো।
দুর্বল মানুষেরা হয়ে উঠলো আমাদের সেবার সামগ্রী।
আমাদের কারো কারো তর্জনী জীবন ও মৃত্যুর নির্ধারক হলো।[৮৯]

ভারতবর্ষে দাসত্বের প্রথা ছিল বহুকাল ধরেই এবং মানুষ কেনা-বেচাও চলতো। ক্রীতদাসদের হয় ঘরোয়া কাজে অথবা কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানো হতো। 'এমন কি ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ওয়ারেন হেস্টিং-এর গভর্ণমেন্টও কয়েদী ডাকাতদের স্ত্রী-পুত্রকে দাস-দাসীর বাজারে বিক্রি করেছে'।[৯০] সে যাই হোক, বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের ছিল। গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থার এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষ ছিল শৃঙ্খলিত। কার্ল মার্কস বলেছেন, 'সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির প্রধান আকার হল একদিকে ভূমিসম্পত্তি আর তার সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস-শ্রম, আর অন্যদিকে দিন মজুরের শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্র পুঁজিওয়ালা ব্যক্তি মানুষের শ্রম নিয়ে'।[৯১] এটা স্মরণীয় যে, ভারতে শিলালিপি ও সাহিত্যে 'সামন্ততন্ত্র' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও তারা ইংল্যাণ্ডের সামন্তদের মতো নিজেদের কোনো সংগঠন বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; এটি মূলত একটা সাহিত্যিক প্রয়োগ মাত্র। অন্যদিকে মুদ্রাভিত্তিক আর্থিক জীবন ও গ্রামীণ অঞ্চলে বাণিজ্যের বিকাশের ফলে মুসলমান শাসনামলে জমির উপর কৃষকদের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ভেতর গুটিকয়েক ভূমি মালিক ছাড়া ব্যাপক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মজুরই থেকে যায়। এ সময় বাংলার সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এক ধরনের লগ্নিপুঁজির ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজে পেশাদার মহাজন শ্রেণীর জন্ম হয়।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলদের ক্রম পতনের কালে সামন্তবাদের পতন ঘটতে থাকে এবং সামন্ত শ্রেণী এলিটদের চক্রাকারে আবর্তন ঘটতে থাকায় যারা ব্যবসা ও অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করছিল তারাই ক্রমশ ধনী হয়ে উঠতে থাকে। সেটাকে সামজবিজ্ঞানী পেরেটোর ব্রাহ্মণদের স্থান মুসলমান উলামাদের দখল করার কথা বলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভারতের মুসলিম সমাজ মুখ্যতর ছিল শহরকেন্দ্রিক। এক আকবরের সময়েই কমপক্ষে ১২০টি বড় শহর ও ৩২টি ছোট শহর ছিল। ব্যবসা ও দাদনি কারবারের প্রসার ঘটতে থাকে। সেই থেকে গ্রামে-গঞ্জের কৃষকরা মহাজনের স্বার্থের কাছে বলি হতে থাকে। রুদ্রের ভাষায় :

আমাদের নির্মিত যন্ত্র শৃংখলিত করলো আমাদের
আমাদের নির্মিত নগর আবদ্ধ করলো আমাদের

আমাদের পুঁজি ও ক্ষমতা অবরুদ্ধ করলো আমাদের
আমাদের নভোযান উৎকেন্দ্রিক করলো আমাদের।[৯২]

কৃষকরা ফসলের গুচ্ছ গুচ্ছ আঁটি বুকে জাপটে ধরে, গোলাভরে প্রক্রিয়াজাত করে, ঘ্রাণ পায় কিন্তু সাধ মেটাতে পারেনা। সব যায় জোতদার ও মহাজনের পেটে। সূচনা পর্বে মহাজনদের প্রধান প্রতিনিধি ছিলো মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবারে; টাকার থলির জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও তারা নিয়ন্ত্রন করেছিলো। আলীবর্দী আর সিরাজদ্দৌলাকেও হাত পাততে হয়েছিলো জগৎ শেঠের কাছে। 'ইংরেজরা আসার পর মহাজনি ব্যবসার ভাগ্য খুলে যায়। নিজেদের স্বার্থে ইংরেজরা এদেশে পুঁজির যেটুকু বিকাশ ঘটিয়েছে সে পুঁজিও স্বাধীন ছিলনা, ছিল মুৎসুদ্দী পুঁজি। অশিল্পায়িত সমাজে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ফড়িয়া ও মহাজনি ব্যবসাই ছিল অধিক লাভজনক। এদের শোষণের পথ করে দেয় ধারাবাহিক প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ'।[৯৩] তাই মহাজনদের রক্তপায়ী জোঁক বলা হয়ে থাকে। বড় বড় শিল্প-কারখানার সাহায্যে পুঁজির লগ্নী এবং শ্রমিক শোষণ চলতে লাগলো বেপরোয়াভাবে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সেদিকে ইংগিত করেন "ইশতেহার" কবিতায় :

একটার পর একটা খাঁচা নির্মান করেছি আমরা।
আবার সে খাঁচা ভেঙে নোতুন খাঁচা বানিয়েছি–
খাঁচার পর খাঁচায় আটকা পড়তে পড়তে
খাঁচার আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে, টুকরো টুকরো হয়ে
আজ আমরা একা হয়ে গেছি।[৯৪]

আজো আমাদের খাঁচা ভাঙা শেষ হয়নি। বিচিত্র নামে-ধামে সামন্ত, মহাসামন্ত, রাজা-মহারাজা, মহাজন, তালুকদার, পত্তনিদার, হাওলাদার, জমিদার এবং এসবের পর এখন তহশীলদার। সেই আদিকাল থেকেই ক্ষমতাপ্রিয় আত্মপ্রসারে উচ্চবিলাসী লোকদের নিগড়ে আবদ্ধ আমরা। সেই সাথে মড়ক, মহামারি, কতো-শতো দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিরোশিমা-নাগাসাকি :

অনাহার কতো এসেছে করাল
বন্যায় ঝড়ে ভেসে গেছে কতো নীড়ের জোস্না,
কতোবার আশা ঢেকেছে করুন বেওয়ারিশ লাশে,
কতোবার প্রেম বারুদের বিষে হয়েছে কাতর
নির্মমতার নিচে একশত জ্বলন্ত নাগাশাকি।[৯৫]

অসংখ্য ঢেউ-এ বাংলার জীবন হয়েছে তছনছ, কালো মেঘ, মেঘের তাণ্ডব; 'তৃষ্ণার্ত লালায় ধুয়ে গেলো চন্দনতিলক এবং উপকূল ব্যাপি কাড়ায়-মাড়ায় হানায় ছিল দ্বিধাহীন, কখনো পশুরূপী মানুষ, কখনো প্রাকৃতিক :

অসতর্ক লাঙলের ফলা ছিন্নভিন্ন কোরে দিলো
চাষযোগ্য সবটুকু জমি, জমির গভীর।
নিশব্দ তাণ্ডবে তছনছ হলো ত্বক,
ফুলের পাপড়িগুলো ঝ'রে ঝ'রে পড়লো মাটিতে।
নিভৃত গর্জনে ফুলে উঠলো সমুদ্র যেন,
অবিরাম ঢেউ-এর ঝাপটায় টলোমলো উপকূল,
লুটিয়ে পড়লো পাড়, কোমল বসতি।[৯৬]

(৩)

একদিকে মহাজনদের অত্যাচার, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়– কৃষকদের নাজেহালের অবস্থা, তার উপর ইংরেজদের বিভিন্ন কালা কানুনের ফলে কৃষকদের অবস্থা আরো সঙ্গীন করে দিলো। ১৭৫৯ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) সালের অজন্মার ফলে দুর্ভিক্ষে এ দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক না খেয়ে মারা যায় কিন্তু কোম্পানি শাসক এই দুর্যোগের সময়ও আগের বছরের চেয়ে সোয়া দুই লাখ টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করেছে। বাধ্য হয়েই কৃষকরা মহাজনের কাছে শোষিত হয়েছে; মহাজনের ঋণের জোয়ালে বন্দী হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রনভার মহাজনের হাতে চলে যায়। আমাদের এ অঞ্চলে ১৮০২ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ৫৩ বছরে ১৩টি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, যাতে না খেয়ে লোক মারা গিয়েছিল ৫০ লাখ। ১৮৬০ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৬টি; লোক মরেছে ১ কোটি ২০ লাখ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে ৩৫ লাখ লোক এবং মহাজন ও চোরাকারবারীরা লাভ করেছে ১৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে মারা যায় প্রায় লক্ষাধিক লোক (সরকারি হিসেব মতে অবশ্য ২৭ হাজার), অন্যদিকে নেতা ফরিয়া ও চোরাকারবারীরা ফুঁলে ফেঁপে উঠেছেন; আর বাধ্য হয়ে কৃষকরা পানির দরে বিক্রি করেছেন নিজেদের জমি।[৯৭] রুদ্রের কবিতায় চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে :

পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে ছিড়ে নেয়া সেই ভূমি
দুর্ভিক্ষের খরায় সেখানে মন্বন্তর এলো।

হত্যায় আর সন্ত্রাসে আর দুঃশাসনের ঝড়ে
উঠে গেল সাধ বেওয়ারিশ লাশে, শাদা কাফনের ভিড়ে,
তীরের তরীকে ডুবালো নাবিক অচেতন ইচ্ছায়।[৯৮]

তারপর বন্যার তো কথাই নেই, প্রতি বছরে কৃষক-শ্রমিককে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে ঝড়-সাইক্লোন-টর্নেডো-বন্যা। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়েছে ৩৫টি, যার কারণে প্রাণহানি ঘটেছে ৬ লাখেরও বেশি মানুষের।[৯৯] তারপর সরকারের ত্রাণ, ঢাকঢোল, ভিডিও ক্যামেরার হুড়োহুড়ি, চুনোরি-পুটিরা হন ত্যালত্যালা। মৃত্যুর অপচয় রোধে ব্যর্থ-বিরক্ত রুদ্রের খেদ ঝড়ে পড়ে মহামারি-সন্ত্রাস-হত্যা কবলিত বাংলাদেশে মৃত্যু থামেনা :

খুনের দোহাই লাগে, দোহাই ধানের
দোহাই মেঘের আর বৃষ্টি জলের
দোহাই, গর্ভবতী নারীর দোহাই,
এ-মাটিতে মৃত্যুর অপচয় থামা।[১০০]

কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ সরকার বাহাদুরেরা নেননি যে তা নয়; অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেশ কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবে কৃষকের কাজে লাগে নি। ১৯১৮ সালের সুদী আইন, ১৯৩৪ সালের বঙ্গীয় মহাজনি আইন, ১৯৩৬ সালের বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন, ঋণ সালিসী বোর্ড, ১৯৩৯ সালে প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন, ১৯৪২ সালের চাষীখাতক আইন[১০১], সব পদক্ষেপই ব্যর্থ হয়েছে। অদ্যাবধি গ্রামের কৃষকেরা মহাজনের স্বার্থের নিগড়ে বন্দী, সম্প্রতি ব্যাংক ও এন.জি.ও'রা সে মহাজনের বিকল্প হয়েছেন মাত্র। সেই মান্ধাত্বকাল থেকেই গ্রামের সম্পদ যাচ্ছে শহরে, শহরের সম্পদ বিদেশে, গরিবের জমি ধনীদের জঠরে, ছোট দোকানীর পুঁজি বড় দোকানদারের কাছে, গরিব দিন দিন আরো গরিব হচ্ছে, ধনীর আরো বেশি সম্পদ বাড়ছে, বিভিন্ন সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে তারা সম্পদের প্রাচুর্যে আজ সমাজের শেঠ সেজেছেন। আর অন্যদিকে কম মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিকদের বলদের মতো খাটিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের কৃষক-শ্রমিক এখন মানুষ নয়, মানবেতর। কবিদের কবিতা লেখার সুন্দর অনুষঙ্গ হয়ে যান আমাদের হাড্ডিসার মানুষগুলো, কাস্তের মতো হাড়গুলো প্রচ্ছদ হয়, তাও কৃষক-শ্রমিকের দিন ফিরিয়ে আনে না :

ক. যে-পুরুষ এক শ্যামল নারীর সাথে জীবন বিনিময় করেছে।
যে-পুরুষ ক্ষুধা, মৃত্যু, আর বেদনার সাথে লড়ছে এখনো,
লড়ছে বৈষম্য আর শ্রেণীর বিরুদ্ধে—
সে আমি।[১০২]

খ. তবু এক নোতুন পৃথিবীর স্বপ্ন আমাকে কাতর করে
আমাকে তাড়ায়–
আমাদের কৃষকেরা
শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়।
আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।
আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকাল মৃত্যু আর
দীর্ঘ শ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।[১০৩]

গ. একটার পর একটা খাঁচা নির্মান করেছি আমরা।
আবার সেখাঁচা ভেঙে নোতুন খাঁচা বানিয়েছি–
খাঁচার পর খাঁচায় আটকা পড়তে পড়তে
খাঁচার আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে, টুকরো টুকরো হয়ে
আজ আমরা একা হয়ে গেছি।[১০৪]

বিগত তিনশো বছরেও এ দেশের মানুষের, কৃষক-শ্রমিকের বাঁচা-মরার ক্ষেত্রে উতর বিশেষ ঘটেনি। মানুষের ওপর নির্মম শোষণ পীড়নই যে মানুষ তথা দেশের দুর্গতি; শোষকরা বরাবরই তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখার জন্য খোদ মানুষকেই করে রেখেছে দেশের বড়ো শত্রু।

(৪)

বাঙালি প্রয়োজনের মুহূর্তে কখনো তেজহীন ছিলনা; ভারতের বিভিন্ন নরপ্রবাহের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী মানুষজন প্রিয় ভূমি থেকে উচ্ছেদের নব নব সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলের বিরুদ্ধে, তাদের দোসর জমিদার, মহাজন সুদখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটেছিল এই বাংলার প্রাচীন জনপদে। তবে সে যুগের সাহিত্য রাজসভার সাহিত্য হওয়ায় আমরা প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে এর বিবরণ পাইনা। 'সুভাষিতরত্ন কোষ' এবং 'বৃহন্নারদীয় পুরাণে' যা পাওয়া যায়, তা অতি সামান্য; ভোগপতিদের অত্যাচারে গ্রাম শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে, পলায়নরত কৃষকদের ভগ্ন জীর্ণ দেয়াল এবং দুর্ভিক্ষ ও করভারে পীড়িত গ্রামবাসীদের সমৃদ্ধতর অন্য

গ্রামে চলে যাওয়ার কথা এসেছে। শোষণের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে কৈবর্তজনেরা বিদ্রোহ করেছিল, যা সাধারণ ব্রাত্যজনের আত্ম সচেতনতা ও বিপ্লবী মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ঘটনাকে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মহিষারোহী সৈনিকগণ তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, যা বঞ্চিত কৃষকদের অধিকার আদায়ের তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। বারভূঁইয়াদের ক্রমাগত বিদ্রোহের কথা আমরা জানি, তেমনি ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গে সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, ভবানী পাঠক ও দেবী চোধুরানী পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ, দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফারায়যী আন্দোলন, তীতুমীরের বিদ্রোহ, নীলচাষী ও রায়ত বিদ্রোহ, অষ্টাদশ শতকে দেবিসিংহের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভিযান বাঙালিরা সংঘশক্তি ও বীরত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।[১০৫] সম্প্রতিকালের ময়মনসিংহে হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ, উত্তরবঙ্গে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং চারু মজুমদারের নকশালবাড়ী আন্দোলন বাঙালির বিপ্লবীবোধকে চারিয়ে তুলেছে। কৃষক-মজুর অধিকার বোধকে করেছে উজ্জীবিত, যার অনেক কীর্তি আজো আমাদের অজানা; তাই কবি লেখেন :

কত বিদ্রোহ কত শত গণ অভ্যুত্থান
ওহাবী ফরায়যী সিপাহী দামিন-ইকো
কত সহস্র মানুস কত সহস্র জনপদ
লেখেনি ইতিহাস তার নাম।[১০৬]

অসংখ্য বিক্ষোভ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বাংলার জনপদকে বার বার করেছে রক্তাক্ত। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সেই রক্তাক্ত করুণ ইতিহাসের; হারানো বাংলার বিপ্লবী বোধকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চান, স্মরণ করিয়ে দেন বাঙালির বীরত্ব গাঁথাকে, রক্তাক্ত ইতিহাসকে :

তোমার পিতার হত্যাকারী একজন আর্য
তোমার ভাইকে হত্যা করেছে একজন মোঘল
একনজ ইংরেজ তোমার সর্বস্ব লুট করেছে–
... ...
মনে করো তাম্রলিপ্তি থেকে নৌ-বহর ছাড়ছে তোমার,
মনে করো ঘরে ঘরে তাঁতকল, আর তার নির্মানের শব্দ
শুনতে শুনতে তুমি যাচ্ছো ভাটির এলাকা, মহুয়ার দেশে,
মনে করো পালাগানের আসর, মনে করো সেই শ্যামল রমনী

তোমার বুকের কাছে নত চোখ, থরো থরো রক্তিম অধর–
তুমি যাচ্ছো, দুই হাজার বছোর ধরে হেঁটে যাচ্ছো তুমি
তোমার ডাইনে রক্ত, তোমার বাদিকে রক্ত
তোমার পেছনে রক্ত, রক্ত আর পরাজয়–[১০৭]

এসব জয়-পরাজয় ঘটনা বাঙালির জাগ্রত সত্তাকে আবার একত্রিত করে ঔপনিবেশিক ইংরেজ কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে। রুশ বিপ্লবের ফলে বাঙালির শ্রেণী সংগ্রামের চেতনাকে করে উজ্জীবিত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষে হাজার হাজার নারী-পুরুষ অত্যাচার-নির্যাতিত ও কারাবরণের শিকার হলেন। ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮), বাঘা যতীন (১৮৮০-১৯১৫), প্রীতিলতা (১৯১১-৩২), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২), সূর্যসেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে। নজরুলের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো ভারতের স্বাধীনতার দাবি। আপোষহীন বিদ্রোহী মনোভাব বাঙালির রক্তকে আবার সচকিত করেছে নজরুলের কবিতা। ক্ষুদিরামের প্রতি, বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের অকুণ্ঠ ভালোবাসা এ যুগের বাঙালি কবিদের আজো প্রেরণার সম্বল। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহও সেই চেতনায় বিপ্লববোধকে দ্রোহী রূপ দিতে চান। ক্ষুদিরামের ফাঁসি থেকে বিপ্লবের উত্তুঙ্গ প্রেক্ষাপট তৈরী করেন :

ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমাদের যাত্রার শুরু।
এক একটি জন্মের সমান মেধাবী মৃত্যু
এক একটি প্রতিজ্ঞা-পুষ্ট মৃত্যুর সোপান
দুর্যোগ-অন্ধকারে তুলে রাখে সূর্যময় হাত–
তুমুল তিমিরে তবু শুরু হয় আমাদের সঠিক সংগ্রাম।
মৃত্যুর মঞ্চ থেকে
মৃত্যুর ভূমি থেকে
আমাদের প্রথম উত্থান।[১০৮]

একটা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে রুদ্র বাংলার রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণে এনে সাধারণকে আগামীর বিপ্লবের প্রেরণা বোধ জাগাতে চান; বিরোধপূর্ণ বাংলার বিক্ষুব্ধ প্রেক্ষাপট সেজন্য তাঁর কবিতায় বার বার এসেছে, এর দ্বারা তিনি সংঘবদ্ধ শ্রেণীবোধ জাগ্রত করতে চান; নতুন সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার জন্যই তিনি আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রশংসা করেন এবং চলমান সমাজের ক্লেদগুলো উপস্থাপন করে শ্রেণীচেতনা উজ্জীবিত করেন। যেখানেই বাংলার রক্তাক্ত প্রান্তরের বর্ণনা এসেছে, সেখানেই তিনি সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো আবেদন জানান। কেননা, সমাজ-ইতিহাসে কার্ল-মার্কসও এমন

ব্যাখ্যা দিয়েছেন– "সমাজের মধ্যে আর্থিক বিরোধ থাকার জন্যেই শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার অবসান আসে এবং নতুন আর্থিক বন্দোবস্তর উপর নতুন সমাজ গড়ে ওঠে।[১০৯] মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, "শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সমস্ত ইতিহাস আসলে শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী।"[১১০] রুদ্রও সেজন্য অতীত বাংলার পুরনো আর্থিক ব্যবস্থার উল্লেখের মাধ্যমে সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজের কথাই বলতে চান, বর্তমানের গ্লানিযুক্ত-পঙ্কিল সমাজের অবসানের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমীকের মুক্তি দান :

কোটি কোটি বুক এক বুকে আছে মিশে,
অস্থিতে মাখা তিতুমীর আর সূর্যসেনের লোহ,
অশোকের ঘন ছায়ার মতোন মায়ের প্রেরনা বুকে
কারে তোর এতো ডর?
কার ডরে তোর পাথর কঠিন সিনা হয়ে আছে নত?
গেরামের পর গেরাম উঠেছে জেগে
শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল,
খুনীর অঙ্গনে বাজে প্রতিশোধ মত্ত মাদল
জাগে সমতার পূর্ব লড়াই, পূর্বাভাসের বাঁশি।[১১১]

এ দীপ্ত চেতনায় রুদ্র বিক্ষুব্ধ-রক্তাক্ত বাংলার ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেন; বার বার বাংলার এই জনপদে কৃষকরা কিভাবে বুকের ঘামে শোককে কিনে নিচ্ছে। যেমন, "গহিন গাঙের জল" কবিতায় :

জ্বলে উঠে তাজা বারুদ-বহ্নি দরিয়ার সম্ভোগ–
উপদ্রুত এ-উপকূলে তবু জীবনের বাঁশি বাজে।
তেজি কজায় জমি চ'ষে আমি ঘরে তুলে নিই ব্যথা,
ঘরে তুলে নিই হাহাকারে ভরা অনাহারী দিনমান।
যে-ফসল ক্ষেতে করেছি লালন কষ্টে, রক্তে, ঘামে
আমার অঙনে সে ধান ওঠেনা
ওঠে শষ্যের ঋন।
বুকের রক্ত কষ্টের দামে আমি কিনে নিই শোক
আমি কিনে নিই ক্ষুধার্ত দেশ নিরন্ন লোকালয়।
... ...
চরের মাটিতে স্বজনের হাড়ে

দূরের বাতাসে কাঁদে

জনপদে জ্বলে শোকের মলিন চিতা।[১১২]

এরপর পরই রুদ্র "বৈশাখি ছেনাল রোদ" কবিতায় এই অবক্ষয়ের এবং বেদনার ভারবাহী বোঝা ঝেড়ে ফেলেন তেজোদীপ্ত আগুনের পরশে মাটির সংলগ্নতায় সিক্ত হয়ে যান :

বৈশাখি ছেনাল খরা হিয়াখানি পোড়ালি আমার–

আমারে বানালি বিধি বিষাদের খেয়া,

তবু যদি সত্যি হয় এই জন্ম নেয়া

তাহলে জীবন ঘ'ষে পুনর্বার জ্বালাবো আগুন,

পুনর্বার প্রেম ছোঁবো, ছোঁবো স্বপ্ন মাটির পাঁজর।[১১৩]

প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে যে শ্রেণীভেদ এবং এর ফলে সৃষ্ট শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণীর এই রূপান্তরের যে ইতিহাস, মার্কসের সেই তাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ রুদ্রের অতীত বাংলার রূপকে স্পর্শ করতে চায়, সমাজ জীবনের এই সার্বক্ষণিক লড়াই– প্রতিবার শেষ হয়েছে সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে। কখনো তা সমাজকে ভেঙেছে অথবা কখনো সমাজকে নতুনভাবে গড়েছে। চিরকালই এই শ্রেণী দ্বন্দ্বে দেখা যায় বিত্তবানরা চাচ্ছেন বিত্তহীনদের শোষণ করতে, আর বিত্তহীনরা চাচ্ছে বিত্তবানদের উৎখাত করতে; এভাবে দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলো সমাজে ধ্বংসকে ডেকে আনে। রুদ্রের "হারানো আঙুল" কবিতায় বাংলার জীর্ণ-বিদীর্ণ অবক্ষয়ের চিত্র আছে, এক কালের বিখ্যাত মসলিন তাঁতের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদে ওঠে এবং এই ধ্বংসস্তুপের মধ্রেই কবি দেখতে পান শ্রমের বিজয়ী সঙ্গীত। শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ পায় এবং এতে দ্রোহী ও সংগ্রামশীলতায় একদিন কাঙ্খিত স্বর্ণগ্রামে ফিরে যান, মাটির মমতা ঝরে পড়ে চরণে চরণে :

হারানা উত্তাপ আমি খুঁজতে খুঁজতে কেন ওই জীবনের হাড়

লতা গুল্ম, ভাঙা ইট, কেন ওই দেয়ালের পাথর সরাই!

কেন শুধু মসলিন মসলিন বোলে কেঁদে উঠি বুকের ভেতরে?

ভাঙা- ইট, ওই হাড়-ওতো শুধু বেদনার ব্যর্থ অবশেষ

আমি তবু সেই ধুলো খুঁড়ে খুঁড়ে শুঁকে দেখি ভেতরের মাটি।

কেন দেখি? কেন ওই শিল্পীর কাটা-আঙুল খুঁজে পেতে চাই?

পেতে চাই তাঁতের হৃদয় থেকে বেজে-ওঠা শ্রমের সঙ্গিত

ঘরে ঘরে রেশমের গন্ধমাখা আশ্বাসের মসৃন বাতাস।

... ...

হারানো শিল্পের কাছে
হারানো প্রানের কাছে প্রয়োজনে নতজানু হবো,
হারানো শিল্পীর কাছে পুনরায় নতজানু হবো।
এই ধুলো, ক্লান্তি, ভুল, জীর্নদুঃখগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফিরে যাবো স্বর্নগ্রামে ॥[১১৪]

"মানুষের মানচিত্র" ১নং কবিতার মধ্যেই শর্তহীন একখণ্ড হৃদয়ের কর্ষিত ভূমির জন্য, হারানো ঐতিহ্যকে ফিরে পাবার আকুতি ঝরে পড়ে, যে জমির আজ কতো-শতো আলে'র মতো বৈষম্য সমাজ দেহে বিষ ফোড়ার সৃষ্টি করেছে। যা শোষণ ভিত্তিক সমাজকে প্রতিনিয়ত ধোকা ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ করছে। সভ্যতার অন্তঃসার শূন্য সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য রুদ্রকে সারাক্ষণ পীড়া দেয় :

কবে পাবো? কবে পাবো আল্‌হীন একখণ্ড মানব-জমিন?
পরবাস থাকবেনা, থাকবেনা দূরত্বের এই রীতি-নীতি।
মহুয়ার মদ খেয়ে মত্ত হয়ে থাকা সেই পার্বনের তিথি
কবে পাবো? কবে পাবো শর্তহীন আবাদের নির্বিরোধ দিন ॥[১১৫]

কিন্তু বনেদি শাসন ব্যবস্থা আমাদের সব আশা-আকাঙ্খাগুলো বার বার ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, আমাদের নওলা জমিনে মৃত আর পচা লাশের আবাদ করে :

বড়ো চেনা ওই স্বর, ওই কণ্ঠ 'চুপ চুপ' বনেদি শাসন–
ওই খানে পোড়ে প্রেম, হাড় মাংশ, ওইখানে হাবিয়া দোজখ,
জীবন-গাছের গোড়া ওই হাত কাটে, ওই সর্বনাশা চোখ,
যেদিকে ফেরায় পোড়ে ঘরদোর, ভিটেমাটি, ভাতের বাসন।[১১৬]

রুদ্র দেখতে পান, ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন প্রভুসুলভ মনোভাবের তস্কর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার নাগপাশে এ দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতির কর্মকাণ্ড বন্দী হয়ে আছে; দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু বেনিয়া ভূত এখনো চেপে আছে জাতির ঘাড়ে; এখন শ্রেণীহীন-শোষণহীন দেশ গড়ার জন্য এই প্রশাসনকে ভেঙে সাজাতে হবে, এখানে আনতে হবে মেধা এবং শ্রমের দৃপ্ত আনন্দ মেলা, গৌরবের মাধ্যমে এই কথাগুলো বলতে চান :

বেনিয়া বৃটিশ আর পাক লুটেরার প্রশাসন
টুকরো টুকরো কোরে ভেঙে দিতে হবে। গ্রাম জুড়ে
সামন্ত-সমাজ রীতি জগদ্দল পাথরের মতো

হাজার বছর ধরে চেপে আছে মানুষের ঘাড়ে,
দিতে হবে আজ তারো শিকড়ের মূলগুলো কেটে।
কেরানি পয়দা আর আমলা নাজেল করা এই
উপনিবেশিক প্রতারক শিক্ষানীতি, দিতে হবে
বিমূলে উৎখাত কোরে এইসব ভাওতা ভনিতা।
যোগ্যতার মানদণ্ড হবে শুধু মেধা আর শ্রম–[১১৭]

গৌরবময় সংগ্রামী আন্দোলন ও নেতৃত্বের দ্বারা রুদ্র আবার শাণিত করেন সমতার লড়াইকে, এবার সরাসরি রণক্ষেত্রে যুদ্ধাস্ত্রসহ আগমন যাত্রা :

আমরা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে এসেছি
আমরা সিপাহী আন্দোলনের দুর্গ থেকে এসেছি
আমরা তেভাগার কৃষক, নাচোলের যোদ্ধা
আমরা চটকলের শ্রমিক, আমরা সূর্যসেনের ভাই
আমরা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে এসেছি
কাঁধে স্টেন, কোমরে কার্তুজ, হাতে উন্মত্ত গ্রেনেড-
আমরা এসেছি।[১১৮]

(৫)

রুদ্র একজন সাম্যবাদী কবি এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের যোগ্য প্রতিনিধি তিনি। সমাজে যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত, তাদের স্বার্থ সেই আদিকাল থেকেই শাসক শ্রেণী ক্ষুণ্ন করে আসছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ শ্রমের কোনো মূল্য দেয়নি; পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এই শ্রমজীবী মানুষকে বরাবরই বঞ্চিত ও শোষণ করেছে। রুদ্র দেখলেন, সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার নিগূঢ় তাৎপর্যই হচ্ছে কর্মই সকল শক্তি এবং গুণের আঁধার; কোন আধ্যাত্ম শক্তির উৎকর্ষতায় সমাজদেহে উৎপাদন শক্তির নিয়ামকদের মুক্তি সম্ভব নয়; যারা উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী– তাদের শ্রমের ও কর্মের মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে; কর্মের ও ঘর্মের সিক্ততায় উৎপাদক শ্রেণী সমাজের নেতৃত্বশীল আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জীবিকার্জনের অপরিহার্যতায় সমাজে সকল মানুষ শ্রমশীল হতে পারলেই শ্রেণীহীন সমাজ গঠন সম্ভব হবে। বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের মধ্যে পৌনে বারো কোটি মানুষকেই উদয়াস্ত হাড় ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়, তারপরও এই মানুষগুলো প্রতিনিয়ত সমূহ নিগড়ে আবদ্ধ প্রবঞ্চনার শিকার। মুষ্টিমেয়ের আওতায় বাঙালি কলুর বলদের মতো খেটেই

চলেছে; আমাদের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এদিক দিয়ে পশুই বটে; কেননা পশু সারাক্ষণ খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে, পরিশ্রম করে; বাঙালিও তা-ই। দরিদ্র বাঙালি পেটের জন্য জীবনধারণ করে, সেজন্য সে পশু। আর আমাদের মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরা তারাও পাশবিক স্বভাব সম্পন্ন। নির্দয়তা, নৃশংসয়তা, অবিবেচনা, খুনী, বর্বর, পাষণ্ড– এ সবই তো পশুর স্বভাব; বাঙালিই শুধু নয়, আজকের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সভ্যতা দাঙা এবং যুদ্ধের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিকল্পিতভাবে যা করছে, পশুরাও তা করে না; তাদের পশুত্বের মধ্যে কোনো মানবিকতার লেশমাত্রও নেই। তারাই ইতিহাসের বীর হিসেবে আখ্যা পায়। সেই পৌরাণিক যুগের পরশুরাম-রাবণ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের চেঙ্গিসখান, তৈমুর লঙ, আলেকজাণ্ডার এবং পরে নেপোলিয়ন, হিটলার, হিরোহিতো, আইজেন হাওয়ার এবং আরো পরে ইয়াহিয়া গং যা করলেন, তা কোন্ শক্তির পরিচায়ক? যে যতো বেশি নরহন্তারূপ পাশবিক হয়েছে, সেই ততো বড়ো দিগ্বিজয়ী বীর। বাংলাদেশেও স্বল্প সংখ্যক বিত্তবানের পশু স্বভাব গোটা দেশের মানুষকে করে রেখেছে পশু অস্তিত্বের কাছাকাছি। সমস্ত মানবিক গুণগুলো আজকের সমাজ ব্যবস্থায় অবসিত; দয়া, মায়া, করুনা, সহানুভূতি, দরদ, সহনশীলতা আজকের সমাজে অনুপস্থিত। শুধু শ্রমই নয়, এ সমাজে মানুষই মূল্যহীন জীবে পরিণত হয়ে আছে। দেয়ালের মতো পশুশক্তি মানুষকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে; রুদ্রের সিংহভাগ কবিতা এই দেয়াল ভাঙার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল, দেখছোনা পথ বন্ধ।
এখন তোমাকে ফিরতেই হবে
ফনা তোলা সাপটির দিকে,
মুখোমুখি
দাঁড়াতেই হবে– ঠাণ্ডানল, বন্দুকের
সামনে দেয়াল।
ভয় পাচ্ছো শিক্ষাহীন আঙুলের কথা ভেবে?
শৃঙ্খলাবিহীন তোমার হাত-পা, কৌশলসমূহ,
কিন্তু সংখ্যায় অসংখ্য
এবং নিরুপায়–
এখন জলোচ্ছাসের মতো শুধু স্থলভাগে
ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক মুহূর্তটি চেনা দরকার।[১১৯]

খ. দক্ষিন সমুদ্রের মতো আজ আমাকে প্লাবন হতে দাও,
হতে দাও অপ্রতিরোধ্য বিপুল টাইফুন।
এখন আমাকে মুখোমুখি হতে দাও চিহ্নিত শত্রুর,
হাতে তুলে নিতে দাও সম্মিলিত মানুষের বিক্ষুব্ধ হৃদয়,
আর তার সঠিক প্রতীক– আগ্নেয়াস্ত্র।
বুলেটের বিরুদ্ধে আমাকে আজ
হাতে তুলে নিতে দাও আগুন ও বারুদের ভাষা।[১২০]

গ. গুটাও কৃত্রিমতার ফানুস, নীল কারুকাজ
পুড়িয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও ॥[১২১]

ঘ. মানুষ সচেতন হও, ২ মুখোশ হটাও, ভাঙো শ্রেনীভেদ
দেশের মাংশে পচন তারে করতে হবে ছেদ।
বাজাও খোল করতাল, ২ আর কতোকাল মুখোশ প'রে রবে,
বুকের স্বপ্ন বাজাও এবার জাগরনের রবে।[১২২]

ঙ. কেতাব কোরান যদি সত্য হয় তয় কেন এমন আজাব?
দশজনে পোড়ে আর একজন খোয়াবের বেহেস্ত বানায়,
এই যদি বিচার বিধান তয় মানিনা- ভুখা দুনিয়ায়
জুলুম চালায় যারা কেড়ে নেবো তাগো সব সুখের খোয়াব ॥[১২৩]

বিশেষ করে আশির দশকের স্বৈরশাসনকালে বাংলাদেশের পৌনে বারো কোটি মানুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের উৎপাদন সোয়া কোটি কৌশলিরা কুক্ষিগত করেছে। এ দেশের কৃষকরা আজকে দ্রুতগতিতে যেভাবে নিজেদের একমাত্র মাথা গোজার ঠাঁই জমিটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে হতে দিন ও ক্ষেতমজুরে অথবা বেকার এবং অর্ধবেকারে পরিণত হচ্ছে তার মূল কারণ হলো আমাদের দেশের এই স্বল্প পুঁজিপতিদের অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা। কৃষি ও শিল্প কোনো ক্ষেত্রেই অসহায় মানুষের আজ কর্মসংস্থান নেই। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক শ্রমিক থাকায় সুবিধাবাদীরা স্বল্প লগ্নিতে তাদের শ্রম কিনে নেয় এবং শোষণ করে এ দেশের সিংহভাগ মানুষকে। এই বৈষম্যের প্রাচীরের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ হিংসায় উন্মত্ত; শাসক শ্রেণী ও বিত্তশালীরা দুর্বল শ্রমিককে দলনে-দমনে, শোষণ-পীড়নে দিন দিন অআরো উৎসাহী-আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাদের দৌরাত্ম্য এবং দাম্ভিকতা বিষবাষ্প দেখে কবি শামসুর রাহমান মর্মাহত : 'শ্বাপদের চেয়ে শতগুণ বেশি/ এখন হিংস্র যারা,/ মানুষের তাজা কলজে চিবিয়ে/

খেতে চায় আজ তারা'।[১২৪] এমন কঠিন সময়ে দেশের শাসন ক্ষমতাকে সম্বল করে আমাদের ক্ষমতা লোলুপ চামচারা আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন; বন্যা-মহামারি-দারিদ্র্য বিমোচনের নামে বিদেশী খয়রাতিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা গড়ে ওঠে; সামরিক সরকারের মদদ পুষ্ট এসব ভণ্ড প্রতারকদের বিরুদ্ধে রুদ্রের সংগ্রাম– 'ছেনাল সময় উরুত দ্যাখায়ে নাচে/ ন-পুংসকেরা খুশিতে আত্মহারা।/ বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে/ রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ'।[১২৫]

বাংলাদেশে বিত্তশালীরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছেন বেশ কয়েকবার। বিভিন্ন দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণের জন্য এদেশের গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক লোক সবসময় তৈরি হয়েই থাকে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বিরাট আকারে অসৎ বিত্তশালীদের জঠরে বাংলার গরীব কৃষকের জমি-জমা, আসবাবপত্র নামমূল্যে হজম হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর দেশত্যাগী হিন্দুদের বাড়িঘর ও জায়গা জমি দখল করে একশ্রেণীর মতলববাজ লোকের সৌভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়, রাতারাতি তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সালেল দাঙ্গার সময়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আবার ১৯৭১ সালের পর অবাঙালিদের সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষ অসহায়ত্বের শিকারে নিজেদের জমি স্বল্পমূল্যে হয় বিক্রি করেছে, নয় বন্ধক রেখেছে; ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায়ও ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ত্রাণের লোক চলে যায়, গ্রামে গ্রামে চলে লুটতরাজ, জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়; কৃষকের মটির ঘর ভেঙে গেছে, গবাদি পশু-পাখি সব মরে গেছে, পুকুরের মাছ নেই, বীজ ধান নেই, ভয়াল বন্যায় আসবাবপত্র ও পরিধান বস্ত্র ভেসে গেছে, বিত্তশালী ও ব্যাংকাররা উচ্চমূল্যে সুদের ধার দেবে, জমি কিনে নেবে– জমি লোলুপরা; কম বেশি প্রতিবছরই তো এমনসব ঘটনা ঘটেই চলেছে, যে গ্রামীণ উৎপাদনে দেশ উন্নতির মুখ দেখবে, সেই গ্রামই আজ অবহেলিত, সাধারণ মানুষ শোষিত। সেই পুরাকালের রাজপুত্তুররা আজো সোনার রথে চড়ে এবং হাওয়াই পথে উড়ে, আর এদেশের গরীব চাষা ও মজুরেরা নরকের উত্তাপ পেতে থাকে। রুদ্রের মতো শ্রেণীচেতন কবিরা তখন ভুখা-নাঙ্গাদের হয়ে রাস্তায় নামে, প্রতিবাদ জানায় কলমের ভাষায়; ষোল আনা আর্ত-মানুষের পক্ষ অবলম্বন করেন– 'তোমার র'লো সুখী মানুষ, আমার র'লো আর্ত।'[১২৬] যারা বোবার মতো চেয়ে দেখে, সময়ের দাবীকে করে অগ্রাহ্য, যারা প্রতিবাদে-প্রতিরোধের চিন্তা করেনা, নিথর-নিস্তব্ধ থাকে জাতীয় ক্রান্তিকালে; তাদের প্রতি রুদ্রের ঘৃণা ঝড়ে পড়ে, ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে চান তিনি, কিন্তু বিধির বিধানে বিশ্বাসী মানুষগুলো সবকিছু মেনে নেওয়াতেই অভ্যাস্ত, রুদ্র এ মানসিকতাবোধ ভাঙতে চান।

সমাজ জীবনে চেপে বসা বৈষম্যগুলো রুদ্র তাড়াতে চান, দূর করতে চান সামাজিক জঞ্জাল। গ্রামের এখন হা-ভাতে অবস্থা, মজুর-কৃষকের ঘরে লণ্ঠনও জ্বলেনা, রোগ-ব্যাধির প্রকোপে মানব সন্তানের চোয়ালগুলো হা-

করে আছে; সামরিক শকুনি শাসন ব্যবস্থায় তাদের ত্রাহি অবস্থা। তখনো নগরে নগরে গড়ে উঠছে হেলিপ্যাড, গড়ে ওঠছে আমদানীকারক ইনডেনটিং ফার্ম। বিদেশী দুধ, কাপড়, গাড়ি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার নিয়ে এদেশের রাজারগুলোর রমরমা অবস্থা। সবই বৈদেশিক ঋণের টাকা পণ্য সাহায্যের ফাঁক দিয়ে দেশের বাজারে পৌঁছে গেছে; দাতাদেশগুলো এ গরীব দেশে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত, দেশীয় তাঁত বস্ত্র– ছিঁকায় উঠেছে। "সকালের গল্প" কবিতায় রুদ্র এদিকেই ইংগিত দিতে চান :

বুনো মাকড়শা মেলেছে সূক্ষ্ম জাল,
খাদ্যের খোঁজে ধাবমান নীল মাছি
বেঁধে আছে জালে নিজেই খাদ্য হয়ে
কালো মাকড়শা ফেলেছে জটিল জাল।
... ...
তুমি জানো এই নগরের উৎসব
কেড়ে নিয়ে গেছে তোমার অনেক সাধ,
তোমার অনেক অবশ্য প্রয়োজন।
তুমি জানো তুমি অর্থনীতিতে বাঁধা।[১২৭]

অথচ রুদ্র তাঁর প্রিয়তম বাংলাদেশকে স্বদেশের মৃত্তিকা-সংলগ্ন সংস্কৃতির বন্ধনে বাঁধতে চান, হারানো মসলিন স্মৃতিগুলো, মৃৎশিল্পগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে চান, মাটির গভীর থেকে সুচতুর চাষাবাদে ফসলের হাসি চান পুরো গ্রাম জুড়ে; নবান্নের আনন্দ উৎসবে মুখর হবে বাংলার আনাচে-কানাচে, নদীগুলো আবার কল্লোলিত হবে। "শাড়ি কাপড়ের গল্প" কবিতায় রুদ্র এ কথাই বলতে চান; কবিতার শেষাংশ এমন :

শাড়িতে তোমাকে মানায় সবচে বেশি
এবং তা যদি স্বদেশের তাঁত হয়।
মসলিন-স্মৃতি যে সব আঙুলে মাখা,
তারাই সাজাবে তোমার শরীরখানি ॥[১২৮]

কৃষি সম্ভার আর প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় বাংলাদেশ পরিণত হবে 'শস্যেস্বপ্নে শ্রমবান শ্যামলিমা'।[১২৯] গোটা বাংলাদেশ প্রাণ উদ্ভাসনে ভরে যাবে, 'শরীরে জড়িয়ে মসৃন মিহি তাঁত,/ গ্রামের সকল মেয়েরা এসেছে মাঠে–/ বাতাসে ঝাঁঝালো নোতুন ধানের ঘ্রান'।[১৩০] আর সেই সাথে আদিম উল্লাস– 'দেহে উদ্দাম বুনো জোয়ারের ঢেউ/ অবসাদহীন সতেজ ওষ্ঠপুট'।[১৩১] কিন্তু বাস্তবের হলাহলে কবির সেই আশা অবসিত হয়, পদে পদে

মৃত্যু-মহামারি, শোক-তাপে দগ্ধ মরুভূমির উষ্ণনিঃশ্বাস; হাহাকার-দৈনতা, যান্ত্রিক বীভৎসা, তাই খেদ ঝরে পড়ে :

এই সামাজিক নিষ্ফলা প্রান্তরে
ফলবান তরু জন্মোনা কতোকাল,
জন্মোনা ছায়া সুনিবিড় মহীরুহ।
চারিদিকে শুধু পাতা বাহারের সাড়া–
চারিদিকে শীত রেখে গেছে শীর্নতা,
হলুদে মোড়ানো হরিৎ বধ্যভূমি।
শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে অচর্চায়,
ইচ্ছারা ঢাকা কালো-কুয়াশার জালে।[১৩২]

একদিকে নগর আর বিত্ত, অন্যদিকে গ্রাম আর দারিদ্র্য, একদিকে যান্ত্রিকতা, অন্যদিকে প্রকৃতির শ্যামলিমা, একদিকে দাম্ভিকতা শকুন শ্রেণী, অন্যদিকে অবহেলিত কৃষক-শ্রমিক; একদিকে বাণিজ্যের পসরা, অন্যদিকে নৈরাজ্যের হাহাকার– রুদ্রকে ক্ষত-বিক্ষত করে সারাক্ষণ ঃ 'দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাই–/ কিছুতেই মেলাতে পারিনা এই দ্বিমুখি জীবন/ চাঁদ আর পূর্নিমাকে কোনো দিন মেলাতে পারিনা ॥'[১৩৩] এদেশের স্বৈরশাসনের জালে আবদ্ধ হয়ে কবি দীর্ণ হতে থাকেন, ক্ষোভ-দ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে আক্ষেপের সুরে :

সমাজ পরিচালনার নামে তারা এক ভয়ংকর
কারাগার তৈরী করেছে আমাদের চারপাশে।
তারা ক্ষুধা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা বস্ত্রহীনতা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা গৃহহীনতা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা জুলুম দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
বুলেট দিয়ে বন্দি করেছে।
তারা সবচে' কম শ্রম দেয়
আর সবচে' ভালো খাদ্যগুলো খায়
আর সবচে' দামি পোষাকগুলো পরে।
... ...
তাদের ঈর্ষা কুটিলতাময়।

তাদের হিংসা পর্বত প্রমান।

তাদের নির্মমতা ক্ষমাহীন।

তাদের জুলুম অশ্রুতপূর্ব।[১৩৪]

(৬)

রুদ্রের কবিতায় সাধারণ নিম্নবিত্ত ও কৃষকশ্রেণীর সার্থরক্ষা এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমের মর্যাদার জন্য সাম্যবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বার বার ব্যক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, আশির দশকে বাংলাদেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক উল্লম্ফনে অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশী ঋণের বোঝা, মিল কারখানায় উৎপাদন ঘাটতি, ব্যাপক দুর্নীতি, অপচয়; আর ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারী পেটুয়া বাহিনীর স্বেচ্ছাচারে খুন-রাহাজানি, গণআন্দোলনে বাঁধা প্রদান এবং নির্যাতন– সব মিলিয়ে রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশ গোটা দেশকে কলুষিত করে তুলেছে এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ সারাক্ষণ নিরাপত্তাহীনতায় চরম ভোগান্তির শিকার হয়। এ পরিস্থিতিতে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ সাম্য সমাজের প্রতি শুধু আকৃষ্টই হননি; সাম্য আন্দোলনে গোটা দেশবাসীকে শরিক হবার আহ্বান জানালেন, সমকালীন সমাজ-রাজনীতি আকরধারণ করলো তাঁর কবিতা; কবিতার মাধ্যমেই তিনি চাইলেন সময়ের দাবিকে মেটাতে এবং একজন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মী হিসেবে প্রতিটি গণআন্দোলনে রুদ্র গৌরবজনক ভূমিকা রাখলেন। আর প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে, চলমান ঘটনা-প্রবাহকে রুদ্র সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চাইলেন। বিষ্ণুদে কিংবা নির্মলেন্দু গুণের মতো তিনি মার্কসীয় সাম্যবাদের ব্যাখ্যা কবিতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ না করে সমাজ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সাম্য সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে চাইলেন। এজন্য তিনি কৌম-সমাজ থেকে আজকের এই অরাজক বাংলাদেশের সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে টেনে এনে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার আদায় ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত আন্দোলনের পক্ষপাতি। সেই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজে থাকবেনা শ্রেণী ভেদাভেদ, অহিংস পৃথিবীতে থাকবেনা হানাহানি; এমনই একটি সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলেন রুদ্র :

হাত ধরো, হাত ধরো– আমি তোমাদের আরাধ্য ভুবনে

এতে দেবো ব্যতিক্রম অভিধান,

তোমাদের তমসা-সকালে আমি পৌঁছে দেবো

সমস্যাহীন এক সূর্যময় রোদ্দুর

... ...

হাত ধরো, হাত ধরো–
আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তে
এনে দেবো তৃতীয় পৃথিবীর শ্রেনীহীন কবিতার ভুবন।[১৩৫]

সমস্ত ক্লেদ-গ্লানি, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাই কবি আর্ত-মানুষদের আহ্বান জানান, তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য; কেননা, সমস্ত হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এখনই উপযুক্ত সময় গণআন্দোলনের, প্রতিরোধ ও বিক্ষোভের :

প্রয়োজন এসেছে আজ জ্বলে ওঠো আর্ত মানুষ
জ্ব'লে ওঠো বৃক্ষ, গ্রাম, জনপদ, শ্রমিক শহর
অবরুদ্ধ লোকালয়।
হত্যা আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ব্যথিত জীবন,[১৩৬]

সমতার আন্দোলনে যত কষ্ট আর যতো রক্তই লাগুক না কেন, বেওয়ারিস লাশ আর সাদা কাফনের যতোই ভীড় হোক না কেন; এ জনপদ আর বৈষম্য চায় না, এ জনপদ মৃত্যুর বিভীষিকা অনেক দেখেছে, এবার মৃত্যুর অপচয় থামাবে আর্ত মানুষ; নগরের রুখো গ্রাস থেকে কেড়ে নেবে এ মানুষেরা, তাদের প্রকৃতিনির্ভর গ্রামখানি, সেখানে রূপশালি ধান আর শত সরল ফুল ফুটবে এবার; তাই কবির কামনা :

জাতির রক্তে ফের অনাবিল মমতা আসুক
জাতির রক্তে ফের সুকঠোর সততা আসুক
আসুক জাতির প্রানে সমতার সঠিক বাসনা ॥[১৩৭]

রুদ্রের আত্মবিশ্বাস একদিন সাম্যবাদী সমাজ এদেশে গড়ে উঠবে, আর তখন 'আর্ত মানুষ কেড়ে নেবে তাদের অধিকার'[১৩৮]গুলো এবং স্বার্থবাদীরা সেদিন আর নিস্কৃতি পাবেনা। যাদের লাশ আর বুকের রক্ত নিয়ে তারা রাজনীতির রমরমা ব্যবসা করছে; মিছিল-মিটিং হাততালিতে মুখরিত করছে জনসভা; তাদের নির্মূল করে রুদ্র আবার আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে চান :

একদা অরন্যে
যেভাবে অতিকায় বন্যপ্রানী হত্যা কোরে
আমরা অরন্যজীবনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি,
আজ এইসব অতিকায় কদাকার বন্যমানুষগুলো

নির্মূল কোরে
আমরা আবার সমতার পৃথিবী বানাবো।
সম্পদ আর আনন্দের পৃথিবী বানাবো।
শ্রম আর প্রশান্তির পৃথিবী বানাবো।[১৩৯]

সমতার আন্দোলনে রুদ্র প্রয়োজনে আর্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র বিপ্লবী হতেও রাজি আছেন, তার বিনিময়ে ক্ষুধার্ত জীবনের অবসান চান, শ্রেণীভেদ এবং জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে হন মুষ্টিবদ্ধ; অনার্যের উষ্ণ লহু আজ সংঘশক্তিতে বলীয়ান এবং বীর্যবান শ্যামল শরীর শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপিয়ে দেবে গোটা বিশ্ব; সমস্ত বিপ্লবী চেতনা সংগঠিত করতে চান তাঁর সম্মিলিত ঐক্যবোধে– তিতুমীর, সূর্যসেন, সিপাহী বিপ্লব, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ঘটনায় তেজোদীপ্ত বীজ ধারণ করে কবি এগিয়ে যেতে চান সাম্যবাদী সমাজের আন্দোলনে, এর জন্য রুদ্র সশস্ত্র বিপ্লবেও বিশ্বাসী। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. আমরা এগিয়ে যাই শ্রেণীহীন পৃথিবীর দিকে,
চলো, যে-হাত শ্রমের হাত, যে-হাত শিল্পের হাত,
যে-হাত সেবার হাত, সে-হাত সশস্ত্র করি, চলো,
আমরা সশস্ত্র হোই সমতার পবিত্র বিশ্বাসে।[১৪০]

খ. শুধু রক্ত দিয়ে আজ পাল্টানো যাবেনা জীবন,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবেনা ডালে।
শুধু মৃত্যু দিয়ে আজ পাল্টানো যাবেনা আঁধার,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফটবেনা দেশে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই, স্বপ্নবান অস্ত্র চাই হাতে ॥[১৪১]

গ. একদিন মেঘেরা জীবিত হয়ে
ঝড় হলে
জীবনের সমস্ত ঘরবাড়ি
একাকার হয়ে যাবে
রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্ম যন্ত্রনায়।[১৪২]

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ, সামরিক স্বৈরশাসন এবং সবধরনের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো উপায় যে নেই, রুদ্র তা ভালোভাবে বিশ্বাস করেন। এ দৃষ্টিকোণ

থেকে রুদ্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি। সামাজিক শৃঙ্খল এবং ব্যক্তিক জঞ্জাল হটিয়ে কৃষক-শ্রমিক অধিকার আদায়ে তাঁরা উভয়ে যেমন আত্মবিশ্বাসী, তেমনি কৃষক-শ্রমিক শক্তির সম্মিলিত আক্রমনে পুঁজিবাদী আগ্রাসী শক্তির বিলুপ্তি এবং কৃষক-শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এজন্য রুদ্র স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চান, সম্মিলিত শ্রমিক ঐক্যের মাধ্যমে গণ বিপ্লবের আহ্বান জানান। পূর্ববর্তী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায়– সিপাহীবিপ্লব, তিতুমীরের আন্দোলন, সূর্যসেন ও প্রীতিলতার বৃটিশ বিরোধিতা, নাচোলের কৃষকবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি গণবিপ্লবী চেতনার পাশাপাশি এদেশের ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের সাহসী সংগ্রামশীলতার প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। রুদ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, এ দেশের ধন উৎপাদনে কৃষক-শ্রমিকের দান সবচেয়ে উপরে; অথচ তারাই সমাজে অবহেলিত, তারা আদৌ শ্রমের মূল্য পায়না, অসৎ ব্যবসায়ী এবং স্বার্থবাদী রাজনীতির শৃঙ্খলে তারা বাঁধা। সমাজ পরিবর্তন ও অপশাসন সম্পর্কে তিনি তাই শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য অধিকারবোধে জাগ্রত করে সম্মিলিত শক্তির পুনরুত্থান ঘটাতে চান। এ চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে রুদ্র সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ ও পুঁজি সমাজে শ্রেণী বিভাগ এবং শ্রেণীসংঘাতের মূল কারণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ মানুষকে সমাজে শ্রেণী সংঘাতের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। যেহেতু সমাজে শ্রমিকের ধন উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা, সেহেতু শ্রমিক শ্রেণীকেই রাষ্ট্রের প্রধান আসনে বসাতে হবে। সেজন্য শ্রেণী সংঘাতে শ্রমিকের জয় অবশ্যম্ভাবী করতে হলে ধনিক-শাসিত স্টেটকে বিচূর্ণ করতে হবে। কেননা, মালিক পক্ষ চিরন্তন নিয়মে বঞ্চিতদের শোষণ করতে এবং তাদের বঞ্চিত রাখতেই চেষ্টা করে।

মার্কস সমাজ নীরিক্ষণ দৃষ্টিতে দেখালেন যে, দুনিয়ার অসমর্থ ও অসহায় মজুররা পুঁজিপদিতের নিরবচ্ছিন্ন জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, কেবল প্রকাশের ভাষা তারা খুঁজে পাচ্ছে না; তাদের অধিকার ও ন্যায্য অংশ লাভের জন্য মালিক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর এই শ্রেণী সাফল্যের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হবে। রাষ্ট্রের সমস্ত অধিকার শ্রমিক শ্রেণী করায়ত্ব করতে পারলে শ্রেণীহীন সমাজে কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের কথা উঠবে না। ধনের উৎপাদন, ধনের বন্টন, ধনের বিকিরণ, সব যখন সমাজের হাতে ন্যস্ত হবে, তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবেনা; বিশেষত: যেখানে বিরোধ থাকবে না, সেখানে শাসনতন্ত্রের কোনো দরকার নেই, তা বাহুল্যমাত্র। আর এভাবেই স্টেটের স্থান গ্রহণ করবে commune–জনমঙ্গলের সামাজিক সংস্থা[১৪৩]। তারপর রুশ বিপ্লবের প্রেরণা গোটা বিশ্বকে এ মতবাদে আকৃষ্ট করে তোলে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাই শ্রমিক শক্তির উপরই নির্ভর করেন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সজাগ করে তোলেন :

ক. শ্রমের মূল্য, মজুরীর ঘেরাটোপে
তোমার স্বপ্ন বহুদিন থেকে বাঁধা,
মাকড়শা জালে মৃত মাছিটির মতো
তুমিও আটকা সামাজিক শৃংখলে।[১৪৪]

খ. সম্মিলিতের সাম্য জীবন খুঁজে
আমরা সরাবো ব্যক্তিক জঞ্জাল।
আমরা ছিঁড়বো চেতনার শৃংখল,[১৪৫]

গ. কৃষকের রন্ধ্রে রক্তে বুনে যায় বন্দিত্বের বীজ
মাতৃভূমি খণ্ডিত দেহের পরে তার থাবা বসিয়েছে
আর্থ বনিকের হাত।
আর কী অবাক! ইতিহাসে দেখি সব
লুটেরা দস্যুর জয়গানে ঠাঁসা,
প্রশস্তি, বহিরাগত তস্করের নামে নানা রঙ পতাকা ওড়ায়।
কথা ছিলো, 'আমাদের ধর্ম হবে ফসলের সুষম বন্টন',
আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ণ ফসলের মাঠ।[১৪৬]

ঘ. সকল মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে, আর
যার যার মেধা ও শ্রমের যোগ্যতায় পাবে কাজ।
দালান না হোক, হবে সকলের জন্যে কুঁড়েঘর,
রোগে ভুগে পথে ঘাটে মরবেনা মানব সন্তান–
এই স্বপ্ন যদি হয় ভুল স্বপ্ন, তবে এই ভুল
পবিত্র ফুলের মতো বুকে কোরে রাখবো আমরা।[১৪৭]

ঙ. এতো প্রতিবাদ পরতে পরতে জমে ওঠে যেন পাললিক মাটি,
শত্রুর ঘাঁটি জননী চিনেছে, চিনেছে কিভুল রাজার ভূমিকা?
বিষাদ আসুক বেদনায় বিষে
পরাজয় যাক রক্ততে মিশে,
বাহুতে বক্ষে নেমে এসো ঋজু প্রজ্ঞা-সবল তাজা প্রতিরোধ,
ভেঙে দাও কালো শ্রেনী ব্যবধানে

কুলষিত বোধ নষ্ট হৃদয়,

প্রতারক ক্ষয় নির্মূল হোক সুস্থ রোদের সবল আঘাতে।[১৪৮]

শস্যের বিশ্বাসে, বন্টনের সুষম বিন্যাসে বাংলার রুগ্ন জনপদগুলো আবার আলোকিত ভোরের নরম সকালের স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠবে সাম্যের জয়োগানে; শোভন সুস্থ মমতা ভরা কৃষকের হৃদয় উৎফুল্ল হবে এবং সুলতানের চিত্রের মতো সবল পেশী থাকবে আমাদের কৃষক-শ্রমিকের। এই আশাবাদী দীপ্ততায় রুদ্রের কবিতা সাম্যবাদে আত্ম প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে :

ক. এই ভুমে আরো এক নোতুন নির্মান হবে শস্যের বিশ্বাসে।[১৪৯]

খ. আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ন ফসলের মাঠ।[১৫০]

গ. আমাদের তীর্থ হোক অঘ্রানের শস্যপূর্ন ফসলের মাঠ।[১৫১]

ঘ. মাটিতে আমার রক্তের বীজ বুনি
মাটিতে আমার জন্মের গান শুনি,
ভাঙা জীবনের কংকালে ওড়ে আগামীর শুভদিন।[১৫২]

ঙ. নিমেষে উর্বরতা নেচে ওঠে শস্যের সতেজ গ্রীবায়-
ফসলের সুষম বিন্যাসে।[১৫৩]

চ. পুনর্বার প্রেম ছোঁবো, ছোঁবো স্বপ্ন মাটির পাঁজরে।[১৫৪]

ছ. হৃদয়ের রাত ছিঁড়ে এলো রোদ, ভালোবাসা,
মুগ্ধবোধ, ফসলের হেম।[১৫৫]

রুদ্রের আত্ম বিশ্বাসে এতটুকু ঘুণ ধরেনা, তাই স্বৈরশাসনের শত অত্যাচার-নির্যাতন তাঁকে ক্লান্ত করলেও আগামীর উজ্জ্বল আলোর বন্যায় সাম্যের আশাবাদে তা ঢাকা পড়ে যায়। রুদ্রের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের সংঘশক্তির মিলিত আক্রমণ এবং তাতে ভঙ্গুর সামরিক শাসন অপসৃত হয়ে শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠার সাম্যবাদী রূপের হুবহু প্রতিফলন আমরা দেখি। কৃষক-শ্রমিকের মিলিত শক্তির প্রতি তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই এবং তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এ মিলিত শক্তির দ্বারাই বাংলাদেশের বুকে সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে; কৃষক-শ্রমিকরা তাদের শ্রমের মূল্য ফিরে পাবে। "অবশ্যম্ভাবি পরিণতির পূর্বাভাষ" কবিতায় রুদ্র তাই সামরিক জল্লাদ সরকারকে হুসিয়ার করে দিতে চান :

শোষনের বিষে ভরে গেলে সর্বত্র
মুষ্টিবদ্ধ হাত জেগে ওঠে প্রতিবাদে
এ কথা তোমরা জানো।
রাজপথ রঞ্জিত হলে নিষ্পাপ রক্তে
আগামি সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়
একথা তোমরা জানো।
শুধু রক্ত নিলে রক্ত দিতে হয়
....
মেঘের ভেতর বজ্র আছে
এ কথা সত্য যেমন
রক্তে আগুন থাকে, বিক্ষোভ থাকে
একথা আমিও জানি, তোমরাও জানো
বুলেট নির্ঘাত প্রতিবাদ হয়ে ফিরে আসবে–[১৫৬]

এই অপশাসন রোধে রুদ্র সর্বহারা মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে উদাত্ত আহ্বান জানান, যারা শ্রেণী ভেদাভেদ দূর করে দেশে ফসলের বিপ্লব ঘটাবে, তারা জেগে উঠেছে; এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সাম্যবাদী রুদ্র এই শক্তির প্রয়োগের উপর শুধু আন্তরিক নন, বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে, শাসন-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ব্রাত্য মানুষের মলিন কর্কশ হাত আজ মুষ্টিবদ্ধ, শুধু রক্তে আর আজ কৃষ্ণচূড়ায় ফুল ফুটবেনা, আজ অস্ত্রের আঘাত চাই; সম্মিলিত সংঘ শক্তির আঘাতে এ সমাজের পরিবর্তন হবে; তাই অতীতের সমস্ত প্রেরণা বুকে ধারণ করে রুদ্রের সর্বহারা বাহিনী এগিয়ে যেতে চায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. আমরা এগয়িে যাবো শ্রেনীহীন পৃথিবীর দিকে,
আমাদের সাথে যাবে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস,
অনার্যের উষ্ণ লহু সংঘশক্তি, শিল্পে সুনিপুন
কর্মঠ, উদ্যমশীল বীর্যবান শ্যামল শরীর।
... ...
চলো, আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের সাথে যাবে
বায়ান্নর শহীদ মিনার, যাবে গন অভ্যুত্থান।

একাত্তর অস্ত্র হাতে সুনিপুন গেরিলার মতো।
আমাদের সাথে যাবে ত্রিশ লক্ষ রক্তাক্ত হৃদয়।
আমরা সশস্ত্র হোই সমতার পবিত্র বিশ্বাসে।[১৫৭]

খ. ওই যে যুবক বুকে বুলেটের দগদগে ক্ষত
ওই যে কিশোর খুলি উড়ে গেছে লুটানো রাস্তায়
ওই যে লাশের স্তুপ স্বদেশি বুটের তলে পেষা
ওই যে রক্তের দাগ, ভাঙা হাত, লাঞ্ছিত কুমারী
ওই যে হাজার হাত জুলুমের বিরুদ্ধে উঁচানো
... ...
শুধু রক্ত দিয়ে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবেনা দেশে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই, স্বপ্নবান অস্ত্র চাই হাতে।[১৫৮]

গ. পিষ্ট পৃথিবী তোলে পাথরের ভার,
কর্কশ হাত টানে সময়ের রশি।
কালো-ম্লান মানুষেরা জাগে দরোজায়
মুখোমুখি দাঁড়াবার এই তো সময়॥[১৫৯]

ঘ. সম্মিলিত মানুষ কোথায়? কেড়ে নেবে যারা এই
গুটিকয় সোনার চামচ, আর বনেদি দেয়াল[১৬০]

ঙ. আমাদের ধর্ম আজো ফসলের সুষম বন্টন
হোক তবে রুগ্ন এই ফসিল রাত্রির অবসান।
... ...
কে তুমি নাড়িয়ে জিভ অস্বীকার করো সাম্য-শ্লোক?
দাঁড়াও সমুদ্র তীরে, চেয়ে দ্যাখো জলের বিস্তার,
তাকাও নীলিমা নীলে, দ্যাখো নীল বিশাল উপমা
সম্মিলিত মানুষের, আর দ্যাখো বৈশাখের ঝড়-[১৬১]

চ. কোনো নিস্কৃতি নাই, ২ আমি জানাই শোনো স্বার্থপর
আর্ত মানুষ কেড়ে নেবে তাদের অধিকার।[১৬২]

ছ. গেরামের পর গেরাম উঠছে জেগে
শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল,
খুনীর অঙনে বাজে প্রতিশোধ মত্ত মাদল
জাগে সমতার পূর্ব লড়াই, পূর্বাভাসের বাঁশি।[১৬৩]

জ. গ্রাম থেকে উঠে এলো ক্ষেতের মানুষ
খরায় চামড়া-পোড়া মাটির নাহান,
গতরে ক্ষুধার চিন্ মলিন বেবাক,
শিকড় শুদ্ধ গ্রাম উঠে এলো পথে।[১৬৪]

ঝ. স্বপ্ন-হারানো মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
স্বজন হারানো মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
ক্ষুধায় কাতর মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
পোড়ায় নগরী, ভাঙে ইমারত, মুখোশের মুখ ছেঁড়ে
ছিঁড়ে নিতে চায় পরাধীন আলো প্রচণ্ড আক্রোশে।[১৬৫]

সমবায়ী-থিম উপরের উদ্ধৃত কবিতাংশগুলোতে আছে, এতে চলমান বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিপ্লবের প্রতি সর্ব সাধারণকে আকৃষ্ট করার উন্মত্ত বাসনা কবিকে তাড়িত করেছে, শুধু শ্রমিক-কৃষক শক্তির সম্মিলিত আক্রমণই যথেষ্ট নয়, এই সামরিক বন্ধাত্ব রাজনীতির অবসানের জন্য এবং সাম্যবাদী সমাজ গড়নের জন্য সর্ব সাধারণের মিলিত অস্ত্রশক্তির প্রয়োগে বিশ্বাসী রুদ্র। কেননা, জলপাই বাহিনীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে সর্বশ্রেণীর মিলিত শক্তিই শুধু যথেষ্ট নয়, অস্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে অস্ত্রের মাধ্যমেই। তাই রুদ্রের কবিতায় সামাজিক বিভাজন প্রক্রিয়া দূল করতে নারীরাও বাদ যায় না, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং মিছিলেই নারীর শোভাবর্ধন রূপ প্রত্যক্ষ করেন রুদ্র। নারী শুধু ফসলের ও সন্তানের উৎপাদকই নয়, সাম্য আন্দোলনেও নারীর প্রতিরোধ স্পৃহা অগ্নিমূর্তি রূপ নিতে পারে। সিরাজ সিকদারের মতো রুদ্রও নারীকে রাজপথের বিপ্লবী প্রেরণা ভাবতে চান; আন্দোলনের অগ্রভাগে, মিছিল-প্রতিবাদে নারী অধিকার আদায়ে তাই বিক্ষুব্ধ :

ক. মিছিল তোমার প্রধান অলংকার,
মিছিলেই তুমি সবচেয়ে অপরূপ।
... ...
মিছিলে তোমার ক্ষুধার পক্ষে তুমি,

মিছিলে তোমার মাথা গুঁজবার ঠাঁই,
পরনে কাপড়, শিশুর নিশ্চয়তা।
মিছিল তোমার প্রানের অঙ্গীকার।
মিছিলেই তুমি সবচেয়ে লোভনীয়,
মিছিলেই তুমি সবচেয়ে বেশি নারী।[১৬৬]

খ. তুমি জানো তুমি নিরুপায় মাছি নও,
তোমার স্বপ্ন সচেতনতার ভাষা
ভেঙে দিতে চায় ভাঙা জীবনের ভিত-
তুমি জানো তুমি মিছিলের একজন ॥[১৬৭]

গ. এখন দিন ও রাতের সন্ধিক্ষন,
নদীতে জোয়ার ও ভাঁটির ক্রান্তিকাল।
তোমার স্নায়ুতে বিক্ষোভ দানা বাঁধে,
টের পায় জল জোয়ারের জাগরন।
ইচ্ছা তোমার সচেতন প্রতিবাদে
ভেঙে দিতে চায় জানালার কালো শিক।
দুচোখে তোমার বিশ্বাস জ্ব'লে ওঠে,
জোয়ারের জল প্লাবনে ভাসায় নদী ॥[১৬৮]

(৭)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ শ্রমজীবীদের অক্লান্ত সংগ্রামে বিপ্লবী প্রেরণা-পান, নারীর সাথে ফসলের, ঝড়ের সাথে সংঘাতের, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে দ্রোহীরূপ; সূর্যের তাপে তেজোদীপ্ত ও বহ্নিমান সাম্যবাদী শ্রেণী চেতনা প্রতীকায়িত করতে চান; রক্তের মধ্যে বিপ্লববোধ সঞ্চারিত হতে দেখেন, রক্ত আর কৃষ্ণচূড়ায় আন্দোলনের লেলিহান শিখা প্রত্যক্ষ করেন; গদ্য ভাষাকে মাটির সংলগ্ন কবিতার আবাদে ভরে দিতে চান, রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সুকান্তকে স্বাগত জানান এবং নিজেকে ষোল আনা শ্রেণী সংগ্রামী কবি হিসেবে গড়ে তোলেন; এজন্য 'জনতার কর্ষিত ক্ষেতে' ছড়িয়ে দেন কবিতার ধান। সমস্ত প্রসঙ্গের শেষে এজন্য তার কাছে শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী সংগ্রামই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। মাটিতে চুমু খেয়ে টের পেয়ে যান রক্তের তাজা তাজা

গন্ধে শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রম, মূল্যহীনতা এবং সামাজিক বৈষম্যের দেয়াল। রুদ্র মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র এঁকে সমাজে এর কু-প্রভাব এবং দ্বান্দ্বিক রূপ প্রত্যক্ষ করাতে চান। যেমন "ক্রান্তিকাল" কবিতায় :

উপদ্রুত জনপদে লুট হচ্ছে রোদ,
ফসলের প্রথম প্রেরনা,
নিয়ন্ত্রিত মানুষের মানবিক মুখরতা, স্বপ্নাবলী,
লোকালয়ে লুট হচ্ছে সমতার নিসর্গ-নিয়ম।
কেউ কিছু বলছেনা-
কষ্টবন্দি মানুষেরা যার যার অমূলক স্বপ্নের আঠায়
একা একা জড়িয়ে রয়েছে ... ...[১৬৯]

সেই সামন্তকাল থেকেই এদেশে সম্পদ আহরণের নেশায় কিছু সংখ্যক মানুষ অন্য মানুষকে সমাজে বিভক্ত করে রেখেছে; ফলে সমাজে class divisions গড়ে ওঠেছে, সামাজিক উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থাও কার্যকরি করা হয়েছে এই শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে। এরফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ধনী-দরিদ্র এবং ভেদাভেদের কাঠামো। মালিকপক্ষ চিরন্তন নিয়মে বঞ্চিতদের শোষণ করতে ও বঞ্চিত রাখতেই যেন আনন্দ পায়। রুদ্রের কবিতায় এই শোষণ, বৈষম্য এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রের অভাব নেই। তিনি শেষ পর্যন্ত শোষিত-নির্যাতিতের পক্ষাবলম্বন করতে থাকেন। নাগরিক বৈষম্য, হতাশা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তিনি সমাজের অনিবার্য সংঘর্ষের কথা বলতে চান। শোষক সম্প্রদায় চিরদিন স্বার্থের বেড়াজালে বন্দি করেছে সাধারণ মানুষকে, ফূর্তি করছে তাদের শ্রমের গড়া বিত্ত, বৈভব এবং আভিজাত্য নিয়ে; মুখোশধারী এ পচনশীল সমাজের রুগ্ন এবং বিষাদময় দিকগুলোর উল্লেখ করে রুদ্র শ্রেণী সংঘর্ষের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে চান। "শীতার্ত সময়" কবিতায় সামরিক সন্ত্রাসের মদদে সামাজিক ক্লেদ ও স্বার্থবাদী ধণিক-বণিক শ্রেণীর মুখোশ উন্মোচন ঘটাতে চান রুদ্র :

চারপাশে কিলবিল পোকা, কেন্নো, কেঁচো,
মুদ্রাস্ফীতি মাথার ভেতরে কাঁদে চিল
এটা কি? একাকি।
আমলা থাবার নিচে শিল্পকলা,
গলা, পচা, কাড়াকাড়ি তাই নিয়ে-
মাঝরাতে কোথায় উধাও
স্বপ্নসহ তরতাজা নারী ও নিশান।[১৭০]

অন্যদিকে সমাজের বৃহৎ অংশে ক্ষুধায় জর্জরিত, অবহেলিত এবং শোষণ-শাসনে অরক্ষিত। 'রক্ত মাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পোকা-ধরা ক্ষত'[১৭১]– এর ফলে সামাজিক বৈষম্যে বড়ই দুর্বল তারা, অপশাসনে তারা ক্ষুধা কাতর-অসহায়। অথচ 'সভ্যতার স্তুতি কোরে প্রতিদিন ছাপা হয় অজস্র কাগজ'।[১৭২] এই সাংঘর্ষিক রীতি-নীতি পদ্ধতির ফলে, এই শ্রেণীবৈষম্যের বেড়াজালে সমাজ-রাষ্ট্র দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে এবং 'আমাদের স্বপ্নগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কাক ও শকুন।'[১৭৩] এই শ্রেণী ভেদাভেদ তারাই ভাংবে, যাদের শেকড় মাটিতে, যাদের শ্রমের উৎপাদনে সভ্যতা গড়ে ওঠে; তাদেরই সংগঠিত করতে রুদ্রের প্রয়াস :

আজ সভ্যতার সিঁড়ি ভেঙে
আমরা এসেছি এক আনবিক ব্রীজের উপর,
ধংশের শ্বাপদ জিভ চারিপাশে লকলক জ্বলে।
পাললিক মাটি, জল, অরন্য ও শস্যের সন্তান,
তাকাও সূর্যের দিকে, শিখে নাও বিপুল দহন।
আত্মার ভিতরে ফিরে জ্বলে ওঠো রক্তের ভাষায়–
ভাসায় কে, মাটিতে শেকড় যার রয়েছে প্রোথিত ![১৭৪]

মালিক শ্রেণীর স্বার্থের করাতে চিরকাল শ্রমিকরা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আসছে; মালিকের উৎপাদন বাড়ছে, বিরাট বিরাট অট্টালিকা গড়ছে শ্রমিক; অথচ শ্রমিকের মজুরি ও ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন নিম্নমুখী. দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি তাদের দিন মজুরিতে পোষায় না। রোগ-ব্যাধি-মহামারি তো নিত্য তাদের সঙ্গী। এই শ্রেণী বৈষম্যবোধ রুদ্রকে আহত, বেদনায় জর্জরিত করে তোলে, সমতার স্বপ্নময়-শ্রমময় দিনের কাঙ্খিত অগ্নিমন্ত্র বুনে নিয়ে মর্মজ্বালায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন :

আমার চতুপার্শ্বে আলো, ভিন্ন আলো-
আলো জ্বলছে, অন্ধকারে ফুল ফুটছে। আলো জ্বলছে,
ব্যক্তিগত বাড়ি উঠছে। আলো জ্বলছে, ভিন্ন আলো।
কিন্তু আমি দাঁড়িয়েছিলাম, দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম
দাঁড়িয়ে আছি।
আমার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র
হত্যাযোগ্য লোক চিনিনা।
আমার বুকে অগ্নিমন্ত্র
শিকারে এই হাত ওঠেনা।[১৭৫]

শ্রেণী বৈষম্য আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের দিকে ধাবিত করছে। বিত্ত ও বিত্তহীন এ দু'দলের মধ্যে বিত্তশালীরা সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করার জন্য রাষ্ট্রনায়ক যন্ত্রটির উদ্ভাবন করলো এবং বিত্তহীনদের অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণ করার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তুললো। অথচ সাম্যবাদী সমাজ হবে Classless Society- শ্রেণীহীন সমাজ। এখানে Dominating Class- এর হবে অবসান। শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্যের ফলে রাষ্ট্র ও সৈন্য বাহিনীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অত্যাচার-শোষণহীন সমাজে সবার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। অথচ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাপটে মানুষ সামাজিক শৃঙ্খলে বন্দি এবং রাষ্ট্রের শাসন-শোষণে জর্জরিত। বিভেদ পূর্ণসমাজ ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে আমাদের দু'টি পক্ষ :

> প্রকৃতির ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, আলো এবং অন্ধকার দুটি পক্ষ
> নিসর্গের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, পানি এবং মাটি দুটি পক্ষ
> পৃথিবীর ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, শোষিত এবং শোষক দুটি পক্ষ
> মানুষের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, গরীব এবং বুর্জোয়া দুটি পক্ষ
> এদেশের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, পঁচাশি এবং পনেরো দুটি পক্ষ
> ... ...
> এক দিকে বিত্তবান,
> অন্যদিকে বিত্তহীন ক্ষুধার্ত মানুষ।
> একদিকে পুঁজিবাদ,
> অন্যদিকে সাম্যবাদী শান্তির সমাজ।
> ইতিহাস স্বাক্ষী দ্যাখো, অনিবার্য এ-লড়াই- কোন পক্ষে যাবে?[১৭৬]

রুদ্র বরাবরই দুঃখী-দরিদ্র-অন্নহীন মানুষের পক্ষে, শোষিত-নির্যাতিতের পক্ষে, তাদের হাসি-কান্নার দোসর, তাদের দাবি-দাওয়ার পক্ষে হন উচ্চকিত এবং ক্ষমাহীন। গণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে দীপ্র এবং ক্ষিপ্ত। স্বৈরশাসন, জলপাই বাহিনী, গেরুয়া বাহিনী, বিত্তশালী পদলেহনকারীর বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত শ্রেণী সংগ্রাম। ভাতের দাবিই তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়বস্তুতে দাঁড়ায় :

> লক্ষ টাকায় শোভন হচ্ছে বিত্তবানের বিলাস-কক্ষ,
> সর্বহারার মলিন বক্ষ লক্ষ্য করছে লক্ষ টাকায়
> পোষা সৈন্য, শান্তিরক্ষী, প্রতিরক্ষার অস্ত্র বুলেট।
> লক্ষ টাকার খাবার উড়ছে মার্সিডিজের নীলাভ ধোঁয়ায়
> অনেক অস্ত্রবাজীর খেলা, অনেক চমক,

অনেক প্রতিবাদের সভা, বারোই দিবস, তেরোই দিবস,
অনেক স্মৃতিচারণ মেলা, স্বৈরতন্ত্র হলো তো ভাই,
অনেক হলো বুট-রাইফেল ঘষা-মাজা।
চোপ হালারা ...
আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি ॥[১৭৭]

রুদ্র তাঁর কবিতায় মানুষের দ্বন্দ্বময় ইতিহাসকে স্পর্শ করতে চান, শ্রেণী হিংসার প্রজ্বলনে দ্রোহী হয়ে উঠুক মানুষ এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় হোক সংগ্রামশীল। মার্কসীয় ক্রমবিকাশ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, যেখানে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে জীবনের কোনো একটি ব্যবস্থা যখন উন্নতি-উৎকর্ষের চরমতম পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন তারই গর্ভ থেকে কতক বিরোধী শক্তি জন্ম নেয় এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। রুদ্র চলমান জীবনের সাথে, ধনী-দরিদ্রের সংগ্রামের চিত্র আঁকেন, সমাজের বৈষম্য ও শ্রেণী শত্রুকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। পুরনো ব্যবস্থার নির্মূল করে সেখানে নবতর সাম্য ব্যবস্থার পর্যায় শুরু করতে শ্রেণী চেতনা গড়ে তুলতে চান। "চরিত্র বদল" কবিতার ভাষ্য এমন :

আমার রক্তে নিসঙ্গতা,
আমি চাই সে সঙ্গময় হয়ে উঠুক,
হয়ে উঠুক হিংস্র হাঙরের দাঁত।
আমি চাই সে শ্রেণীহিংসায় জ্বলে উঠুক।
আমার রক্তে উৎসব,
আমি চাই সে উৎসবহীন হোক
হোক সে অরন্য হত্যার কুঠার,
আমি চাই সে স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠুক।
আমার রক্তে অন্ধকার,
আমি চাই সে আলোকিত হোক,
আমি চাই সে অগ্নিময় হোক।
হোক সে দ্বন্দ্বময় মানুষের ইতিহাস ॥[১৭৮]

'বিষ বিরিক্ষের বীজ' কাব্য নাট্যে গৌরব চরিত্রেও রুদ্র অতি বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তুলে সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্বময় কাঠামোর অবসান চান, চান শ্রেণী শত্রু খতম করতে :

খুঁজি শ্রেনীশত্রু, খুঁজি বিপ্লবের বিরুদ্ধে শক্তিকে-
বদলে ফেলতে হবে ঘুনে ধরা জীবনের ঘর,
এই জুলুমের সমাজ-সংসার, তার রীতি-নীতি।[১৭৯]

এই চাওয়াটা বড় হয়ে দেখা দেয় মূলত সামরিক সন্ত্রাসবাদী সমাজের মূলোৎপাটনেই। রুগ্ন, ক্লান্ত, জরাগ্রস্থ, অথর্ব সমাজের বদলে সুস্থ, সবল ও আনন্দঘন জীবনের কামনা। সেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূর্ণ হতে থাকবে; সেজন্য রুদ্র সমকালীন সমাজের সব দুঃস্বপ্নগুলো দুর্ভাবনাগুলো এবং দুর্ব্যবস্থার অবসান চান। আর এসব অবসান হলেই পরিবর্তনশীল সমাজে নবতর শক্তি ও পূর্বতন ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক নতুন সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু তার পূর্বে, এ গোলযোগপূর্ণ সমাজে রুদ্রের আপাতত দাবী হলো :

কৃষক ফিরে পাক তার শ্রমের সকল উপাদান।
নির্মাতা ফিরে পাক তার নির্মানের উপাদানসমূহ।
চিকিৎসক ফিরে পাক তার শুশ্রূষার স্বপ্ন।
শিল্পী ফিরে পাক তার স্বপ্নের স্বাধীনতা।
শিক্ষক ফিরে পাক তার শিক্ষার বাসনা।[১৮০]

তাও যদি না মানা হয়, অগ্রাহ্য করা হয় মানুষের ন্যুনতম বেঁচে থাকার চাহিদাগুলো এবং না থাকে যদি জীবনের নিরাপত্তা, তা হলে–

শোষন হটাবে এই গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের লাশ,
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।
গ্রেনেড ফাটাবে এই ক্ষুধাজীর্ন দলিত মানুষ
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।
কুয়াশা ছিঁড়বে এই কৃষকের প্রানবন্ত চোখ,
এই স্বপ্ন আগুন জ্বালাবে।[১৮১]

রুদ্র সমকালীন প্রজ্বলন সমাজের আকর ধারণ করে গণ মানুষের ভাষিক নেতাই শুধু নন, সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দৃঢ়চেতা মনে তাই বলে উঠেন, 'দিন আসবেই, দিন আসবেই, দিন সমতার।'[১৮২] এজন্য রুদ্র সাম্য সমাজে কর্মময়-শ্রমময় উৎসবের জয়োগান বাংলার জনপদে ফসলের সুষম বন্টন করতে চান; শ্রমে-কর্মে-ঘর্মে সিক্ত হবে সাম্য সমাজ, যে যার মেধামত করবে জীবিকার্জন এবং মানুষ শ্রেণী ভেদাভেদ ভুলে, শস্য আর স্বাস্থ্যের এবং সুন্দর ও গৌরবের কীর্তন করবে। এভাবে মানুষ ফিরে পাবে তার শ্রমের মর্যাদা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. আজ আমরা আবার সেই
শ্রম আর উৎসবকে ফিরে পেতে চাই।[১৮৩]

খ. আমাদের নারীরা হবে শ্রমবতী, লক্ষীমন্ত আর লাবন্যময়ী।[১৮৪]

গ. পেতে চাই তাঁতের হৃদয় থেকে বেজে-ওঠা শ্রমের সঙ্গীত
ঘরে ঘরে রেশমের গন্ধমাখা আশ্বাসের মসৃন বাতাস।[১৮৫]

ঘ. শ্রম আর প্রশান্তির পৃথিবী বানাবো।[১৮৬]

ঙ. শ্রমের শোনিত ছাড়া অট্টালিকা কখনো ওঠেনা,[১৮৭]

চ. আমাদের স্বপ্ন শ্রমময় একটি দিনের,
সম্মিলিত নৃত্য আর গানে উন্মাতাল
একটি সন্ধ্যার স্বপ্ন আমাদের।[১৮৮]

ছ. সকল মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে, আর
যার যার মেধা আর শ্রমের যোগ্যতায় পাবে কাজ।[১৮৯]

মূলত 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' কাব্য নাটকের অতিবিপ্লবী চরিত্র গৌরবের মতো রুদ্রের কাঙ্খিত বাসনা সাম্যবাদে উৎসর্গিত, মেহনতি মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এবং আজীবন সংগ্রামশীলতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ :

সাম্যমন্ত্রে উৎসর্গ করেছি আমি আমার জীবন,
আমার সংসার নেই, ঘর নেই, নেই পরিজন।
মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা হাতে নিয়ে
আমি আজ তছনছ কোরে চলি শত্রুর শিবির,
বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিই গ্রাম থেকে গ্রামে।
আত্মা থেকে আত্মায় ছড়িয়ে পড়া সে-অগ্নিশিখায়
পুড়ে পুড়ে খাঁটি হবো, খাঁটি হবে সমগ্র স্বদেশ।[১৯০]

কাজেই রুদ্র শুধু প্রগতিশীল চিন্তারই ধারক নন, তিনি আমৃত্যু সাম্যবাদী কবি। গণমানুষের মুক্তির জন্য লড়েছেন, ধিক্কার জানিয়েছেন সমস্ত অশুভ শক্তিকে। রাজনীতি ও কবিতার সহবস্থান করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন; চেয়েছেন মার্ক্সিয় মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা।

তথ্যনির্দেশ

১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "রবীন্দ্রনাথ তোমার কবিতা উয়িদদ্র করো", অসীম সাহা (সম্পাদিত) রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাসমগ্র, বিদ্যাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯। এখন থেকে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র স্থলে 'ঐ' এবং 'অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র'-এর স্থলে 'ঐ' সংকেত ব্যবহার করা হবে।

২. ঐ, "রাজপথে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৩. ঐ, "বিমানবালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৪. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, পৃ. ২৬।

৫. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, পৃ. ২৬।

৬. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, পৃ. ৩৯।

৭. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৭", ঐ, পৃ. ৬৮।

৮. ঐ, "বৈশাখি ছেনাল রোদ", ঐ, পৃ. ৯৩।

৯. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার- ৫", ঐ, পৃ. ১৪৬।

১০. ঐ, "সীমাবদ্ধ ভাঙচুর", ঐ, পৃ. ১৫০।

১১. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, ২খ, পৃ. ২২।

১২. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, পৃ. ২২।

১৩. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬১।

১৪. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬০।

১৫. ঐ, "ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল", ঐ, ২খ, পৃ. ৩০।

১৬. ঐ, "বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে", ঐ, ২খ, পৃ. ৬২।

১৭. ঐ, ঐ, পৃ. ৬১।

১৮. ঐ, "গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।

১৯. ঐ, "এই রক্ত আগুন জ্বালাবে", ঐ, পৃ. ১৭৯।

২০. শামসুর রাহমান, "অলৌকিক আলোর ভ্রমর", 'কাব্য সম্ভার' বিউটি বুক হাউজ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ স্মরণে প্রকাশিত, ঢাকা, পৃ. ১১।

২১. মুহম্মদ নূরুল হুদা, "প্রাণপাখি গুড়ুম", 'অরক্ষিত সময়', প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৯।

২২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১।

২৩. ঐ, "আগুন ও বারুদের ভাষা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ.৪০।

২৪. ঐ, "রক্তের বীজ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

২৫. ঐ, "আধখানা বেলা", ঐ, পৃ. ২০।

২৬. ঐ, "স্মৃতি বন্টন", ঐ, পৃ. ২৪।

২৭. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, পৃ. ২৭।

২৮. ঐ, "মাতালের মধ্য রাত্রি", ঐ, পৃ. ৩২।

২৯. ঐ, "কার্পাশ মেঘের ছায়া", ঐ, পৃ. ৪০।

৩০. ঐ, "ফসলের কাফন", ঐ, পৃ. ৪৭।

৩১. ঐ, "ধাবমান ট্রেনের গল্প", ঐ, পৃ. ৫৩।

৩২. ঐ, "বিশ্বাসী বৃক্ষের ছায়া", ঐ, পৃ. ৫৪।

৩৩. ঐ, "নিশব্দ থামাও", ঐ, পৃ. ৬৪।

৩৪. ঐ, "বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা", ঐ, পৃ. ৮১।

৩৫. তদেব, পৃ. ৮১।

৩৬. ঐ, "হারানো আঙুল", ঐ, পৃ. ১০০।

৩৭. ঐ, "নারী ও নদীর গল্প", ঐ, পৃ. ১৩২।

৩৮. ঐ, "গাছগাছালির গল্প", ঐ, পৃ. ১৪১।

৩৯. ঐ, "জীবন যাপন-৬", ঐ, পৃ. ১৫৬।

৪০. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬২।

৪১. ঐ, "এইজল এই দুঃসময়", ঐ, পৃ. ১৯২।

৪২. ঐ, "দুষিত দুপুর", ঐ, পৃ. ১৯৪।

৪৩. ঐ, "পালশিক উদ্ধার", ঐ, ২খ, পৃ. ১২৪।

৪৪. ঐ, "জোস্নার সবুজ আগুন", ঐ, ২খ, পৃ. ১৩৮।

৪৫. আখতার উল আলম, "গণতন্ত্রের স্বপক্ষে", সাপ্তাহিক রোববার, ৩০মে, ১৯৯০।

৪৬. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "প্রজ্বলন্ত লোকালয়", ঐ, পৃ. ৩৬।

৪৭. ঐ, "অবরোধ চারিদিকে", ঐ, পৃ.৪৬।

৪৮. ঐ, "প্রজ্বলন্ত লোকালয়", ঐ, পৃ. ৩৬।

৪৯. ঐ, "গোপন ইঁদুর", ঐ, পৃ. ৫১।

৫০. ঐ, "নক্ষত্রের ধুলো", ঐ, পৃ. ৫৭।

৫১. ঐ, "ও মন আমি আর পারি না", ঐ, পৃ. ৭৬।

৫২. ঐ, "রাস্তার কবিতা", ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭।

৫৩. ঐ, "কবিতার গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৪।

৫৪. ঐ, "চিঠি পত্রের গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৬।

৫৫. ঐ, "প্রতিবাদপত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী'৮৩", ঐ, পৃ. ১৬৮।

৫৬. ঐ, "প্রতিবাদ পত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী' ৮৩", ঐ, পৃ. ১৬৮।

৫৭. ঐ, "লাশগুলো আবার দাঁড়াক", ঐ, পৃ. ১৬৯।

৫৮. ঐ, "কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প", ঐ, পৃ. ১৭২।

৫৯. ঐ, ঐ, পৃ. ১৭৩।

৬০. ঐ, "ঘোষনা ঃ ১৯৮৪", ঐ, পৃ. ১৭৯।

৬১. ঐ, "নৈশভোজ ঃ ৮৩", ঐ, পৃ. ১৮১-৮২।

৬২. ঐ, "দুঃস্বপ্নের দালানকোঠা", ঐ, পৃ. ১৯৯।

৬৩. ঐ, "ময়না তদন্ত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮।

৬৪. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৬. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৭. ঐ, "রূপকথা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

৬৮. ঐ, "শীতার্ত সময়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬।

৬৯. তদেব, পৃ. ৩৭।

৭০. ঐ, "অবচেতনের পথঘাট", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৭১. ঐ, "বিচারের কথা কেউ বলছেনা কেন", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৭২. ঐ, "চোখ খুলে ফ্যালো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

৭৩. ঐ, "ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১।

৭৪. ঐ, "স্বপ্নের বাস্তুভিটে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৭৫. ঐ, "অবদমনের ডাল পালা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

৭৬. ঐ, "আমরা অনার্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।

৭৭. ঐ, "অবস্যম্ভাবি পরিনতির পূর্বাভাষ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

৭৮. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৮।

৭৯. মোহাম্মদ ইউনুস, "বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস", সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ৭ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৮।

৮০. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৮।

৫৩. ঐ, "কবিতার গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৪।

৫৪. ঐ, "চিঠি পত্রের গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৬।

৫৫. ঐ, "প্রতিবাদপত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী'৮৩", ঐ, পৃ. ১৬৮।

৫৬. ঐ, "প্রতিবাদ পত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী' ৮৩", ঐ, পৃ. ১৬৮।

৫৭. ঐ, "লাশগুলো আবার দাঁড়াক", ঐ, পৃ. ১৬৯।

৫৮. ঐ, "কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প", ঐ, পৃ. ১৭২।

৫৯. ঐ, ঐ, পৃ. ১৭৩।

৬০. ঐ, "ঘোষনা ঃ ১৯৮৪", ঐ, পৃ. ১৭৯।

৬১. ঐ, "নৈশভোজ ঃ ৮৩", ঐ, পৃ. ১৮১-৮২।

৬২. ঐ, "দুঃস্বপ্নের দালানকোঠা", ঐ, পৃ. ১৯৯।

৬৩. ঐ, "ময়না তদন্ত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮।

৬৪. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৬. ঐ, পৃ. ১৯।

৬৭. ঐ, "রূপকথা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

৬৮. ঐ, "শীতার্ত সময়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬।

৬৯. তদেব, পৃ. ৩৭।

৭০. ঐ, "অবচেতনের পথঘাট", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৭১. ঐ, "বিচারের কথা কেউ বলছেনা কেন", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৭২. ঐ, "চোখ খুলে ফ্যালো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

৭৩. ঐ, "ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১।

৭৪. ঐ, "স্বপ্নের বাস্তুভিটে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৭৫. ঐ, "অবদমনের ডাল পালা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

৭৬. ঐ, "আমরা অনার্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।

৭৭. ঐ, "অবস্যম্ভাবি পরিনতির পূর্বাভাষ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

৭৮. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৮।

৭৯. মোহাম্মদ ইউনুস, "বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস", সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ৭ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৮।

৮০. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৮।

৮১. মোহাম্মদ ইউনুস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৮২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "আমরা অনার্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।

৮৩. ঐ, "মিছিলে নোতুন মুখ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৮৪. মুনতাসীর মামুন, 'ইতিহাসের মুক্তি' স্বদেশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৭, পৃ. ২২-২৩।

৮৫. ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলি, ১১শ খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ১৯৩।

৮৬. আহমেদ মুসা, "ঋণ সালিশী বোর্ড : শুভ সূচনা, কিন্তু ফলাফল শূন্য?", সাপ্তাহিক আগামী, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ৬ জানুয়ারী ১৯৮৯, পৃ. ৫।

৮৭. মোহাম্মদ ইউনুস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৮৮. কার্ল-মার্কস, (উদ্ধৃত) আহমেদ মুসার "ঋণ সালিশী বোর্ড : শুভ সূচনা, কিন্তু ফলাফল শূন্য?" পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৮৯. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮-৫৯।

৯০. শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা' সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৩৫।

৯১. কার্ল মার্কস, "ফয়েরবাক, বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ", মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৯২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৯।

৯৩. আহমেদ মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৯৪. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৫৯।

৯৫. ঐ, "পরাজিত নই, পলাতক নই", ঐ, পৃ. ৪০।

৯৬. ঐ, "তছনছ বিশ্বামিত্র", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১।

৯৭. আহমেদ মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৯৮. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "হাড়ের ঘরখানি- ৭", পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

৯৯. 'সাপ্তাহিক আগামী'র প্রতিবেদন, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ২।

১০০. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "হাড়েরও ঘরখানি", পৃ. ৬৮।

১০১. আহমেদ মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১০২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ইশতেহার", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

১০৩. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

১০৪. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯।

১০৫. অজয় রায়, "বাঙালীর আত্ম পরিচয় ঃ একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা", সফর আলী আকন্দ (সম্পাদিত), 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়', ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, পৃ. ২৭।

১০৬. ম.আ.ব. সিদ্দিকী, "হে আত্রাই তোমার উৎস হবো", 'কোমলগান্ধার ভরে আশ্বিনের আকাশ', বিদ্যাপতি প্রকাশ, নওগাঁ, ১৯৯৯, পৃ. ২৮।

১০৭. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "মনে করো তাম্রলিপ্তি", ঐ, পৃ. ৮৫।

১০৮. ঐ, "ফাঁসির মঞ্চ থেকে", ঐ, পৃ. ৫৫।

১০৯. কার্ল মার্কস (উদ্ধৃত), মুনতাসীরের 'ইতিহাসের মুক্তি', ঐ, পৃ. ৯।

১১০. ঐ, ঐ, পৃ. ৫।

১১১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "বিশ্বাসের হাতিয়ার", ঐ, পৃ. ৬৩।

১১২. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, পৃ. ৮৯-৯০।

১১৩. ঐ, "বৈশাখি ছেনাল রোদ", ঐ, পৃ. ৯৪।

১১৪. ঐ, "হারানো আঙুল", ঐ, পৃ. ৯৯-১০০।

১১৫. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১", ঐ, পৃ. ১০১।

১১৬. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২১", ঐ, পৃ. ১১৭।

১১৭. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

১১৮. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৭০-৭১।

১১৯. ঐ, "ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১।

১২০. ঐ, "আগুন ও বারুদের ভাষা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১।

১২১. ঐ, "পুড়িয়ে দেবো নীল কারুকাজ", ঐ, পৃ. ৮৭।

১২২. ঐ, "রাস্তার কবিতা", ঐ, পৃ. ৯৭।

১২৩. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ৩২", ঐ, পৃ. ১২৬।

১২৪. শামসুর রাহমান, "মৃত্যুর উৎসবে", 'কাব্য সম্ভার', বিউটি বুক হাউজ, বাংলা শতবর্ষ ১৪০০ স্মরণে প্রকাশিত; পৃ. ২৩।

১২৫. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "হাড়েরও ঘরখানি- ১", ঐ, পৃ. ৬৬।

১২৬. ঐ, "পক্ষপাত", ঐ, পৃ. ৮৬।

১২৭. ঐ, "সকালের গল্প", ঐ, পৃ. ১২৯-৩০।

১২৮. ঐ, "শাড়ি কাপড়ের গল্প", ঐ, পৃ. ১৩১।

১২৯. ঐ, "নারী ও নদীর গল্প", ঐ, পৃ. ১৩২।

১৩০. ঐ, "দাম্পত্য কলহের গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৮।

১৩১. ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৮।

১৩২. ঐ, "গাছ গাছালির গল্প", ঐ, পৃ. ১৪১।

১৩৩. ঐ, "ভেঙে যাই দ্বিখণ্ডিত", ঐ, পৃ. ১৪৭।

১৩৪. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬৩।

১৩৫. ঐ, "প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি", ঐ, পৃ. ৪৮।

১৩৬. ঐ, "দুর্বিনীত জলের সাহস", ঐ, পৃ. ৫৯।

১৩৭. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ১৪", ঐ, পৃ. ৭০।

১৩৮. ঐ, "রাস্তার কবিতা", ঐ, পৃ. ৯৮।

১৩৯. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬৪।

১৪০. ঐ, "মিছিল", ঐ, পৃ. ১৮৭।

১৪১. ঐ, "অস্ত্র চাই", ঐ, পৃ. ১৮৮।

১৪২. ঐ, "একদিন রক্তাক্ত ঝড়ের শেষে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

১৪৩. শ্রী শচীন সেন, "রাষ্ট্র বনাম সমাজ", 'রবীন্দ্রায়ণ' ২য় খণ্ড, শ্রী পুলিন বিহারী সেন (সম্পাদিত), বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ১১৬।

১৪৪. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "সকালের গল্প", ঐ, পৃ. ১২৯।

১৪৫. ঐ, "পাখিদের গল্প", ঐ, পৃ. ১২৮।

১৪৬. ঐ, "কথা ছিলো সুবিনয়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১।

১৪৭. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

১৪৮. ঐ, "মাঝের দেয়াল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

১৪৯. ঐ, "শস্যের বিশ্বাস", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

১৫০. ঐ, "কথা ছিলো সুবিনয়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১।

১৫১. ঐ, "চিল-ডাকা নদীর কিনার", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

১৫২. ঐ, "রক্তের বীজ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

১৫৩. ঐ, "জোস্নার সবুজ আগুন", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

১৫৪. ঐ, "বৈশাখি ছেনাল রোদ", ঐ, পৃ. ৯৪।

১৫৫. ঐ, "অকর্ষিত হিয়া", ঐ, পৃ. ৭৪।

১৫৬. ঐ, "অবশ্যম্ভাবি পরিনতির পূর্বাভাস", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

১৫৭. ঐ, "মিছিল", ঐ, পৃ. ১৮৬-৮৭।

১৫৮. ঐ, "অস্ত্র চাই", ঐ, পৃ. ১৮৭-৮৮।

১৫৯. ঐ, "মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন", ঐ, পৃ. ৮৮।

১৬০. ঐ, "বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।

১৬১. ঐ, "আমরা অনার্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০।

১৬২. ঐ, "রাস্তার কবিতা", ঐ, পৃ. ৯৮।

১৬৩. ঐ, "বিশ্বাসের হাতিয়ার", ঐ, পৃ. ৬৩।

১৬৪. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৯", ঐ, পৃ. ৬৮।

১৬৫. ঐ, ঐ- ১০, পৃ. ৬৯।

১৬৬. ঐ, "মিছিল ও নারীর গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৫।

১৬৭. ঐ, "সকালের গল্প", ঐ, পৃ. ১৩০।

১৬৮. ঐ, "নারী ও নদীল গল্প", ঐ, পৃ. ১৩৩।

১৬৯. ঐ, "ক্রান্তিকাল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।

১৭০. ঐ, "শীতার্ত সময়", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।

১৭১. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

১৭২. ঐ, পৃ. ২২।

১৭৩. ঐ, "স্বপ্নগুলো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।

১৭৪. ঐ, "আমরা অনার্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১।

১৭৫. ঐ, "দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে আছি", ঐ, পৃ. ১৬৬।

১৭৬. ঐ, "সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি", ঐ, পৃ. ১৭৫।

১৭৭. ঐ, "পাকস্থলি", ঐ, পৃ. ১৭১।

১৭৮. ঐ, "চরিত্র বদল", ঐ, পৃ. ১৭৭।

১৭৯. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, পৃ. ১০৫।

১৮০. ঐ, "ঘোষণা ঃ ১৯৮৪", ঐ, পৃ. ১৭৯।

১৮১. ঐ, "এই রক্ত আগুন জ্বালাবে", ঐ,

১৮২. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি", ঐ, পৃ. ৬৮।

১৮৩. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬২।

১৮৪. তদেব, পৃ. ১৬২।

১৮৫. ঐ, "হারানো আঙুল", ঐ, পৃ. ১০০।

১৮৬. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬৪।

১৮৭. ঐ, "ইটের নিসর্গ", ঐ, পৃ. ১৮৫।

১৮৮. ঐ, "স্বপ্নগুলো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১৮৯. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

১৯০. তদেব, পৃ. ১০৮।

পঞ্চম অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্ম নিরপেক্ষতা

বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর (১৯৫৬-৯১) আগমন পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনগত রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট, সামরিক সন্ত্রাস, লুটেরা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি ধারার উত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে জর্জরিত পরিস্থিতি ও গণবিচ্ছিন্ন শক্তির দাপটে নাভিঃশ্বাসের কালে। এই সময়ে সামরিক জাতাকল ছিন্ন করতে এবং গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য কবি রুদ্র মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের চেতনা কবিতায় প্রকাশ করতে থাকেন। কিশোর রুদ্র মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিলেন অকৃত্রিম বিশ্বস্ত এক শব্দ সৈনিক। মাতৃভূমির প্রতি প্রচণ্ড টান এবং মৃত্তিকা সংলগ্নতা তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করে এবং সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সারাক্ষণ তা অনুপ্রাণিত করতে থাকে। দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির পথ নির্ধারণ, সামরিক শোষণ-শৃঙ্খল মোচন এবং জাতীয় স্বার্থ গণআন্দোলনের মাধ্যমে সাম্য সমাজের প্রতিষ্ঠায় কবি রুদ্র তাই শোষিত নির্যাতিতের পক্ষাবলম্বন করেন। আমাদের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে ছিল এই প্রেরণা। রুদ্র তা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চান; সেই রক্তাক্ত বিপ্লব, গণ মানুষের রক্তের ক্ষরণ, স্বাধীনতার জন্য কৃষক-শ্রমিক-জনতার আত্মত্যাগ, তরুণের মুষ্টিবদ্ধ হাত। আর প্লাবনের মতো, তেজোদীপ্ত একটি কণ্ঠের আহ্বানে মানুষ নেমেছিল রাস্তায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. মনে কি পড়ে না ঘন বটমূল, রমনার উদ্যান
একটি কণ্ঠে বেজে উঠেছিলো জাতির কণ্ঠস্বর?
শত বছোরের কারাগার থেকে শত পরাধীন ভাষা-
একটি প্রতীক কণ্ঠে সেদিন বেজেছিলো স্বাধীনতা।

হাতিয়ারহীন, প্রস্তুতি নেই, এলো যুদ্ধের ডাক,
এলো মৃত্যুর এলো ধ্বংশের রক্ত মাখানো চিঠি।
গ্রাম থেকে গ্রামে, মাঠ থেকে মাঠে, গঞ্জের সুবাতাসে
সে-চিঠি ছড়ায় রক্ত-খবর, সে-চিঠি ঝাড়ায় খুন,
স্বজনের হাড়ে করোটিতে জ্বলে সে-চিঠির সে-আগুন।[১]

খ. ঝোপে জঙ্গলে আসে দঙ্গলে আসে গেরিলার
দল, হাতিয়ার হাতে চম্‌কায়। হাতে ঝল্‌সায়
রোষ প্রতিশোধ। শোধ রক্তের নেবে তখতের
নেবে অধিকার। নামে ঝন্‌ঝায়– যদি জান্‌ যায়
থাক্‌, ক্ষতি নেই; ওঠে গর্জন, করে অর্জন মহাক্ষমতার,
দিন আসবেই, দিন আসবেই, দিন সমতার।[২]

গ. রক্তের কাফনে মোড়া– কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা– সে-আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা– সে-আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।[৩]

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমে রুদ্র সাম্যতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও কৃষির বিকাশ এবং জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র শোষিত-বঞ্চিত জাতির এক গণজাগরণ প্রত্যাশা করেন। ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্ম ত্যাগে গড়া বাংলাদেশের আঁতুড় ঘরে মৃত্যু হবে এবং সেখানে আবার ওই পাকিস্তানি হানাদারদের মতো সামরিক জান্তার জুলুম-নীপিড়ন চলবে; এটা কিছুতেই রুদ্রের মতো সচেতন কবির পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সামরিক অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীর অপসারণই রুদ্র চান না, ষড়যন্ত্রকারীদের পুনরুত্থানরোধ, জলপাই বাহিনীর রাজনীতির চির অবসান, সাম্প্রদায়িক ধর্মের রাজনীতির কবর, একাত্তরের দালাল-খুনিদের বিচার এবং গণমুখী অর্থনীতি কায়েম করা রুদ্রের উদ্দেশ্য। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী পনেরো বছর জাতির ঘাড়ে চড়ে বসেছে সামরিক রাজনীতি, শোষণ এবং নিপীড়ন। যে রক্তের বন্যায় এসেছে স্বাধীনতা, স্বাধীন দেশে আবার সেই রক্তের হোলি খেলছে জলপাই-গেরুয়া বাহিনী; রুদ্র স্মরণ করিয়ে দিতে চান মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের ঘটনা :

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে-
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?
বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।

এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো,
জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার।
আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।[৪]

বুকের রক্তক্ষরণে যে দ্বীপ জেগে উঠেছে, অগণিত মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা সেখানে লাঞ্ছিত হয়, পদদলিত হয় মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্খা। রুদ্র এই বাসনাসিক্ত বাংলাদেশকে বলেছেন 'একখানি স্বপ্নধোয়া হৃদয়ের তাঁত'।[৫] যা এদেশের মানুষ বুনেছে রক্ত, হাড়, মাংশ, করোটির কষ্ট দিয়ে, ত্রিশ লক্ষ লাশের বিনিময়ে, সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা জন্মের পর পরই বৈষম্যের শিকার হয়– 'স্বপ্নহীনতাই দেখি আজ পায় স্বপ্নের মর্যাদা,/ অযোগ্যরা হয়ে ওঠে স্বপ্নদ্রষ্টা, কর্নধার মাঝি'।[৬] অন্যত্র রাখাল চরিত্রের মাধ্যমে রুদ্র ইংগিত করেন, 'সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ, হাজারো সমস্যা তার,/ অথচ এরই মধ্যে অন্তর্ঘাত, বৈষম্য, বিভেদ/ শুরু হয়ে গেছে।'[৭] তার উপর আবার চুয়াত্তুরে দুর্ভিক্ষ, মাত্র সাড়ে তিন বছরে ক্ষমতাসীন দলটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং দেশের কিংবদন্তীর নেতা স্বপরিবারে নিহত হলেন। বিশ্ব বিবেক ভাষাহীন এক নৈরাজ্যের কালো থাবা দেখলো এবং দেখলো গৃহযুদ্ধের মতো হানাহানি :

যুদ্ধের সাথিরা আজ অনেকেই বিরুদ্ধ শিবিরে,
বুন্ধর শোনিতে ভিজে লাল আজ বন্ধুদের হাত।
ওলোট-পালোট হয়ে গ্যালো সব হায় স্বাধীনতা![৮]

বিশ্ব এমন নৃশংসয়তার নজির দেখাতে পারে নি, বাঙালি যা দেখালো; স্বাধীন দেশের আঁতুড় ঘরেই জনকের মৃত্যু, মুক্তিযুদ্ধে যে দলটির অবদান সবচেয়ে বেশি, তারাই আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো; রুদ্রের মতো সাম্যবাদী কবিদের আশা-আকাঙ্খা, লালিত স্বপ্ন কাক-শকুনে ঠুকরে খেতে লাগলো; এই ব্যথিত স্মৃতিকে রুদ্র স্মরণ করেন এভাবে :

রক্তের নিবিড় স্রোতে করাঘাত কোরে যায় স্মৃতি,
বুকের বাঁ পাশে কার অস্ফুট কান্নার মতো ব্যথা এসে বাজে।
স্বজনের রক্তে ধোয়া এই প্রিয় মাটির সিথাঁনে
আমাদের ব্যথিত প্রনাম এসো জ্বেলে দিই ধুপের মতোন।[৯]

যাঁর পর্বত সমান খ্যাতি, যাঁর আহ্বানে লাখো ভুখা-নাঙ্গার বিজয় স্বাধিত হলো, স্বপ্নের নীড় গড়বার পূর্বেই তাঁর এই পরিণতি! স্বাধীনতায় তাঁর অবদানকে বাঙালি কোনদিন খাটো করে দেখতে পারবেনা। বিজয়

স্বাধিত হবার পর রাষ্ট্র প্রধানের অস্ত্র জমা দান ঘোষণাকে এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে ক্ষমা করাকে রুদ্র এই বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন :

বঙ্গবন্ধু, এ-বাংলার মাটি যাকে নির্মান করেছে,
বাংলার কৃষক, জেলে, সর্বহারা, শোষিত শ্রমিক,
যার কণ্ঠে কথা বলে ভুখানাঙ্গা পীড়িত মানুষ,
যার হাত ভেঙ্গে দিলো বনেদি বাড়ির মাতবরি,
সে বলছে অস্ত্র জমা দিয়ে যার যার কাজে যাও!
বিশ্বাস হয়না। এর মধ্যে আছে অন্য ষড়যন্ত্র,
অন্য চাতুরতা আছে সুগোপনে, আছে অন্য চাল।
যুদ্ধের পুরোটা নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে
বন্দি আমাদের প্রানপ্রিয় নেতা। যুদ্ধ মাঠে
অন্য মাথা চালনা করেছে সেই উত্তাল প্লাবন,
নায়ের হালের বৈঠা ধরে ছিলো অন্য এক হাত।[১০]

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখা দেয়। সেজন্য স্বাধীনতার পর পরই বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সকল পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করা হলো। এটা সমাজতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; কিন্তু উপযুক্ত ক্যাডার ও সৎ প্রশাসনের অভাবে দেশের মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই হলো। দুদিন যেতে না যেতেই হরিলুট শুরু হলো। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাইনে নেয়া হতে লাগলো। পাটকলগুলিতে পাট ও খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় হতে থাকে। বস্ত্রশিল্পের তুলা কেনা ও সুতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ হলো। তাঁতিদের বাড়ল দুর্গতি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পরই এই পদক্ষেপ চুয়াত্তর-পঁচাত্তর সালেই সমাজতন্ত্রের আগ্রহ বাঙালি হারিয়ে ফেলে। ছাত্র-জনতা যারা স্বাধীনতার নামে উৎসর্গিত ছিল, লুটেরা চক্রের হাতে পড়ে তারাও লুটপাটে উদ্বুদ্ধ হলো, বাধ্য হয়ে রাষ্ট্র প্রধান ১৯৭৩ সনের শেষভাগে লুটপাট ও কালো বাজারি বন্ধের জন্য সৈন্য নামিয়েছিলেন।[১১] এভাবে দলে কোন্দল ও দুর্নীতির প্রভাব আরো বিস্তারিত হলো। বিদেশি সাহায্য ও বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলো এবং গুপ্ত হত্যা চলতে লাগলো। বেড়ে গেল দ্রব্যমূল্য, মতবিরোধ দেখা দিলো ছাত্রলীগে, কাঁদা ছোড়া চললো পরস্পর বিরোধী, উত্তপ্ত ও বিশৃংখল হলো চলমান জীবন।

পঁচাত্তর সালে অবশ্য জরুরি অবস্থা জারি করা হলো, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। আবার সমাজতন্ত্রীদের চাপে পড়ে বাকশাল গঠনে যতোটা জন সমর্থনের দরকার ছিলো, বাস্তবে ততটা ছিলনা। দুর্ভিক্ষ আর বাকশাল ক্ষমতাসীন দলের এবং রাষ্ট্রপ্রধানের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে ছাড়লো; পরিণামে দেশি ও বিদেশি চক্রের ষড়যন্ত্রে পঁচাত্তুরের ট্রাজেডি। বিজয়ের এই ব্যথিত পতন কবি রুদ্রের কবিতায় বিশ্লেষিত হতে চেয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা অবসাদে ঢেকে দিয়েছে তাঁর মনোবলকে, তারপরও সেই চেতনাকে বার বার উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন এবং বিজয়ের আনন্দকে আবার কৃষক-শ্রমিকের, ছাত্র-জনতার মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এই ভুল পরিচালনা কিভাবে আসে, লক্ষ শহীদের আর্তনাদ স্বার্থবাদীরা কিভাবে কণ্ঠরোধ করে, পনেরোই আগস্টের করুণ কাহিনী রুদ্রকে পীড়িত করে তোলো। অনেকটা আত্ম সমালোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন রুদ্র, আত্ম সঙ্কট আসে কবিতার শরীরে, প্রবোধ দিয়ে শান্ত করেন মননকে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে চান মুক্তিযুদ্ধকে, সামরিক সন্ত্রাসের কবলে পড়ে বিকৃত ইতিহাস ও বীভৎস মাতৃভূমির পরিণতি অসহনীয় হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে ফুলের মতোন
বিজয়ের ব্যথিত মিছিল তবু কেন চলে ভুলের ভুবনে
কেন তবু ভুল জীবনের পায়ে রেখে আসে পুষ্পের প্রনাম?[১২]

খ. তোমাদের পাঠ্যক্রমে ছিলোনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
তোমাদের হয়নি শুনতে দেয়া দশ লক্ষ মানুষের সমবেত কণ্ঠধ্বনি,
তোমাদের হয়নি দেখতে দেয়া বাঙালির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকেই।
কেবলি কুচক্রে আর মিথ্যাচারে, কেবলি প্রতারনায়
ঢেকে আছে সুদীর্ঘ সময়,
ভুল নায়কের মিথ্যে উজ্জ্বলতা, উৎকীর্ন ফলক-স্মৃতি,
ভুল ইতিহাস লেপন করেছে কালি জাতির ললাটে।
... ...
তোমাদের চোখ জুড়ে স্বাধীনতা শুধু এক স্বপ্ন হয়ে আছে,
তোমাদের স্বপ্ন জুড়ে স্বাধীনতা আজো এক শব্দ হয়ে আছে।
এমনকি তোমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালিতেও প্রতিদিন
স্বাধীনতা নিগৃহীত বুড়ো বোকাদের বাজে তর্জনি হেলনে।
স্বাধীনতা মানুষের আজো এক অনলব্ধ অগাধ আকাঙ্খা-[১৩]

গ. আমি কি চেয়েছি এতো রক্তের দামে
এতো কষ্টের, এতো মৃত্যুর, এতো জখমের দামে
বিভ্রান্তির অপচয়ে ভরা এই ভাঙা ঘরখানি?
আমি কি চেয়েছি কুমির তাড়ায়ে বাঘের কবলে যেতে?[১৪]

ঘ. চরের মাটিতে স্বজনের হাড়ে
দূরের বাতাস কাঁদে
জনপদে জ্বলে শোকের মলিন চিতা,
সারা রাত্রির নির্ঘুম শকুনেরা
সকালে লাল সূর্যকে ছেঁড়ে বেদনার বাঁকা ঠোঁটে।
অধিকারহীন পরাধীন ভোর উঠোনে ঝিমোয় প'ড়ে,
দরিয়ার জল তবুও ধোঁয়ায় দুঃস্বপ্নের ক্ষত।[১৫]

ঙ. সারারাত স্বপ্ন দেখি, সারাদিন স্বপ্ন দেখি-
স্বপ্নের ভেতরে তুমি হে আমার বিষন্ন সুন্দর
চোখের সমুখে আজ কেন এসে দাঁড়ালে নিঠুর!
কেন ওই রক্ত মাংশে, কেন ওই নশ্বর ত্বকের আবরনে
এসে আজ শুধোলে কুশল?

হে আমার বিষন্ন সুন্দর
হৃদয়ের কুল ভেঙে কেন আজ এতো জল ছড়ালো শরীরে
কেন আজ বাতাসে বসন্ত দিন ফিরে এলো কুয়াশার শীতে!

কে সেই বংশীবাদক স্বপ্নের শিয়রে বোসে বাজাতেন বাঁশি
বেদনার ধ্বনি তুলে রাত্রিদিন, সে আজ হারালো কোথায়?

বেদনার রঙ দিয়ে আমি যারে আঁকি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমি যারে আঁকি
আমার কষ্ট দিয়ে, আমার স্বপ্ন দিয়ে যে আমার নিভৃত নির্মান
সেই তুমি- হে আমার বিষন্ন সুন্দর।[১৬]

"নক্ষত্রের ধুলো" কবিতায় রুদ্র আবার মারি-মড়কে আক্রান্ত স্বদেশে হতাশায় নিমজ্জিত হন, বন্ধ্যা অন্ধত্বের অবসানে আবার হতে চান আলোকিত। কিন্তু কঠিন বাস্তবতা, মুখোশ রাজনীতি, গলাবাজি এবং ডাণ্ডাবেড়ি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই বয়ে আনে এবং স্মৃতিগুলো দুর্বিসহ হয়ে ধরা দেয় চেতনালোকে :

প্রৌঢ় পৃথিবীর নগ্ন খুলিতে পা রেখে এক অঘ্রানী যুবক,
করতলে মাটি ছুঁয়ে রক্তে মাংশে পেতে চায় শানিত আগুন,
বন্ধ্যা অন্ধকার তবু মৃত মানুষের মতো ব'য়ে আনে শীত
ব'য়ে আনে কবরের হলুদ কাফনে বাঁধা একরাশ স্মৃতি।[১৭]

কবিতার শেষাংশে পঁচিশে মার্চের সেই কালো রাত্রির করাল গ্রাস এবং বাঙালির বুকে লালিত স্বপ্নের ফেনিল উদ্দামতার প্রসঙ্গ এসেছে। রুদ্র বন্ধাত্বের ও শীতের অপসারণ চান; বিলুপ্তি ঘটাতে চান স্বৈর শাসন-শোষণের। ফিরে আনতে চান সেই রাতের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙালির বিশ্বাসগত চেতনা, যে রাতে একটি নক্ষত্রের প্রত্যাশায় সবাই মুষ্টিবদ্ধ করেছে হাত হায়েনাদের বিরুদ্ধে; শকুনি শাসনের অবসানেও আজ তেমনি সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রেম-ভালোবাসা এবং সুস্থ্যতাগুলো শ্রমের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে চান তিনি; সেই আত্মবিশ্বাসেই অবতারণা করেন কালো রাত্রির, যেখানে জন্ম নিয়েছে বাঙালির মুক্তি প্রেরণা, মুক্তির দিক-নির্দেশনা এবং ফসলের অঙ্গীকারে দ্রোহী উন্মাদনা :

সেই রাতে সমুদ্রের ফেনার মতো একখানা হাত
মৃত্যুর গভীর থেকে তুলে এনেছিলো এক শসার্দ্র জন্ম,
সেই রাতে, সেই রাতে-সূর্যহীন জোস্নাহীন সেই অন্ধকারে
আমাদের প্রতিজ্ঞারা মেঘের মুখোশ ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে
উঠে গিয়েছিলো এক ফেনিল প্রত্যাশায়।[১৮]

সদ্য স্বাধীন দেশে অবসিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লালিত স্বপ্নের দেশে কোন্দল-হানাহানি, বৈষম্য; প্রশাসনে দুর্নীতি ও মতবিরোধ; লুটপাট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি; হত্যা ও সন্ত্রাসে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ রুদ্র তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন। "হাড়েরও ঘরখানি" ৭ নং কবিতায় চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ ও প্রশাসনের অকার্যকারিতা এবং রাষ্ট্র প্রধানের নমনীয়ভাবের কারণে পনেরোই আগষ্টের করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে :

পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে ছিঁড়ে নেয়া সেই ভূমি
দুর্ভিক্ষের খরায়– সেখানে মন্বন্তর এলো।
হত্যার আর সন্ত্রাসের আর দুঃশাসনের ঝড়ে

উবে গেল সাধ– বেওয়ারিশ লাশে, সাদা কাফনের ভিড়ে,
তীরের তরীকে ডুবালো নাবিক অচেতন ইচ্ছায়।[১৯]

আমাদের জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যে, যে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের বজ্র নিনাদে একদিন মহান মুক্তিযুদ্ধে একতাবদ্ধ বাঙালি গড়ে তুলেছিল কঠিন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ সংগ্রাম; সেই নেতা ও নেতৃত্বকে আমরা স্বল্প সময় পেয়েছি, এই হতাশা রুদ্রের মধ্যে সব সময় কার্যকর ছিলো, স্বাধীন দেশ জনকের রক্তে স্নাত হলো; পৃথিবীতে এমন প্রমাণ নেই। ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবা স্বাধীন করেছেন ১৯৫৮ সনে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও তিনি ক্ষমতায় আছেন বহাল তবিয়তে– পূর্ণ জনসমর্থন নিয়ে। মাও সেতুঙ চীনের স্বাধীনতা এনেছিলেন ১৯৪৯ সনে, আজ পর্যন্ত তাঁর দল ক্ষমতায়। ইরাকের সাদ্দাম কিংবা আলজিরিয়ার হুয়েরি বুমেনিদ ছিলেন দীর্ঘদিন ব্যাপি ক্ষমতায়। মাত্র সাড়ে তিন বছরে একটি সদ্য স্বাধীন ভাঙাচোরা দেশকে পুরোপুরি গড়া এবং নির্মাণের পদক্ষেপ দুঃশাসনের ভিড়ে হারিয়ে গেল, আর জন সমর্থন হারিয়ে ক্ষমতাসীন দলটি শুধু গদিচ্যুত হয়নি, এদেশে প্রতি বিপ্লব ও সামরিক শাসন-শোষণের পথকে সুগম করেছে। রুদ্রের "ইশতেহার" এই প্রসঙ্গটি সেই বেদনাকে আবার চারিয়ে তুলতে চায় এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হবার বিশ্লেষণে যান রুদ্র :

যে-তরুণ উনসত্তুরের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে।
যে-তরুণ অস্ত্র হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছে।
যে-তরুনের বিশ্বাস, স্বপ্ন, সাধ,
স্বাধীনতা উত্তরকালে ভেঙে খান খান হয়েছে।
অন্তরে রক্তাক্ত সে তরুন নিরুপায় দেখেছে নৈরাজ্য
প্রতারনা আর নির্মমতাকে।
দুর্ভিক্ষ আর দুঃশাসন যার নিভৃত বাসনাগুলো
দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করেছে।[২০]

অথচ আজো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্বল করে সামরিক শাসকরা পর্যন্ত শ্রমিক-ছাত্র-জনতার রক্তের নামে, হাড়ের নামে– রাজনীতির মঞ্চ গরম করে চলেছে, নগরে নগরে বিশাল মিছিল-সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছে। রুদ্রের "মানুষের মানচিত্র"-২০ নং কবিতায় এ প্রসঙ্গ এসেছে :

রঙিলা শহর শেষে গিলেছে তাদের। তাদের লাশের নামে,
তাদের হাড়ের নামে, তাদের রক্তের নামে আজ রাজনীতি,
জ'মে ওঠে জনসভা, হাত তালি, নগরের বিশাল মিছিল...[২১]

"মানুষের মানচিত্র" ২২নং কবিতায় রুদ্র মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াল দিকগুলো; রক্ত আর লাশের সয়লাব, নির্যাতন- নিস্পেষণ, গ্রামীণ যুবকের পচা লাশ, সহোদরের গলিত দেহ ডিঙ্গিয়ে শক্ত হাতে যে যুবক মোকাবেলা করেছে পাকিস্তানি হানাদারদের, গুড়িয়ে দিয়েছে বনেদি ভিত- সেই প্রসঙ্গ এনে দেখিয়েছেন- বর্তমানে সামরিক সন্ত্রাস কিভাবে তার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে :

অনেক খুঁজেও তুমি সেই চিহ্ন, সেই স্মৃতি কোথাও পাচ্ছোনা।
সেই যে কিশোর খুব শান্ত, বোবা, নয় মাস সাথে সাথে ছিলো,
যুদ্ধে সে সমর্থ নয়, তবু তাকে কোনোভাবে ফেরানো গেলনা-
ভাবো, সেই ছেলে যুদ্ধে নয় মারা গেল স্বাধীন স্বদেশে তার।[২২]

তারপর আছে চলমান শকুনিদের বীভৎস বর্ণনা, তেলতেলে শরীর; যাদের নির্যাতনে কুমারী দেশ মাতৃকার সতীত্ব হরণ এবং লাম্পট্যের চিত্র। পরিশেষে আছে-

ত্রিশ লক্ষ লাশের উপরে ওই ছিন্নভিন্ন জাতির পতাকা ॥[২৩]

একাত্তরের হত্যা, লুট, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যাকে অনেক কবিই দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'মাইলাই' গ্রামে মার্কিন সৈন্যদের গণহত্যার সাথে তুলনা করেছেন এবং পাকিস্তানি বর্বর হত্যাকে 'বাংলার মাইলাই' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রুদ্র স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের হানাহানি, বৈষম্য ও হত্যাকেও সেই মাইলাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন। এ দেশকেও নাগাসাকি-হিরোশিমা, কম্বোডিয়া অথবা ফিলিস্তিনির পর্যায়ভুক্ত করতে চান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অবলুপ্ত কলঙ্কিত বাংলাদেশে যীশুর ক্রুশের মতো বিদ্ধ হয়ে শত শত আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে নিমজ্জিত করে সারাক্ষণ রুদ্রকে :

মাইলাই থেকে একাত্তরের ধূসর বাংলাদেশে
সহস্র মৃত্যুর শোভাযাত্রায় সেদিনও আমি
একটি প্রশ্নের ব্যানার টাঙিয়েছিলাম
আমার শতাব্দীর বুভুক্ষু চোখে
... ...
মান্যবর যীশু তুমি যে ক্রুশে হয়েছো নিহত
সে ক্রুশ আজ আমারই বুকে প্রজ্বলমান,
অসংখ্য আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা
আমার বুকের নিবাসে উৎক্ষিপ্ত।[২৪]

রুদ্র চলমান হত্যার রাজনীতিকে 'মাইলাই'য়ের সাথে মিলিয়ে দেখেন, মাইলাইয়ের রক্ত পিপাসা আজো বাংলার জমিনকে একাত্তুরের মতো শোষণ করে চলেছে, যে মাটিতে আজো লক্ষ শহীদের রক্তের তাজা গন্ধ পাওয়া যায়, সে মাটিকে এখনো 'ক্ষুধিত প্রেতরা ছিঁড়ে খায়/ তার নরোম তুলতুলে অঙ্গ,/ সুতীক্ষ্ণ আক্রোশে ভেঙে দ্যায়/ মনের মন্দির মিনার/ শাড়ী ছিঁড়ে লুটে নেয়/ সোঁদোল মাটির সতীত্ব'।[২৫] "রনাঙ্গন" কবিতায় কবি রুদ্র তাই বেদনাহত ও আত্মসঙ্কটে ভোগেন চলমান নিষ্ঠুরতার হলাহলে; ঘাতকেরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র ভূমিকে 'মাইলাই'-এ পরিণত করেছে, ত্রিশ লক্ষ লাশের উপর দম্ভ করে চলে এবং হত্যা ও সন্ত্রাসের বিভীষিকা ছড়ায় :

সম্প্রতিকালের বাংলাদেশ
পশুর তীব্র তীক্ষ্ণ দন্ত,
অসহায়া ভ্রাতৃর বুকের শেষ
লাল গোলাপটির অবলুপ্তি;
অথবা শত মাইলাই-এর
নর রূপায়ন প্রচণ্ড জঘন্য।[২৬]

একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের শৌর্য-বীর্য ধারণ করে এই সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে কবি রুদ্র আবার সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে চান এবং একাত্তুরের অবতারণা করেন কবিতায়; মুক্তির আর্তি হয়ে দেখা দেয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, সেই তেজে হন বলশালী, গড়ে তুলতে চান প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ। তাই আগমন বার্তা সদর্পে ঘোষণা করেন :

আমরা একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে এসেছি
কাঁধে স্টেন, কোমরে কার্তুজ, হাতে উন্মত্ত গ্রেনেড–
আমরা এসেছি।[২৭]

চলমান জীবনের ভাঙন-স্খলন-পতন-পচন-শোষণ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-যন্ত্রণা-মর্মপীড়া প্রভৃতির অবসানেই কবি রুদ্র অতীতের গৌরব গাথাকে টেনে এনে সংগ্রামী রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে বার বার কবিতায় উল্লেখ করে তাঁর কবিতা মৃত্তিকা সংলগ্ন বাহন হয়ে ওঠে এবং মাতৃপ্রেমের অন্তরঙ্গতায় সমাজের কল্যাণ কামনার প্রতি সারাক্ষণ চিন্তার ঐক্যসূত্র নির্মাণ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা মাটির বুকে ছড়িয়ে দিতে চান এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন ফসলি আবাদে দেশের ভাবমূর্তির গৌরবজনক উন্নতির সিঁড়ি গড়ে তোলেন। এভাবেই ঘাতক শকুনি ছোবলের প্রতিশোধ নিতে চান এবং জাতির কলঙ্কিত পর্যায়গুলো ছিঁড়তে চান। এতেই তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের পাওনা পেয়ে যান, মুক্ত হন হতাশাতাড়িত বাঘের আবদ্ধ খাঁচা থেকে। মূলত স্বাধীনতা

যুদ্ধের বড় প্রাপ্তি হলো আবাদ নির্ভর দেশ এবং উন্নয়নকামী চিন্তার যোগসাজস; এই চেতনায় কবি মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়ে পড়েন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. ছিনিয়ে আনা রোদের সমারোহে
মগ্ন হবে রুগ্ন মানুষেরা।
ওরা সবাই শস্যকনা নেবে,
তুমি আমার লাঙল-চেরা মৃত্তিকাকে রেখো।[২৮]

খ. ভরা শস্যের প্রান্তরে যদি মৃত্যু হয় তবে আর দুঃখ কিসে!
জেনে যাবো শেষ হলো বেদনার দিন– ফসল ফলেছে মাঠে,
আমাদের রক্ত শ্রমে পুষ্ট হয়েছে ওই শস্যের প্রতিটি সবুজ কনা।[২৯]

গ. আহা কি মাটির ঘ্রান, সোঁদাঘ্রান- মাটি ও কি ফুল?[৩০]

ঘ. পুনর্বার প্রেম ছোঁবো, ছোঁবো স্বপ্ন মাটির পাঁজর।[৩১]

ঙ. আমার সন্তান এসে যেই গান শোনাবে তোমায়
আমার রক্ত, ঘাম, বেদনা দিয়ে
আমি আজ সেই গান লিখে যাবো মাটির কাগজে।[৩২]

এভাবেই রুদ্র মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চান, প্রয়োজনে আবার বুকের তাজা রক্তে ঢেলে সাজাবেন সবুজের এই স্বপ্নের ঘরঘানি; এই স্বপ্নমাখা প্রত্যাশায় কবিতার অবয়ব গড়ে তোলেন রুদ্র।

॥ ২ ॥

অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে কবি রুদ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন; তাঁর কবিতা ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক। আর ধর্ম বলে যদি কিছু থেকে থাকে, কবির কাছে তা হলো সাম্যবাদ। অবশ্য বার্ট্রান্ড রাসেলও সাম্যবাদকে ধর্মহিসেবে চিহ্নিত করেছেন; যেখানেই তিনি ধর্মের আলোচনা করেছেন সেখানেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি সাম্যবাদকেও ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। সব ধর্মই যেহেতু নিয়ন্ত্রণবাদী, সাম্যবাদও তাই; অতএব সাম্যবাদও একটা ধর্ম। তবে অন্য ধর্মের থেকে সাম্যবাদ একটু আলাদা, আর তা হলো সাম্যবাদে ঈশ্বর নেই।[৩৩] এজন্য রুদ্রের কাছে সাম্যবাদের আকর্ষণ বেশি। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, ধর্মের ব্যবসা, ধর্মের দ্বারা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং ধর্মের শ্লোগান তুলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা– রুদ্রের কাছে অসহনীয়। তাঁর মতে– ধর্মীয় উন্মাদনা পৃথিবীতে

মানুষের মধ্যে বিভেদ এবং শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা পৃথিবীতে শত শত রক্তপাত ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে :

ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শতখণ্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেনীভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।
হা অন্ধতা! হা মুর্খামি! কতোদূর কোথায় ঈশ্বর!
অজানা শক্তির নামে হত্যাযজ্ঞ কতো রক্তপাত,
কতো যে নির্মম ঝড় বয়ে গেলো হাজার বছরে!
কোন্ সেই বেহেস্তের হুর আর তহুরা শরাব?
অন্তহীন যৌনাচারে নিমজ্জিত অনন্ত সময়?
যার লোভে মানুষও হয়ে যায় পশুর অধম![৩৪]

মার্কসের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে 'Opium of the people'.[৩৫] রুদ্রও সেজন্য বলেন 'আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সেতো হেমলক বিষ।' সাম্যবাদ হচ্ছে একটি বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মের ভাবাবেগে তাড়িত হবার সমূহ সম্ভাবনা এখানে নাকোচ হয়ে গেছে। রুশ বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ধর্মকে নির্মূল করার ব্যাপক অভিযান চালাতেও আমরা দেখি। শত শত ধর্মীয় স্থানে তালা ঝুলানো হলো, হাজার হাজার ধর্মীয় নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হলো এবং সাম্যবাদীরা পূর্বাভাসও দিয়েছিলো যে, শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেওয়া হবে। রুদ্রের মতো বস্তুবাদী কবিও ধর্মকে নিছক কল্পনা ও কিংবদন্তীর উপাখ্যান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। তবে স্বৈরাচারী মসনদ প্রিয়দের রুদ্র ঘৃণা করেন, যাঁরা ধর্মকে ব্যবসা করার ক্ষেত্র মনে করেন এবং এর মাধ্যমে ধর্মকে রাষ্ট্রীয়করণ করে জনসমর্থন ও ফায়দা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করেন। সেখানেই রুদ্রের আপত্তি; ধর্ম নিয়ে প্রতারণা করছে শাসক শ্রেণী ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা :

ক. একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিলো আলো,
আজ তার কঙ্কালের হাড় আর পচা মাংশগুলো
ফেরি কোরে ফেরে কিছু স্বার্থান্বেষী ফাউল মানুষ-
সৃষ্টির অজানা অংশ পূর্ন করে গালগল্প দিয়ে।[৩৬]

খ. ধর্মান্ধ পিশাচ আর পরকাল ব্যবসায়ি রূপে
ক্রমশ উঠশে ফুটে ক্ষয়রোগ, রোগের প্রকোপ।[৩৭]

গ. দেখা যায় জীবনের বাঁকে বাঁকে নানান রঙের
সাজানো উজ্জ্বল সব প্রতারনা, ভুল ব্যাকরন।
এইখানে বিরোধী ও মসনদী একই সাপের দুই মুখ ॥[৩৮]

মার্কস বলেছিলেন ধর্ম হলো 'গরীব বা জনগণের আফিম'। ধার্মিকেরা এতে মর্মাহত হলেন। ধার্মিকেরা বলে থাকেন যে, বিধাতাই মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল, যার কিছু নেই, তাঁর বিধাতা আছেন। মার্কসের কথাও ঠিক যে, গরিবদের শেষ সম্বল আফিম। অসহায় এবং নিরর্থক অবস্থাতেই এক সময় মানুষ আফিম বা নেশা গ্রহণ করতো, আজকে যেমন মাদক গ্রহণ করছে।

গরিবদের জন্য শেষ সম্বল আফিম বা নেশা জাতীয় দ্রব্য; তেমনি গরীবদের সাথেও বিধাতার রয়েছে গভীর সম্পর্ক; তাঁকে পেতে হলেও অর্থের দরকার হয় না। বাংলাদেশেও বর্তমানে তাই হচ্ছে; ধনীরা ধর্মকে ব্যবহার করে আরো ধনী হচ্ছে, আর গরীবরা জন্ম দিচ্ছে দারিদ্র্যকে। কাজেই দারিদ্র্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসীর ফসল; দারিদ্র্য সম্পদের অভাবে ঘটেনা কোনো দিন, ঘটে রাষ্ট্রীয় অব্যবহারের জন্য। এ কথাটাই মার্কস বোঝাতে চাইলেন। বিত্তশালীরা ধর্ম মানে না, করুণাময়ের দানে গরীবরা সন্তুষ্ট থাকে, এই পাড়ে যার দশখানা পাজেরো আছে, তার ঐ পাড়ের দরকার নেই। গরীবদের ইহকালের কষ্ট-কাঠিন্যকে তারা লোভনীয় করে তোলে পরকালের আশ্বাসবানীতে, হুর-গেলেবানের লোভে তাই– আফিমখোরের মতো গরীবরা পড়ে থাকে দারিদ্র্যের সাথে প্রীতি করে, সখ্যতা করে। এক সময় সব বিধাতার ঘাড়ে চাপিয়ে নির্বোধের মতো দারিদ্র্যের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। রুদ্রের "পারলৌকিক মূলো" কবিতার থিম এমনই। যেমন, কবিতার শেষাংশ :

বিশ্বাস করো, তর্ক করোনা, তা হলেই হবে সব,
ষোড়শী তরুনী, তহুরা, শরাব, আরো যতো আশনাই।
সব পাবে শুধু বিশ্বাস কোরে অন্ধ বানাও চোখ,
ইহকাল হোক ঝরঝরে পরকালে পুরোপুরি।

এখানে কষ্ট, অনাহার আর অন্যায়ে ঠাসা দিন,
এসবই মায়া, দুদিনের ঘর, দুদিনের মুসাফিরি।
দুনিয়াদারির ভুলে যাও সব, মুছে দাও লেখাজোখা,
দুনিয়া মিথ্যা, পরকাল হলো সবচেয়ে বেশি খাঁটি।

বিশ্বাস করো, দেখছোনা সবি মিথ্যা এবং ফাঁকা,
যা কিছু দ্যাখোনি সত্যি সেসব বিশ্বাস করো- চুপ্ !
এই বিশ্বাসে চোখ দুটো খুলে ছুঁড়ে দাও ইহকালে,
আর মগজের সচেতন কোষে তালাচাবি এঁটে দাও।
এই তো শাবাস! এখনি তুমি প্রকৃত ঈমানদার ॥[৩৯]

ধর্মীয়বোধ ব্যক্তি মানসের অগ্রসর চিন্তার পরিপন্থী এবং ব্যক্তির স্বাজাত্যবোধ ও সচেতন আত্মার অপমৃত্যু ঘটায়। রুদ্র সাম্যবাদী বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীরিক্ষণ করতে চান যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ব্যতীত আর কোন জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা লব্ধ বাহ্য জগৎ ছাড়া অলৌকিক- উর্দ্ধজগতের কোনো অতি প্রাকৃত জ্ঞানে বিশ্বাসী নন তিনি এবং তা মানতে নারাজ। ধর্মীয় বিধির বিধান, শাস্তির কঠোরতা, অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই, অদৃশের নিয়তিগুলো সাধারণ মানসে এমনই বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করে যে, তারা সে বিশ্বাস কোনো দিন ভাঙতে পারে না; ফলে শূদ্র হওয়াকে দরিদ্র হওয়াকে, ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত করে তারা; এই বিশ্বাসেই স্বর্গীয় পরপারের সুখের আশায় আত্মহারা হয়। রুদ্র 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' কাব্যনাট্যে গৌরবের মাধ্যমে সে কথাই বলতে চান :

থামো, পেড়োনা ধর্মের দোহাই, ওসব জানা আছে।
ধর্ম হলো নিগূঢ় আফিম, মানুষের বোধবুদ্ধি
ভোঁতা কোরে রাখে। মানুষ বিশ্বাসে তাই বুঁদ হয়ে
ভুলে যায় পৃথিবীর নিয়মকানুন, রীতি-নীতি।[৪০]

রুদ্রের মতে ধর্ম অলৌকিক নয়, ধর্ম লৌকিক; লোকাচার ও মানুষের প্রণীত আফিম- কল্পনা, মিথ্যাচার ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ, একে অন্যের প্রতি হিংসা জাগিয়ে তোলে ধর্ম। বিভ্রান্ত কল্পনার অবসানে চাই বিকশিত কল্পনা। সেজন্য অসাম্প্রদায়িক সাম্য সমাজে যদি সত্য কিছু থাকে তা হলো, শ্রমিকের তাজা ঘাম; এই শ্রমই সভ্যতার বিকাশের মূলে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে, কোন ধর্মীয় জ্বীন এসে গড়েনি কোনো প্রাচীর :

পিরামিড তবে কোন জ্বীনদের কাজের নিদর্শন?
অথবা কুতুব, চিনের দেয়াল কিংবা তাজমহল?
কোন জ্বীন এসে তৈরী করেছে বুড়িগঙ্গার সেতু?
পৃথিবীর সব নির্মানে মাখা শ্রমিকের তাজা ঘাম,
মানুষের মেধা, পেশীর সাহসে এই সভ্যতা গড়া।[৪১]

ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ সৃষ্টির জন্য তাই রুদ্র সমতার বীজ বপন করেন; যেখানে ধর্মীয় দেয়াল এবং শ্রেণীর ভেদাভেদ থাকবে না। পৃথিবীতে ক্ষুধা সত্য, শ্রম সত্য এবং সমতার গান সত্য :

আর কোন দোজখ বা আছে এর চেয়ে ভয়াবহ?
ক্ষুধার আগুন সে-কি হাবিয়ার চেয়ে খুব কম?
সে-কি রৌরবের চেয়ে নম্র কোনো নরোম আগুন?
ইহকাল ভুলে যারা পরকালে মত্ত হয়ে আছে,
চলে যাক তারা সব পরপারে বেহেস্তে তাদের।
আমরা থাকবো এই পৃথিবীর মাটি জলে নীলে,
দ্বন্দ্বময় সভ্যতার গতিশীল স্রোতের ধারায়
আগামির স্বপ্নে মুগ্ধ বুনে যাবো সমতার বীজ।[৪২]

কবির মতে, ধর্মীয় প্রেরণা মানুষকে অমানবিক করে তোলে, এজন্য সমাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়; এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ অবলীলায় অপমানিত করে, পদদলিত করে, ধর্মের ধ্বজা উর্ধ্বে তোলার জন্য এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর পৈশাচিক আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে মর্তের মাটি। যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে এই ভ্রাতৃঘাতি হত্যা। ধর্মের সন্তরা চুটিয়ে উপভোগ করেছে এই হত্যাকাণ্ড, উসকিয়ে দিয়েছে সাধারণ অশিক্ষিত বর্বর মানুষদের, যারা ধর্মের নেশায় হয়েছে উন্মত্ত। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রেক্ষাপট কবি টেনে আনেন কবিতার পঙক্তিতে; বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারকে মূর্ত করেন :

সহসাই দেখি মন্দির ঘিরে আছে
টুপিয়ালা মাথা অজস্র মারমুখি,
আল্লাহর নামে ভাঙচুরে লেগে গেছে।
আর ভীত টিকি সোজা ভগবান মুখি–

উভয়ে তো বেশ শান্তির কথা বলে,
পুরান কেতাবে দেখেছি সে সব পড়ে।
এখন দেখছি ঘন ঘোর কুতুহলে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্যের ঘাড়ে।

বস্তু দেখছি– মিলিয়েছে বিশ্বাসে,
রক্তারক্তি লুটপাট সোনাদানা।

তর্ককারিরা দূরে বোসে মৃদু হাসে,
বিশ্বাসকারি- দেবালয়ে দেয় হানা।

দেখে ধর্মের পুত- খোমা- মোবারক,
দূরে সরে আছি হয়ে এক ধ্যানি বক ॥[৪৩]

রুদ্র দেখেন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অলৌকিক জগতকে সম্বল করে মুখোশধারীরা অন্য ধর্মের প্রতি নির্মম হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিকে নির্মূল করতে পৃথিবীতে প্রপঞ্চরাশিকে উদ্ভাবন করে চলেছেন। এজন্য তারা আকাশ মণ্ডল দেবতার দ্বারা ভরে চলেছেন; পাশের বস্তির নিরন্ন মানুষের প্রতি তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই; রুদ্র এই বেড়াজাল ছিন্ন করতে চান :

খুলে ফ্যালো আলখেল্লার অস্বস্তি
প্রপিতামহের প্রথা বিপরীত সরলতা।
বুলডোজারের নিচে সমাহিত বস্তি,
কংক্রিটে ফোটে মানব-স্বভাবি তরুলতা।[৪৪]

রুদ্রের কবিতা সনাতন পিতা-প্রপিতামহের বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতে চায়, অবাস্তব কল্পনাকে হত্যা করে রুদ্র একসময় ফেরারি হন ধর্ম-সংসার থেকে, কাল্পনিক চিন্তা-চেতনা থেকে :

সামনে দাঁড়ায় ঘোর সংসারে বাবার মৃত জায়নামাজ
যার উষ্ণ অস্তিত্বে একদিন কিছু পৈত্রিক পুন্য প্রার্থনা
শূন্যের দিকে পাখা মেলে উড়তো শাদা পারাবত-
ওই সব পুন্য প্রার্থনার নির্বোধ বাসনারা আমার রক্তের ভূমিতে
বৃক্ষের বীজ বুনে বিস্তৃত হোতে চেয়েছিলো শিকড়ে পাতায়
অথচ আমার ভেতরে বাবাকে হত্যা কোরে আমি এক অনন্ত ফেরারী।[৪৫]

ধর্মীয় বেড়াজাল এবং সামাজিক সুচিবায়ু শৃঙ্খল ভাঙতে রুদ্র নিজেকে জারজ বলতেও দ্বিধা করেন না :

ক. আজীবন বেশ্যাবৃত্তি করে
যে মাতা হারিয়েছে সর্বস্ব
যে মাতার সতীত্ব গ্যাছে
ইংরেজী ট্রাউজারের পকেটে
আমি তারই জারজ

আমার কী দেখতে চাও
আমার কী জানতে চাও।[৪৬]

খ. আমি ঠিকানাহীন পতিতার জারজ সন্তান-
হয়তো মা বলে ভাবি তাই পৃথিবীটাকে,[৪৭]

যে ঈশ্বর অনাহারী মানুষের প্রতিকার করতে পারেন না, ক্রুসেড ও আসউইচের মতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়ে যে ঈশ্বর লাখো লাখো মানুষের মৃত্যু ঘটান; তিনি কিভাবে মানবের কল্যাণকারী এবং হিতকারী করুনাময় হওয়ার যোগ্যতা রাখেন? এমন ঈশ্বরকে রুদ্র পাপাচারী শয়তান এবং মুখোশধারী বলে প্রত্যাখান করেছেন। যেমন, "ঈশ্বর তুমি পাপী" কবিতায় :

ঈশ্বর তুমি পাপাচারী শয়তান
অনাথের শেষ সম্বল কেঁড়ে নিয়ে
তুমি মদের পেয়ালায় রক্ত ঢালো
প্রাসাদের স্বপ্ন-চূড়ায় নির্বিঘ্নে
পান কর; চোখে রক্তনেশা মেখে।
তুমি নাকি ভগবান!
কল্যানময়; মানবের হিতাকাংখী!
করুনাময় বিশ্বের অধীশ্বর!
এর কৈফিয়ত কে দেবে ঈশ্বর?
কেন, কেন আজ এখনও
কাঙাল অনাহারী বুকের উপর
সোনার তাজমহল গড়ে ওঠে?[৪৮]

ঈশ্বরের পৃথিবীতে একদিকে প্রাচুর্যের অহমিকা, আর অন্যদিকে অনাহার ক্লিষ্ঠ মানুষের শ্রম– এই বৈষম্য যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, রুদ্র তার উপাসনা করতে নারাজ। ভোজনে মত্ত থাকে নিকৃষ্ট জীব কুকুর আর উৎকৃষ্ট প্রাণী মানুষ থাকে অনাহারে, এমন ঈশ্বরী লীলাকে রুদ্র বলেন মুখোশধারী :

শয়তান অন্যায়ী আর কেউই নয়–
সে তুমি– মুখোশধারী ঈশ্বর!
তাই এবার আকাশ স্বর্গ থেকে তোমায়

পথে নামিয়ে ছিঁড়ে খাব
তোমার বিলাসিত দেহ।[৪৯]

ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্মের জিগির তোলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এবং সন্ত্রাসবাদে সহায়তা করা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি– একাত্তরের বাংলার গণহত্যায়। ধর্ম নিরপেক্ষবাদী রুদ্র বার বার অন্তর থেকে ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি– রাজাকার, আলবদর ও আশ্ শামস বাহিনীর উপর। যারা পাক বাহিনীর সহায়তায় এদেশকে নরককুন্ডু বানিয়েছে এবং ধর্মীয় চাতুরতায় গণহত্যা চালিয়েছে। দেশের বিজয়ী মিছিলে এই বিশ্বাসঘাতক চক্রকে মিশে যেতে দেখে রুদ্র শঙ্কিত এবং বিস্মিত হন। ঘাতকরা লেবাস পাল্টিয়ে আবার বোকা বানাতে চায় বাঙালি বীর সন্তানদের। রুদ্র মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রেক্ষাপট অবলম্বনে যে কাব্যনাট্য 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' রচনা করেন; তাতে গৌরব ও রাখাল চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এভাবে :

গৌরব ঃ কাজ শেষ! সবেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে স্বদেশ,
এখনো রয়েছে বাকি প্রকৃত যুদ্ধের সবটুকু,
আসল যুদ্ধের শেষ সত্যি সত্যি হয়নি এখনো।
দালাল, বদর, রাজাকার, লেবাস পাল্টেছে তারা,
অনেকেই মিশে গেছে বিজয়ের বিপুল মিছিলে।

রাখাল ঃ তাদের খুঁজতে হবে, উপড়াতে হবে বিষ-দাঁত,
ঘৃন্য বিষবৃক্ষের একটি কুটিল চারাও যেন
অগোচরে না থাকে বাংলার ঘিঞ্জি আনাচে কানাচে,
না পারে থাকতে যেন একটিও পা-চাটা কুকুর।[৫০]

রুদ্রের সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজে ধর্মীয় মৌলবাদী জঞ্জাল রাখতে তিনি চান না। কেননা, একাত্তরের ভয়াল রণাঙ্গনে এ বিশ্বাসঘাতক চক্র বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে; তাদের ঘাতক কৃপাণে খুন হয়েছে সেরা বাঙালিরা। যাঁরা ইতিহাসের জোয়াল অফ আর্ক, জিওনার্দো ব্রুনো এবং ভানিনির মতো ধর্মীয় বলি হয়েছে বাংলার মাটিতে। সাধারণ ক্ষমা পেয়ে এই ঘাতক শক্তিকে আবার বাংলার জমিনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখে রুদ্র শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক ছত্রছায়ায় এই ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানে রুদ্রের মতো ধর্মনিরপেক্ষ-প্রগতিশীল শক্তি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েন। রুদ্রের কবিতায় তাদের প্রতি– ঘৃণা ও ধিক্কার ঘোষিত হলো, উচ্চকিত হলো রুদ্রের কণ্ঠসর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. এ-যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা– একি তবে নষ্ট জন্ম?
এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?
জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরানো শকুন।[৫১]

খ. কতিপয় রক্তপায়ী জীব
কতিপয় জন্মভুক প্রানী
রক্তের উৎসব খ্যালে আমাদের প্রানের উঠোনে।[৫২]

গ. বাজ-পোড়া তরু ঘরের দুয়োরে,
কুকুরে শকুনে টেনে ছিঁড়ে খায় মায়ের শরীর এই জনপদে,
ঠেকাতে পারিনা- কণ্ঠ বাহুতে ঝুলে আছে তালা রাজার এনাম।
আমার পরান প্রিয় এই চর, এই শস্যের মাটি,
ওরা চায় তাকে মরুভূমি আর শ্মশান বানাতে,
তমাল শিরীষ কেটে তাই ওরা বুনেছে খোরমা তরু
এই পলিমাটি চরে।[৫৩]

আন্দোলনের সমস্ত তাজা রক্ত পায়ে ডলে স্বৈরশাসক যখন মসনদের মোহে– লোভাতুর হয়ে ধর্মকে হাতিয়ারে পরিণত করেন এবং ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, রুদ্র তখন এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান :

তোমাকে এখন প্রতারক বলতে চাইনা,
তোমাকে বলতে চাই ক্লেদ, সাম্প্রদায়িক শকুন–
যারা মুখে ধর্ম আর মহান শান্তির কথা বলে
অথচ সমস্ত কাজ করে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে।[৫৪]

এভাবে রুদ্র ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাচীর ভেঙে সাম্য সমাজ গড়নে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম নিরপেক্ষতার বীজ বপন করতে চান বাংলার উষর জমিনে। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার কালো শকুনি থাবা থাকবে না; থাকবেনা শ্রেণী কোনো বৈষম্যের দেয়াল।

তথ্য নির্দেশ

১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৩", অসীম সাহা (সম্পাদিত) রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৬৭। এখন থেকে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র স্থলে 'ঐ' এবং 'অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র'-এর স্থলে 'ঐ' সংকেত ব্যবহার করা হবে।

২. তদেব, পৃ. ৬৭।

৩. ঐ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

৪. ঐ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", ঐ, পৃ. ১৯।

৫. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, পৃ. ৩৮।

৬. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২খ, পৃ. ১০১।

৭. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২খ, পৃ. ১০০।

৮. তদেব, পৃ. ১০৬।

৯. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, পৃ. ৩৯।

১০. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।

১১. বিস্তারিত: মোঃ আবুল মোহাইমেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, 'তারকালোক', ঈদ সংখ্যা ১৯৮৯, পৃ. ৩৩-৩৪।

১২. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, পৃ. ৩৯।

১৩. ঐ, "মিছিলে নোতুন মুখ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১৪. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ১১", ঐ, পৃ. ৬৯।

১৫. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, পৃ. ৯০।

১৬. ঐ, "হে আমার বিষন্ন সুন্দর", ঐ, পৃ. ৫৬।

১৭. ঐ, "নক্ষত্রের ধুলো", ঐ, পৃ. ৫৭।

১৮. ঐ, "নক্ষত্রের ধুলো", ঐ, পৃ. ৫৮।

১৯. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৭", ঐ, পৃ. ৬৮।

২০. ঐ, "ইশতেহার", ঐ, পৃ. ১৬০।

২১. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২০", ঐ, ১১৬।

২২. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২২", ঐ, পৃ. ১১৭-১৮।

২৩. ঐ, ঐ, পৃ. ১১৮।

২৪. ঐ, "ক্রুশবিদ্ধ যীশু আমার বুকে", ঐ, ২খ, পৃ. ১৫৭-৫৮।

২৫. ঐ, "গন্ধ পাই", ঐ, ২খ, পৃ. ১৭৪-৭৫।

২৬. ঐ, "মুখোমুখি", ঐ, পৃ. ১৭০-৭১।

২৭. ঐ, "আশ্রয়", ঐ, ২খ, পৃ. ১২৫।

২৮. ঐ, "ফসলের কাফন", ঐ, পৃ. ৪৭।

২৯. ঐ, "খামার", ঐ, পৃ. ৯২।

৩০. ঐ, "বৈশাখি ছেনাল রোদ", ঐ, পৃ. ৯৪।

৩১. ঐ, "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন- ৮", ঐ, পৃ. ৮৪।

৩২. ঐ, "ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা", ঐ, ২খ, পৃ. ৬৩।

৩৩. হুমায়ুন আজাদ, আমার অবিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২৯।

৩৪. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৩৫. মার্কস (উদ্ধৃত), মুহাম্মদ আব্দুর রহীমের 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', ই.ফা প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ৯১।

৩৬. তদেব, পৃ. ৬৩।

৩৭. তদেব, পৃ. ৬৩।

৩৮. ঐ, "একই সাপের দুই মুখ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪।

৩৯. ঐ, "পারলৌকিক মূলো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫।

৪০. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫।

৪১. ঐ, "বাগের হাট", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

৪২. ঐ, "ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

৪৩. ঐ, 'খুটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা- ১৩', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯।

৪৪. ঐ, ঐ-১৪, পৃ. ১১৯।

৪৫. ঐ, "পিতার নীল নকশা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

৪৬. ঐ, "আমি ধর্ষিতা মায়ের জারজ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

৪৭. ঐ, "আমিই ব্যতিক্রম একমাত্র", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭।

৪৮. ঐ, "ঈশ্বর তুমি পাপী", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৩৮।

৪৯. তদেব, পৃ. ২৩৮।

৫০. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪।

৫১. ঐ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", ঐ, পৃ. ১৯।

৫২. ঐ, "বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা", ঐ, পৃ. ৮১।

৫৩. ঐ, "বিশ্বাসের হাতিয়ার", ঐ, পৃ. ৬৩।

৫৪. ঐ, "প্রতিবাদপত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮৩", ঐ, পৃ. ১৬৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় নির্মাণশৈলী

কবি তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, মেধা-মনন, শ্রম-প্রজ্ঞা এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশের জন্য ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আর এই ভাষা প্রকাশের নেপথ্যে থাকে শব্দরাজি; যে শব্দ কবির প্রকাশে হয়ে ওঠার গভীর ব্যঞ্জনাময় এবং তার প্রয়োগ নৈপুণ্যে তা হতে পারে সমুজ্জ্বল দ্যুতিময়। আবার অন্য দিকে ব্যক্তি মানসের একান্ত অনুভূতিগুলো চিরকাল এক থাকেনা; সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, চাওয়া-পাওয়া এবং আকাঙ্খারও পরিবর্তন ঘটে; তাই ভাষা ও মানবিক বোধেরও ভিন্নতা দেখা দেয় কবিতার শরীরে; এভাবে ভাষা ও শব্দের রূপ প্রতিনিয়ত পাল্টাতে থাকে। তিরিশের আধুনিক কবিদের হাতে বাংলা কবিতা বাঙালিত্ব অর্জনের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যকেও এক সময় অগ্রাহ্য করেছিলো। নতুন দর্শন হিসেবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করে কেউ কেউ সামন্তবাদ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি ব্যাখ্যার সহায়তায় ধর্মকে তুরীয়বাদ আখ্যা দিয়ে তরুণ লেখকদের মধ্যে সমাজ চেতন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এ জন্য তাঁরা মানুষের নিত্য ব্যবহৃত সংলাপধর্মী গদ্য কবিতার আশ্রয় নিয়ে জীবনের চলমানতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। অবশ্য এ ব্যপারে তাঁরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছিলেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও, 'পুনশ্চ' (১৯৩২) এবং 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যে সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে তিরিশি কবিদের প্রেরণা জাগিয়েছিলেন।

এভাবে এক সময় কবিতার ভাষা রূপ পেল জঙ্গমতার। শব্দ-সচেতনতাবোধ ও প্রচলিত বাক্‌ভঙ্গির অনন্য প্রকাশে কবিতা ব্রাত্য জীবনের ঘনিষ্টতা লাভ করলো। বিষ্ণুদে'র ভাষায়: 'আমাদের চৈতন্যে বাধ্যতই এসে পড়েছিল সঙ্কটবোধ– বৃহত্তর অর্থে ব্যক্তিগত এবং সেইহেতু সামাজিকও বটে, এবং বাধ্যতই এল সদা চলমান সঙ্কট উত্তরণের বা সমাধানের দ্বৈতাদ্বৈত দ্বান্দ্বিক ন্যায়তত্ত্ব'।[১] এর ফলেই তাঁদের মধ্যে অধিক মাত্রায় অস্তি-বোধের সঞ্চার ঘটলো। কেউ কেউ ঈশ্বরকে গালি দেওয়াকে আবার কারো মধ্যে চলিত বাংলা ব্যবহার করা– বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী থেকে উপমা সংগ্রহ করা বা সাধারণ শহুরে জীবনের বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরা আধুনিকতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে লাগলো। মেহনতি জনতার প্রতি তীব্র আসক্তি ঘোষিত হতে থাকলো বাংলা কবিতায়। কবিতার শব্দপুঞ্জ জাগাতে চাইলো মুক্তির প্রেরণা এবং বিপুল সম্ভাবনা। উচ্চকিত মানবিক বোধের উন্মোচন ঘটাতে কবিতার ভাষা বিশেষ তাৎপর্যশীল হয়ে ওঠে। আনন্দ আর যন্ত্রণার মিলনস্রোতে কবিতা চায় দ্বিতীয় আরেকটি পৃথিবী গড়তে।

সত্তরে এসে বাংলাদেশের কবিতা জোয়ারের নতুন পানির মতো স্বাধীনতার আস্বাদ শব্দের অভ্যন্তরে জীবনরসে সিক্ত হতে সচেষ্ট হয়। তখন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের পুরোটাই আমাদের তরুণ কবিরা দখল করে নেন। মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত অভিঘাতে কবিতায় এলো শ্লোগানচারিতা; আর তা এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গণজীবনের দুর্দশা এবং শোষণ-নিপীড়নকে কেন্দ্র করেই। কবিরা সরাসরি কবিতার শরীরে লেপন করলেন রাজনৈতিক ভাষ্য, জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য তাঁর কবিতার শৈল্পিক কারুকার্যকে করলেন অস্বীকার এবং কবিতার অবয়ব গড়লেন তীব্র সাংঘর্ষিক ভাষা ব্যঞ্জনার দ্বারা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এই সময়েরই কবি, সমাজ-রাজনীতির অস্থির সময়ের উত্তাপই তাঁর কবিতার মূল সুর। সময়ের দাবি মেটাতে কবিতাকে গণ মানুষের কাছাকাছি এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন করতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সস্তা গণ কবিতার রাস্তা ধরলেন। মধ্য সত্তর ও আশির দশকের রাজনৈতিক সস্তা গণ কবিতার ভাষ্যে বিস্মিত হয়ে অনেকের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, ইচ্ছে মতো পাশাপাশি কিছু শব্দ উপরে নিচে বসিয়ে দিলেই কবিতা হয়ে যায়। কবিতা সম্পর্কে এমন ধারনা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। আবার শব্দের বাহার দেখিয়েই কবিতার কাজ শেষ হয়না; শব্দের ব্যবহার গল্প-উপন্যাসেও বিদ্যমান; সে জন্য স্বেদ নিঃসৃত শব্দগুচ্ছও অনেক সময় কবিতা হয়না। কবিতার জন্য মেধা ও কল্পনার দরকার, শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ও কারুকার্যের দরকার; কবিতার আত্মা গড়ে ওঠে শব্দ-ছন্দ-চরণ-গড়ন-চিত্রকল্প-মিল-অনুপ্রাস, ছেদ-যতি ও উপমা উৎপ্রেক্ষার সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে। সেটা সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ নির্ভর হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু কবি যখন কবিতায় রাজনৈতিক মুখপাত্রের ভূমিকা নেন, সমগ্র জনমণ্ডলির সংবাদ প্রতিবেদক হন; তখন আর তা কবিতা হয়ে ওঠে না, তা হয়ে যায় মামুলি বাজনৈতিক ভাষ্য।

সমকালীন সমাজ-রাজনীতি কবিতায় থাকবেই, কেননা এর সাথে মানব সত্তার বিবেক এবং সংগ্রামশীলতা জড়িত রয়েছে। যাঁরা মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত, যাঁরা সামাজিক পরিবর্তনে সদা চিন্তাশীল; তাঁদের কবিতার শব্দে-চরণে বিপ্লব ও সংগ্রামের দ্যুতি প্রবাহিত হবেই। তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। বাংলাদেশের কবিতায় এই জাতীয় সঙ্কট শুরু থেকেই ছিলো এবং ভবিষ্যতেও যে থাকবে, তা বোঝাই যাচ্ছে। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠবে ভাষা কাঠামো এবং শব্দের গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর কবিতায় সড়কি, বল্লম, রাইফেল, ককটেল, বুলেট, গ্রেনেট, বেয়নেট, ট্যাঙ্ক, হরতাল, গেরিলা, শহীদ-মিনার, দালাল শব্দগুলো বার বার এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশাত্মবোধক চেতনায় হয়েছে সম্পৃক্ত; ভাষা হয়ে উঠলো তেজী এবং ক্ষিপ্রতা সম্পন্ন; ব্রাত্য জীবন ভাষ্যে শব্দের অভিজাত্যের প্রকাশ পেতে থাকলো কারো কারো কবিতায়। আবার কারো কবিতা হলো শূন্য শ্লোগান এবং সংবাদ প্রতিবেদনধর্মী।

সময়ের দাবি মেটাতে এবং গণমানুষের বোধ স্পর্শ করতে গিয়ে রুদ্রের অনেক কবিতা মঞ্চ সফল হলেও এগুলোর তেমন শৈল্পিক মূল্য নেই। আশির দশকের স্বৈরাচারী অপশাসন-শোষণের বলি নূর হোসেন, ডাঃ মিলন, শাহজাহান সিরাজদের রক্তে কবিতার দেহ হয়েছে আরক্তিম। গণজীবন ও গণমানুষের এই বিপর্যয় কবিকে অস্থির ও নৈরাজ্যিক অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে; শৈল্পিক সুষমা ও কারুকার্যতা তাঁর কাছে তখন আশা করা বৃথা। রুদ্র নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, তাই শব্দের এই নির্বিচার ব্যবহার কেন? তার জবাবও তিনি দিতে চেয়েছেন তাঁর কবিতার ভাষাতেই। যেমন: "শব্দ শ্রমিক" কবিতায় এর কৈফিয়ত বর্তমান :

আমি কবি নই শব্দ শ্রমিক।
শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,
হৃদয়ের কালো বেদনায়।
করি পাথরের মতো চূর্ন,
ছিঁড়ি পরান সে ভুলে পূর্ন।
রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,
হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।
ভাষা-সৈনিক আমি জানি শুধু যুদ্ধ,
আমার সমুখে আলোর দরোজা রুদ্ধ
তাই বারুদে সাজাই কোমল বর্নমালা,
তাই শব্দে শানিত আনবিক বিষ-জ্বালা
ধূর্জটি-জটা পেতে রোধ করি অবক্ষয়ের সংশয়,
আমার এ- হাতে শব্দ কাস্তে ঝলসায়।[২]

কবির অভিপ্রায় এখানে শব্দের গাঁথুনি নয়, অর্থের ব্যঞ্জনা কিংবা ভাষার নিটল বিন্যাসও নয়; সাধারণ মানুষের চেতনাজাত এবং গণজীবনের অবক্ষয় ও সংশয় দূর করা কবির উদ্দেশ্য। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের সমার্থক হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয় তাঁর কবিতার ভাষা। গাঢ় এবং পিনবদ্ধ শব্দের কারুকার্য তাই অবসিত হয় কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য গতিশীলতায়; গণমানুষের প্রতীক "কাস্তে" তাই অধিকারবোধে হয় উচ্চকিত; সেই কাস্তে অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধে সারাক্ষণ ঝলসাতে থাকে; তাই কবি স্নিগ্ধ-কোমলতাকে পরিহার করে বারুদে সাজাতে চান কোমল কর্ণমালাকে; যা প্রতিবাদের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং গণজীবনের অঙ্গাঙ্গি নিবিড় প্রত্যয়ে হয় আশাবাদী। কবিতার শেষ দু'টি পঙক্তির মাধ্যে তা আরো পরিস্কারভাবে ঘোষিত হয় :

বুকের ভাষাকে সাজিয়ে রনের সজ্জায়,
আমি বুনে দিই শব্দ-প্রেরনা মানুষের লোহু মজ্জায় ॥[৩]

সেখানে রণ-দামামা, বুভুক্ষ মানুষের পাজর ঝাঁঝরা হয়; খেদের জ্বালায় মানব সন্তান ডাস্টবিনের নোংরা ঘাটে; সেখানে কবিতার ঝলমলে পোষাক আর রোমান্টিক বিলাসিতা বেমানান। রুদ্র তাই কবিতাকে সাধারণের উপযোগী করে রাস্তার মানুষের কাছাকাছি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। কেননা, কবিতা এখন স্বৈরাচারী পাপাচার শাসকের অবসান চায়; তাই কবিতার ভাষা থেকে ফুল, স্নিগ্ধতা, কোমল ও রমণীয় প্লেবতা বিতাড়িত হয়। কবিতা এখন সময়ের উত্তাল স্রোতে শ্রমিকের কণ্ঠসর হয়ে বাজে; রুদ্র সেই প্রসঙ্গঁও উথাপন করেন তাঁর কবিতার চরণে, অনেকটা কৈফিয়তের মতো করে :

কবিতা এখন কি-যে হাবিজাবি ভাষা,
নোংরা মানুষ ও নোংরা কথার ঢেউ
ভাসিয়ে নিয়েছে যাবতীয় সুবচন।
কবিতা এখন মিছিলের সাথে চলে।
কবিতা এখন ক্ষুধার্ত সারাদিন,
কবিতা এখন মলিন বস্ত্র দেহে,
কবিতা এখন প্লাটফর্মের ভিড়ে,
অনিশ্চয়তা রাত্রির মতো কালো।
কবিতা এখন মিছিলে ক্ষুব্ধ হাত,
স্বৈরশাসন বিরোধী প্রথম ভাষা।
কবিতা এখন ট্রাকে চাপা দেয়া লাশ,
রক্তমগজ পেষা মাংশের থুপ।
… … … … … … …
এখন কবিতা খাপখোলা তলোয়ার,
এখন কবিতা মেদহীন ঋজুদেহ।
কবিতা এখন স্বপ্নের প্ররোচনা,
কবিতা এখন বিশ্বাসী হাতিয়ার ॥[৪]

আশির দশকের বাংলাদেশের কবিতা বিভিন্ন ইজমে আক্রান্ত; এ দেশের তরুণ কবিরা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে চলমান জীবনের পরিবর্তন চেয়েছেন; কেউ নেতিবাদে, কেউ ইতিবাদে, কেউ সাম্যবাদে; আবার কেউ আত্মসঙ্কটে নিমজ্জিত হয়ে শুধু হাহাকার করেছেন। রুদ্র সাম্যবাদী এবং নিরাশার জাল ছিন্ন করে, হতাশার মূলোৎপাটন করে সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি আশাবাদী কবি। সে জন্য তাঁর কবিতার ভাষায় বিদ্রোহ এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য আজীবন সংগ্রামশীলতা বর্তমান। এমন কি জন্মের ভেতরেও তাঁর বিক্ষোভগুলো,

বাসনাগুলো উচ্ছ্বাসিত হয়; পৃথিবী থেকে করুণ অধ্যায়গুলো বিতাড়িত করতে চায়। যেমন, "আজীবন জন্মের ঘ্রানে" কবিতার শেষাংশ :

জন্মের গন্ধের কথা মনে হলে শরীরে তাকাই,
আজো এক ঘ্রান আছে- আজো এক অক্ষম বিক্ষোভ
শোনিতের অভ্যন্তরে, জন্মের প্রথম চিৎকারের মতো
অক্ষম হাত-পা ছুঁড়ে আজো সে তছনছ করে শুধু নিজের বাসনাগুলো,
ডেটলের শিশি- সাদা তুলো- পৃথিবীর রক্তমাখা করুন কাপড়।[৫]

সেজন্য রুদ্রের কবিতার ভাষা সমাজ পরিবর্তনে গণমানুষের বিশ্বাসী হাতিয়ারে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ও জনপ্রিয়তা– বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাঁর কবিতার ভাষায়। আর এজন্য জনতার দাবিকেই রুদ্র গ্রাহ্য করেন এবং মূর্ত করে তোলেন নিজের বাসনাকে। কবিতার ভাষা হয়ে যায় হালকা চালের এবং অতিকথন প্রবণতা নির্ভর। জনতা চায় গদ্য কবিতা, খাদ্য এবং মাটির নিকটবর্তী মানুষের আকাঙ্খার প্রতিফলন; রুদ্র তাই রবীন্দ্রনাথের গাম্ভীর্য এবং রোমান্টিকতা পরিহার করে সুকান্তের নিকটতম ভাবানুষঙ্গী কবি বনে যান। যেমন, "কবিতার নির্বাসন চাই" কবিতার শেষাংশে এ ঘোষণা বর্তমান :

জনতার শ্লোগান তাই গদ্য চাই অথবা
গদ্যের মতো মাটির কাছাকাছি কবিতা
কাজেই রবীন্দ্রনাথ নির্বাসনে যাও
সুকান্ত ফিরে এসো পুনর্বার।

কবিতারা নির্বাসনে যাও
কবিরা গদ্য লিখুন গদ্য কবিতা
কবিতায় জীবন চাই খাদ্যাভাব
সঠিক মনন ও মানুষ, ছায়া নয়-

নচেৎ তুমুল চিৎকারে বলি
কবিতার নির্বাসন চাই
আমরন-নির্বাসন নির্বাসন।[৬]

তিরিশি অনুকরণ এবং কবিতার ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে রুদ্র সচেষ্ট থাকেন। সামাজিক হলাহলে ক্ষুব্ধ কবি, চলমান জীবনের কুশাসনে দীর্ণ হতে থাকেন; আর তখন মাটি ও মানুষের সংশ্রবে ফিরে আসেন

কবি, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাতে থাকেন, এভাবে কল্পনার শিশু গাছটি বড়ো এবং সার্থকভাবে বেড়ে উঠতে চায় রুদ্রের কবিতায়। শস্যের বিশ্বাসী হয়ে রুদ্র সামাজিক শৃঙ্খলের এবং শকুনি অপশাসনের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কবিতার ভাষায়; আবাদ ও নির্মাণে প্রতিশোধ নিতে চান রুদ্র শোষণের :

(ক) হে আমার ব্যাধি-জরা-জীর্নতা পান্ডুর বোধ,
হে আমার প্রতারনা-রুগ্ন লোভের কালিমা- হে আমার ক্ষয়
বিশ্বাস থেকে খ'সে পড়ো অনাবশ্যক হলুদ পাথর
খ'সে পড়ো, মৃত্যু হও।
হে জীবনের যেটুকু ভগ্নস্তূপ ধ্বংস তুমি অপসৃত হও,
এই ভূমে আরো এক নোতুন নির্মান হবে শস্যের বিশ্বাসে।[৭]

(খ) এই মাঠে, এই বুকে ফসল ফলাবে দেখো নোতুন কিষান,
তাদের আশ্বাস পেয়ে অবশেষে কেটে যাবে কুয়াশার দিন।[৮]

(গ) হাড়ের খুলির মাটি কোনো এক বর্ষার পর ঠিকই পাললিক হবে,
খরার মাঠের বুকে দেখো ঠিক মেলে দেবে ফসলের সোনালি পালক।[৯]

(ঘ) সমস্ত পরান জুড়ে সে অঘ্রান ফলভারে নত
তুমি কার ঘ্রান পেয়ে এলে যেন শ্যামল কিষান,
এলে মাটির মরমে রেখে মনোরম মৌন ক্ষত।[১০]

(ঙ) গর্ভিনী রমনী তোর এই ক্ষেতে বুনেছিলো ফসলের বীজ
এই ক্ষেতে রমনীর তামাটে শরীর আর সকল্যান বাহু
একদিন শস্যের সুগন্ধ মেখে ফিরে গেছে অঙ্গনের নীড়ে।[১১]

গণমানুষ, মাটি ও মানুষের উৎপাদন চেতনার সাথে রুদ্রের ভাষাও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও সমকালীন অপশাসনের বিপরীতে এসব কবিতা রুদ্রের চমৎকারিত্বের পরিচয় বহন করে এবং হয়ে যান কবি শ্রমজীবী ও লোকসত্তার ভাষিক নেতা। রুদ্রের "শ্যামল পালক", "স্বজনের শুভ্র হাড়", "ফসলের কাফন", "বিশ্বাসের হাতিয়ার", পৌরানিক চাষা", "অকর্ষিত হিয়া", "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন", "গহিন গাঙের জল" প্রভৃতি কবিতায় তিনি প্রকৃতির কোমল ধানের চারায় শব্দের যে রোপন করেছেন, তা মাটি ও মাতৃভূমির ভালোবাসায় দীর্ঘদির বেঁচে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সামাজিক ইতিহাস ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে রুদ্রের 'মানুষের মানচিত্র' (১৯৮৪) কাব্য বত্রিশটি কবিতার সমন্বয়ে লোকায়ত জীবনের শাশ্বত প্রেক্ষাপট এবং গণজীবনের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, আকুতি-মিনতি এবং সংগ্রামী চেতনার স্পর্শে জীবনের জনযুদ্ধের খণ্ডিত চিত্রায়ন ও সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙ্গার দীপ্ত শপথে অনন্য সাধারণ শাব্দিক মিলন মালায় পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলতার ছাপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এতে গণভাষিক যে শব্দ মালার সমাহার এবং লোকায়ত জীবনের যে অপ্রাচুর্যতার পরিস্ফুটন– তা ব্রাত্য মানুষের প্রতি রুদ্রের অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই চারিয়ে তুলেছে সমকালীন সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রাগ্রসর চেতনাবোধ থেকেই; না পাবার বেদনা এবং গণমানুষের চির লাঞ্ছিত জীবনের করুণ আতুতি স্মৃতিসত্তার আকর হিসেবে লৌকিক শব্দ সম্ভারের ও লোকসত্তার চিত্রাবলীর ব্যঞ্জনাময় মোহনীয় লীলাক্রম ব্যবহারে। গ্রামীণ শব্দ ও ভাষা, লোকায়ত জীবন সংগ্রাম ও উপাদান প্রকাশে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কবি। এতে শব্দের চাতুর্যতা নেই, ভাষার মারপ্যাঁচ নেই, নাগরিক আভিজাত্যের বর্ণনাক্রম নেই; আছে শোষণ তাড়িত মানুষের সরল অভিব্যক্তি এবং সংগ্রামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও আঞ্চলিক লোকস্নাত জীবনের অটুট শব্দগুচ্ছের ঐকতান। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

ক. শরীর গুটায়ে রাখি, শামুকের মতো যাই গুটায়ে ভেতরে,
অন্ধকার চিরে চিরে বিজুলির ধলা দাঁত উপহাসে হাসে,
আমি বলি– ক্ষমা দাও, পরান বন্ধুয়া মোর থাকে পরবাসে,
দেহের রেকাবি খুলে পরানের খিলিপান কে খাওয়াবে তোরে।

গতবার আষাঢ়ও পার হয়ে গেল তাও নামেনা বাদল,
এবার জোষ্ঠিতে মাঠে নেমে গেছে কিষানের লাঙল জোয়াল।
আমাদের মাঝে দ্যাখো জমির ভাগের মতো কতো-শতো আল,
এই দূর পরবাস কবে যাবে? জমিনের আসল আদোল।[১২]

খ. পাখির নাহান ডাকো মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়,
আমি কি বুঝিনা ভাবো? কাতলা মাছের মতো ঘাই মারে বুকে
ওই ডাক ঘাই মারে রক্তেমাংশে। ভাবো ঘরে আছি সুখে।
আহারে পোড়ার সুখ তুফানের গাঙ দেখে মাঝি সে পালায়।[১৩]

গ. রাত তো পোহায়ে এলো, লগি খুলে স্রোতে দিতে হবে নাও খানা,
আমার রজনী কবে পোহাবে দয়াল? ভাঙা নাওখানি কবে
গোনে বা বেগোন স্রোতে জীবনের মও গাঙে একধারা ব'বে।
এ-প্রশ্নের চারা হবে সে কোন অঘ্রানে তার উত্তরের ধান?[১৪]

ঘ. সিঙেল বয়ারগুলো সারাদিন জলে ডুবে ঝাপটায় মাথা।
দু-চারটি ধোড়াসাপ ভয়ে ভয়ে ঘোরে ফেরে খালের কিনারে।
মাছ খায়। পাড়ে কিছু গোরাই মল্লিক আর খায়েরি শালিক
ভাবো তো এমন দৃশ্য কবে তুমি দেখেছিলে, কতোকাল আগে?[১৫]

ঙ. সোয়ামির ঘর থেকে তালাক হয়েছে তার, জোটেনি তালাক
জীবনের কাছ থেকে। জীবন নিয়েছে তারে অন্ধকারে টেনে।
মজা পুকুরের পাড়ে ভিন পুরুষেরা তার দেহখানা ছেনে
চিনিয়ে দিয়েছো দেহ, জীবনের কানাগলি, অন্ধকার বাঁক।[১৬]

চ. কী সাপে দংশিলো লখা! জীবন আন্ধার হলো, অঙ্গ হলো কালি,
এ-কোন সাপের বিষ জীবন নেয়না শুধু শরীর জ্বালায়,
পরান পোড়ায়ে নামে বিষের নহর যেন রক্তের নালায়–
দোহাই বেদেনি তোর, বিষের বাগানে তুই বিষহারা মালি।[১৭]

ছ. বউটার উদ্‌লা গা, ন্যাংটা-পাছা ছেলেপিলে, বুড়ির পচন,
ফুলে ঢোল পাওখানা, পুঁজে রক্তে একাকার, ধেসে আসে মাছি,
এক কোনে প'ড়ে থাকে, ছেঁড়া চটে, পচা গন্ধে, ইচ্ছা তবু বাঁচি–
রোদ্দুর শুকোয় সব, এ-জীবন শুকোয় না, বিষের জীবন।[১৮]

জ. কথা নেই, বার্তা নেই ভোর বেলা টান্ টান্ ম'রে পড়ে আছে
মাদ্বরের কালাগাই, শারান্ত গতর খানা, নোতুন গাবিন।
রোগ নেই, ব্যামো নেই, বিষ-শূল দিছে কেউ এই দ্যাখো চিন্,
হরিপদ মুচি, ব্যাটা বেজম্মা চাড়াল, ওর কাজ, ও-ই মোরছে।[১৯]

ঝ. থামা, খানকির পোলা তোর ইলাবিলা থামা। মানুষের ঢল
দ্যাখ নোনা দইরার মতো কূল ভেঙে কেমন গর্জায়ে ওঠে।
কেমন শিমুল দ্যাখ, রক্তজবা কি রকম রাঙা হয়ে ফোটে।
খুনের বদলে খুন, জুলুম চালালে নেবো জুলুমে বদল–

অনেক হয়েছে দেনা, পরনে ত্যানাও আর জোটেনা এখন,
না খাওয়া পোলা থুয়ে মাগ যায় আন বাড়ি আন বিছানায়।

তবেও বা দুষি কেন, পেটে খিদে বিষ হয়ে অনল জ্বালায়।

পেটের ভিতরে বিষ, মাথার ভিতরে বিষ, লোহুতে কান্দন।[২০]

এই উদ্ধৃতিগুলোতে রুদ্রের ভাষা প্রয়োগ নৈপুণ্য বর্তমান, এখানে আর শব্দের আভিজাত্য নেই; একেবারে ব্রাত্য জীবনের মুখ নিসৃত শব্দাবলির সমাহার ঘটেছে। আর তা কবিতায় পুরোপুরি আঞ্চলিক শব্দ বিন্যাস্ত না হয়ে বিভিন্ন অংশে আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দু-একটি কবিতায় ঢাকা অঞ্চলের শব্দ ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য কবিতায় বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের শব্দরাজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা গণজীবনের নিত্য নৈসর্গিক জীবন স্নাত এবং মননজাত চিত্র ভাষ্যের আকর হতে পেরেছে। যা মূলত রুদ্রকে গণ মানুষের এবং গ্রামীণ জনপদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এগুলো একেবারে নাগরিক জীবনের বাইরের শব্দ এবং গ্রামীণ রুচিবোধে সিক্ত। এই সমস্ত লোকশব্দ ও অপরিশীলিত চিত্র গ্রামীণ লোকজজীবনের সরল মানুষের ঐকান্তির বাসনা এবং আসক্তির শুধু প্রকাশই ঘটায়নি; তাদের অবহেলিত ও নগ্ন জীবনের চাহিদার অতৃপ্ততার বুভুক্ষতার জীবনালেখ্যও বটে; যা প্রতিনিয়ত সংগ্রামী দ্যোতনায় সামাজিক পেকিপনার বিরুদ্ধে ফণা তুলতে চায়; আর রুদ্রের উদ্দেশ্যও তা-ই। গণ মানুষের চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তাদের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ গড়নের সংগ্রামে নেতৃত্বদানের প্রতিশ্রুতি আদায় করা। যাতে গোটা সমাজের আমূল পরিবর্তিত হয় সাম্যের দীক্ষায় এবং এভাবে শব্দ হয়ে যায় গণচেতনার আধার।

শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতন কবি মাত্রই নিজস্ব শ্রেণী চরিত্রের পরিস্ফুটন ঘটিয়ে থাকেন। এক একটি শব্দ কবির প্রায়োগিক ক্ষমতাবলে ভিন্ন থিমের জন্ম দিতে পারে। বাংলা কবিতায় যাঁরা সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের কাব্যে এমন কিছু শব্দ ও শব্দরাজি বর্তমান; যা বার বার বিভিন্ন কবির রচনায় একাত্মতা লাভ করেছে; বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসব শব্দ ও শব্দপুঞ্জের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ঘুরে ফিরে একটাই; আর তা হলো শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ। এঁদের বিভিন্ন কাব্যানুষঙ্গে যে শব্দ ও শব্দগুচ্ছ দেখাতে পাওয়া যায়, তা হলো কাস্তে, রোদের হাতুড়ি, মুক্তিবীজ সূর্য, সংগ্রামের প্রবল অধিকার, রক্তের মধ্যে নক্ষত্র জ্বলা, ফসল তোলার গান, ফণিমনসার কাটা, আলোর বিদ্যুৎ, হিজল ফুলের ছায়া, সময়ের রক্তপদ্ম, মিছিলে মুক্তি, সমুদ্রের গর্জন, ইস্পাতের মুখ, বর্ষার ফলক, রোদ্দুরে অবগাহন, দুঃখের মশাল, রক্তকরবী, চেতনাহীন বিবর্ণ সময়, ভাঙা কফিন, চৈতন্যের গভীরে, সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত ইত্যাদি। রুদ্রের কবিতায়ও এই শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বার বার এসেছে। এগুলো ছাড়াও রুদ্রের কবিতায় সমকালীন অসহিষ্ণুতায় ক্ষোভের এবং বিক্ষোভের পাশাপাশি চলমান ক্লেদের বর্ণনায় এমন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়েছে, যা কবির সমকালীন জাগ্রত মানসিকতার পরিচায়ক নিম্নে

আমরা এমন ধরণের কিছু শব্দরাজি ও শব্দচিত্রের দৃষ্টান্ত দিতে চাই, যা রুদ্রের স্বল্পায়ু জীবনেও গভীর উপলব্ধির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে :

১. 'রক্ত তিলকে তপ্ত প্রনাম'।[২১]

২. 'এক লাখ মত্ত প্রপেলার ঘোরে ওই মাথার ভিতরে'। [২২]

৩. 'প্রত্যাশার শেফালিকা পরাবত'। [২৩]

৪. 'স্নেহ-পলাতক দারুন রুক্ষ আঙুল'। [২৪]

৫. 'কলুষিত করুন কঙ্কাল'। [২৫]

৬. 'ফসলের সোনালি পালক'। [২৬]

৭. 'কেঁদে ওঠে এক রাশ জলের আকুতি'। [২৭]

৮. 'দুধের ফেনার ভেতরে মৃত শিশুদের শীর্ন শরীর
বিষের বকুল, গোলাপের লাশ'। [২৮]

৯. 'অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সমান্য ঠাঁই', [২৯]

১০. 'উষ্ণ মাটির ললাটে দ্বন্দ্ব'। [৩০]

১১. 'চিতা-বহ্নির বিষ'। [৩১]

১২. 'বকুলের খামে মোড়া শুভ্র সকাল'।[৩২]

১৩. 'মানুষের শ্বাপদ-স্বভাব মাখা লোভাতুর দাঁতের কৌশল'।[৩৩]

১৪. 'মৌসুমে সব শিমুল ফুটে ওঠে গাঢ় লাল'[৩৪]

১৫. 'জীবিত খুলির মধ্যে বিক্ষোভে ন'ড়ে ওঠে এক লাখ তীব্র করতল
এক লাখ পুষ্টিহীন শিশুর ক্ষয়মান দেহ'।[৩৫]

১৬. 'সমস্যাহীন এক সূর্যময় রোদ্দুর'।[৩৬]

১৭. 'একখণ্ড মেঘের জন্যে কি বিশাল মরুভূমি'।[৩৭]

১৮. 'সারারাত সারাদিন সাড়ে তিনশত কোটি কাক ঠোঁকরায় বিরতিবিহীন'।[৩৮]

১৯. 'জোস্নায় দাঁড়ায় কালো বিরোধী ঘাতক'।[৩৯]

২০. 'ছেনাল সময় উরুত দ্যাখায়ে নাচে'।[৪০]

২১. 'লিলুয়া-বাতাসে ঝরে এলো মেলো হলুদিয়া-পাতা'।[৪১]

২২. 'জোস্নাকে রোদ্দুর ভেবে হারালি চাঁদের স্বাদ, দিনের সুষমা'।[৪২]

২৩. 'পিচের সড়কে রক্তের কারুকাজ'।[৪৩]

২৪. 'তপ্ত রক্তে লেখা হৃদয়ের ক্ষোভ'।[৪৪]

২৫. 'বাতাসে ঝাঁঝালো নোতুন ধানের ঘ্রান'।[৪৫]

২৬. 'বৃষ্টিকে ডাকো, ভেজাও রুক্ষ মাটি'।[৪৬]

এই সব শব্দরাজি ও শব্দ চিত্রের ভাষ্যে এটা স্পষ্টতর যে, রুদ্র আপাদমস্তক একজন সাম্যবাদী কবি। সাম্যবাদী কবিদের কাব্যে এমন শব্দচিত্রেরই আভাস প্রতিফলিত হতে থাকে সারাক্ষণ; শব্দের ব্যবহারেও তাই চেনা যায় কবির মানসিক উদ্দেশ্য। এ ছাড়া রুদ্রের 'গল্প' (১৯৮৭) কাব্যে যে সমস্ত কবিতা, তাতে আদৌ কোনো গল্প নেই। মূলত চলমান জীবনের বীভৎস পরিণতির ভাষা কাঠামো এতে গড়ে উঠেছে। বলা চলে, রুদ্রের রাজনৈতিক সংলাপ ও অতিকথন কবিতার বাইরে- যে সমস্ত কবিতা- তা মানবিক উৎকর্ষে উত্তীর্ণ; চলমান অভিক্ষতা ও ব্যক্তি সমাজের জারক রসে জারিত এবং ভাষা গাঁথুনির কুশলতায় শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। কবির মেজাজ ও মানসিকতার উপর নির্ভর করেই তাঁর শব্দচয়ন গড়ে ওঠেছে। জাতীয় দুর্দিনে রুদ্রের কবিতার শব্দে গভীর ব্যঞ্জনা না থাকলেও রক্তিম বাসনা ও প্রগাঢ় জাগরণে তা সর্পিল গতিবেগের সঞ্চার যে করতে পেরেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

(২)

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কবিতার যে জোয়ার তরুণ কবিরা এনেছিলেন, তাতে প্রাকরণিক ও বিষয়গত কোনো রূপান্তর হয়নি এবং যুগান্তকারী কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি। কবিতা প্রবলভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা; ক্ষোভ ও জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় সমস্ত পরিমিতিবোধের ছিন্নতায় ছিলো অনিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক আশাভঙ্গের কারণে পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতা আক্রোশ এবং আবেগের শুধু বাহনই হলো না; কবিতা মুক্তির রাজপথ রচনায় রাস্তায় এসে ব্রাত্য মানুষের কাতারে দাঁড়িয়েছে। কবিতা ছন্দের শৃঙ্খল মানলোনা; বরং কবিতার শরীর জুড়ে গদ্যের প্রবাহমানতায় আন্দোলনের গতিবেগ সঞ্চারিত হলো। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সত্তুর দশকের এই তরুণ কবিগোষ্ঠীর যোগ্য প্রতিনিধি। সমকালীন সমাজ বাস্তবতার উত্তাপে তিনিও কবিতাকে রক্তাক্ত রাস্তায় নামিয়েছেন, তাঁর মধ্যে সুকান্তের মতো গণকবি হবার বাসনাও ছিলো প্রচণ্ডভাবে; তারপরও রুদ্রের কবিতা পরিমার্জিত, শুদ্ধতাধর্মী এবং শৈল্পিক বিন্যাসে ছন্দের সৌন্দর্যলীলা স্পর্শ করতে চেয়েছে বার বার। তাঁর আক্রোশমূলক, রাজনৈতিক ও অতিকথন মুক্ত কবিতাগুলো ছন্দের বিশ্বস্ত বিন্যাসে রূপ-সৌন্দযে বিমোহিত। নান্দনিকতায় বিশ্বাসী আব্দুল মান্নান সৈয়দ সত্তর দশকের তরুণ কবিদের আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, 'সত্তরের দশকে সামাজিক অঙ্গীকার ও লিরিক ঝংকার সবচেয়ে সফলভাবে এনেছেন রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'।[৪৭] অন্যত্র তিনি রুদ্রের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন 'শব্দ ও ছন্দপ্রয়োগে শিল্পময় প্রথানুসারী'।[৪৮]

শুরু থেকেই রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ন্যস্ত ছিলেন। অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা এবং বিনষ্টির জাতাকলে পিষ্ঠ রুদ্রের কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দে শন্ শন্ মাদল বাজাবে বলে আমরা মনে করেছিলাম; কিন্তু রুদ্র স্বরবৃত্ত ছন্দে না গিয়ে লিরিকধর্মী মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুগামী হলেন। জীবনের ক্লেদগুলো না পাবার বেদনাগুলো গভীর উপলব্ধিগত মোহনীয় মাত্রাবৃত্তের গীতলতায় তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। সমগ্র কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই প্রয়োগ বেশি।

রুদ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত উপকূল' (১৯৭৯)। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭৫-১৯৭৮। প্রথম কাব্যটি সমকালীন সমাজ-রাজনীতি নির্ভর হলেও এ কাব্যে রুদ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই নিবিড় গাঁথুনির বিন্যাস করেছেন। "অভিমানের খেয়া", "বিমানবাল", "নষ্ট অন্ধকারে", "শব্দ শ্রমিক", "আমি সেই অভিমান", "বিশ্বাসে বিষের বকুল", "অমলিন পরিচয়", "শ্যামল পালক", "মাতালের মধ্যরাত্রি", "প্রিয়দংশন বিষ", "অপর অবেলায়", "মনে পড়ে সুদূরের মাস্তল", "পথের পৃথিবী", "স্বজনের শুভ্রহাড়", "পরাজিত নই পালাতক নই", "কার্পাশ মেঘের ছায়া", "নিরাপদ দেশলাই", "অপরূপ ধ্বংশ", "সভ্যতার সরঞ্জাম", "অবরোধ চারিদিকে", "ফসলের কাফন", "বিশ্বাসের হাতিয়ার" প্রভৃতি কবিতাগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয় এবং আটমাত্রা বিশিষ্ট। এসব কবিতার ছন্দ বিন্যাসে রুদ্র অসাধারণ কাব্যিক শিল্পবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। সমকালীন অন্যান্য কবিদের চেয়ে তিনি ছন্দ নির্মাণে যেমন ছিলেন আগ্রহী; তেমনি শব্দের ও ছন্দের মিলিত ঐকতানে গড়ে তুলেছেন মেধাবী প্রত্যয়। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

ক.	আর যাই হোক | পলাতক নই	৬ + ৬
	হয়তো পারিনি | জীবনের সব | প্রাপ্য মেটাতে	৬ + ৬ + ৬
	হয়তো অনেক | অনিয়ম এনে | গড়েছি নিয়ম,	৬ + ৬ + ৬
	হয়তো স্বজন | প্রিয় মানুষের | নিষেধ মানিনি	৬ + ৬ + ৬
	বন্ধন ছিঁড়ে | ব্যবধান কেই | আপন ভেবেছি | বেশি,	৬ + ৬ + ৬ + ২
	অনাহার কতো | এসেছে করাল	৬ + ৬
	বন্যায় ঝড়ে | ভেসে গেছে কতো | নীড়ের জোস্না,	৬ + ৬ + ৬
	কতোবার আশা | ঢেকেছে করুন | বেওয়ারিশ লা | শে	৬ + ৬ + ৬ + ১
	কতোবার প্রেম | বারুদের বিষে | হয়েছে কাতর	৬ + ৬ + ৬
	নির্মমতার | নিচে একশত | জ্বলন্ত নাগা | শাকি [৪৯]	৬ + ৬ + ৬ + ২
খ.	যে মানুষ হাড়ে | লবনের ঘ্রান, | বুকে সমুদ্র | -ঝড়	৬ + ৬ + ৬ + ২
	রোদ্দুরে পোড়া | চামড়ায় যারা | মেখেছে পলির | কাদা	৬ + ৬ + ৬ + ২

আজ তারা আসে | গর্জনে ঘন | বর্ষনে, কাঁপে | মাটি। ৬ + ৬ + ৬ + ২

বাজ-পোড়া তরু | ঘরের দুয়োরে, ৬ + ৬
কুকুরে শকুনে | টেনে ছিঁড়ে খায় | মায়েরশরীর | এই জনপদে, ৬ + ৬ + ৬ + ৬
ঠেকাতে পারিনা | কণ্ঠ বাহুতে | ঝুলে আছে তালা | রাজার এনাম [৫০] ৬ + ৬ + ৬ + ৬

গ. সবুজ ছায়ার নিচে | ঘুমে চোখ ঢুলে এলে ৮ + ৮
মা যাকে শোনাতো সেই | তুষার দেশের কথা, ৮ + ৮
তার চোখে আজ এতো | রাত জাগা ক্লান্তির | শোক! ৮ + ৮ + ২

পেছনে তাকালে কেন | নিরবতা আসে চোখে! ৮ + ৮
মনে পড়ে জোস্নায় | ঝলোমলো বালুচর, ৮ + ৮
একটি কিশোর তার | তন্ময় দুটি চোখে ৮ + ৮
রাশি রাশি কালোজল | সুদূরের মাস্তুল ৮ + ৮
মনে পড়ে ...[৫১] ৪

ঘ. বুকের তিমের ভেঙে | সুপ্রভাতে আমাদের | দ্যাখা হয়েছিলো, ৮ + ৮ + ৬
সুরম্য আলোর নিচে | জেগে ওঠে আমাদের | স্বপ্নধোয়া দ্বীপ ৮ + ৮ + ৭
তবু সেই নিশ্চিত | প্রতর আজো আসেটি | এখানে, ৮ + ৮ + ৩
তবু সেই অঘনের | পূর্নচাঁদ ছাড়ায় | নি জোস্নার আরক।[৫২] ৮ + ৮ + ৮

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সাধারণত বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রার হয়, রুদ্র অনেক স্থলে এক মাত্রা ধরেছেন; শুভ্র, সুরম্য, পূর্ণ, মৃত্যু, ভেঙে প্রভৃতি শব্দকে দুই মাত্রা হিসেবে ছন্দ গড়েছেন। আবার অনেক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় মাঝে মধ্যে প্রবহমাণ মহাপয়ারও দেখতে পাওয়া যায়। রুদ্রের গদ্য কবিতাগুলোর সংখ্যা নিতান্ত কম, এসব কবিতাগুলোর মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মিশেল বর্তমান; এ গুলো খাঁটি গদ্য কবিতা নয়। 'উপদ্রুত উপকূল' কাব্যে "এ কেমন ভ্রান্তি আমার", "মাংশভুক পাখি" ও "প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি" কবিতা পুরোপুরি গদ্য কবিতা নয়; গদ্য-পদ্যের মাখামাখি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনটি কবিতা "আজীবন জন্মের ঘ্রানে", আধখানা বেলা" ও "নিশব্দ থামাও"। "আজীবন জন্মের ঘ্রানে" ও "নিশব্দ থামাও" কবিতা দুটি অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ারের এবং "আধখানা বেলা" কবিতাটি দুটো পংক্তি ছাড়া মাতলী পয়ারের তবে চরণের শেষে মিল নেই। যেমন :

সারারাত কাঠ কাটে | ঘুনপোকা গোপনে ৮ + ৭
সারারাত ধরে তরু | বোনে কিছু ফুলকে, ৮ + ৭
বোনে কিছু সকালের | কুসুমের তনিমা ৮ + ৭
হে পথিক, কারে তুমি | বেছে নিলে পাথেয়! ৮ + ৭
আধখানা বেলা আছে | আর বাকি কুয়াশা [৫৩] ৮ + ৭

তবে এ কবিতাটি মাত্রাবৃত্তের ৮ + ৭ মাত্রারও হয়। "আজীবন জন্মের ঘ্রানে" কবিতাও পুরোপুরি মহা পয়ারের নয়, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মিশেল। তবে "নিশব্দ থামাও" কবিতাটি পুরোপুরি অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ার ছন্দের। কবিতাটির কিছু অংশ :

থামাও, থামাও এই | মর্মঘাতী করুন বিনাশ ৮ + ১০
এই ঘোর অপচয় | রোধ করো হত্যার প্লাবন। ৮ + ১০
লোকালয়ে ভোর আসে | তবু সব পাখিরা নিখোঁজ ৮ + ১০
শস্যের প্রান্তর খুলে | ডাকি আয়, আয় প্রিয় পাখি ৮ + ১০

একবার ঢেকে ওঠ | মুখরতা, মৃত্যুর সকালে ৮ + ১০
বাজুক উজ্জ্বল গান | জনপদ নিসর্গ জানুক ৮ + ১০
এখনো পাখিরা আছে | গান আছে জীবনের ভোরে। ৮ + ১০

থামাও মৃত্যুর এই | অপচয়, অসহ্য প্রহর। ৮ + ১০
স্বস্থির অস্থিতে জ্বলে | মহামারী বিষন্ন অসুখ, ৮ + ১০
থামাও থামাও এই | জংধরা হৃদয়ের ক্ষতি। [৫৪] ৮ + ১০

রুদ্রের 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম' (১৯৮১) কাব্যেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যাপকতা বর্তমান। "হাড়েরও ঘরখানি ১-১৪", "পৌরাণিক চাষা", "কাচের গেলাশে উপচানো মদ", "অকর্ষিত হিয়া", "একজোড়া অন্ধ আঁখি", "পরাজিত প্রেম", "দুটি চোখ মনে আছে", "ও পরবাসীয়া", "বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা", "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন", "হাউসের তালা", "গহিন গাঙের জল", "চাষারা ঘুমায়ে আছে", "তামাটে রাখাল", "খামার" প্রভৃতি কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। এ ছন্দের লিরিক ব্যঞ্জনায় রুদ্র স্বদেশের করুণ মূর্তির পাশাপাশি, চাষাবাদ ও ফসলি বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এখানেও কবি ছয় ও আট মাত্রার ছন্দ নির্মাণ করেছেন। কিছু কিছু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাঝে পয়ার ছন্দের বিস্তারও দেখা যায়। "হাড়েরও ঘরখানি" কবিতাটি পুরোপুরি

মাত্রাবৃত্তের ছয় মাত্রার হলেও এতে (৮ + ৬) পয়ার এবং দীর্ঘ একাবলী (৬ + ৬) ছন্দেরও বিন্যাস দেখানো যায়। ৮ এবং ৯ নং কবিতার মধ্যে এমন মিশেল বর্তমান। দীর্ঘ একাবলী এবং মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ-

আবার নামলো | ডল মানুষের	৬ + ৬
আবার ডাকলো | বান মানুষের	৬ + ৬
আবার উঠলো ঝড় মানুষের [৫৫]	৬ + ৬

অন্ত্যমিলহীন পয়ার ও মাত্রাবৃত্তের উদাহনণ :

গ্রাম থেকে উঠে এলো | ক্ষেতের মানুষ	৮ + ৬
খরায় চামড়- পোড়া | মাটির নাহান,	৮ + ৬
গতরে ক্ষুধার চিন্ | মলিন বেবাক,	৮ + ৬
শিকড় শুদ্ধ গ্রাম | উঠে এলো পথে।	৮ + ৬
অভাবের ঝড়ে ভাঙা | মানুষের গাছ	৮ + ৬
আছড়ে পড়লো এসে | পিচের শহরে।	৮ + ৬
সোনার যৈবন ছিলো | নওল শরীরে	৮ + ৬
নওল ভাতার ঘরে | হাউসের ঘর,	৮ + ৬
আহারে নিঠুর বিধি | কেড়ে নিলো সব	৮ + ৬
সোনার শরীর বেঁচে | সোনার দোসর। [৫৬]	৮ + ৬

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এটিই আবার ৬ + ৬ + ২ পর্বে সাজানো যায়। এ কাব্যে রুদ্র ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্তের চেয়ে ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। তবে এ কাব্যের "হাউসের তালা", "পৌরানিক চাষা", "চাষারা ঘুমায়ে আছে", "খামার", ও "তামাটে রাখাল" কবিতাগুলো আট মাত্রার মেল বন্ধনে পরিশীলিত ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক; যা কবিতার দীর্ঘ পংক্তিতে সুর ও শুদ্ধতার গজভঙ্গির মূর্ত প্রকাশে অনন্য। শব্দ ও অর্থের বিচ্যুতি ঘটায়নি। নিচে দু'টি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

১. বিহান গড়ায়ে যায়, | দুপুর গড়ায়ে যায়, | নামে নিশি বিষের রা | ত্তির	৮ + ৮ + ৮ + ২
জীবন গড়ায়ে যায়, | জীবনের ফুল-পাতা, | না-ফোটা মুকুল	৮ + ৮ + ৬
গোনের নৌকোর মাঝি, | ভাটিয়ালি গেয়ে যাও | জানো তুমি?	৮ + ৮ +৪
তুমি জানো, যব-ডুমু | রের গাছে ইউলা-বা | উলা-মন মাছরাঙা | পাখি?	৮ + ৮ + ৮ +২
তুমি জানো ? ও মেঘ | ও আঘনের পোয়াতি | প্রান্তর, জানো তুমি ?	৮ + ৮ + ৮

মুখ দিয়ে খোলে না সে, | খোলে না সে বেদনায় | ও, ৮ + ৮ +১
আমার সাধের তালা | কোন চাবি দিয়ে তারে | খুলি? [৫৭] ৮ + ৮ + ২

২. তামালে রাখাল তুই | সারাদিন বাজালি বা | তাস ৮ + ৮ + ২
বিরান বিলের বুকে | নিসঙ্গতা বাজালিরে | তোর ৮ + ৮ +২
কবে কোন উদাসিন | বাউলের একতারা | খানি ৮ + ৮ + ২
যেইভাবে বেজেছিলো | যেইভাবে বাজে প্রান্ট | বাজে দেহ, ৮ + ৮ + ৪
সেই সুর হারালি | কোথায় তুই তামাটে | রাখাল ? ৮ + ৮ + ৩
বাঁশিতো বাজেনা তোর! ৮
কাসাটে রাখাল তোর | বাশিটি বাজেনা কেন? [৫৮] ৮ + ৮

এ কাব্যে "হারাই হরিনপুর", "মুখোমুখি দাড়াবার দিন" ও "স্বপ্ন-জাগানিয়া" কবিতা তিনটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে "হারাই হরিনপুর" এ মাত্রাবৃত্তের মিশেল ঘটেছে; তা ছাড়া অন্য দুটি কবিতা পুরোপুরি পয়ার ছন্দে রচিত। "স্বপন- জাগানিয়া" কবিতায় চরণে অন্ত্যমিলও দেখা যায়, কখনো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি, আবার কখনো তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির অন্ত্যমিল আছে। যেমন :

আমারে বানাও ফের | তোমার নাহান ৮ + ৬
তোমার নাহান ঋজু |, স্বাস্থ্যবান হিয়া, ৮ + ৬
আমাদের বানাও শুদ্ধ | স্বপ্ন-জাগানিয়া। ৮ + ৬

এই যে বিনীত মাথা | গোলামের ঘাড় ৮ + ৬
পুনর্বার করো তারে | স্বভাবে স্বাধীন, ৮ + ৬
করো তারে শব্দময়, | নীরবতাহীন। ৮ + ৬

মানুষের মানবিক | ভাষা ও স্বভবে ৮ + ৬
যতোখানি ঘৃনা থাকে, | থাকা স্বাভাবিক, ৮ + ৬
আমারে বানাও ঠিক | ততোখানি প্রেম ৮ + ৬
ততোটা বানাও লোহা | যতোটুকু হেম। [৫৯] ৮ + ৬

এ কাব্যে রুদ্র স্বরবৃত্ত ছন্দও রচনা করেছেন। "পক্ষপাত", "ও মন, আমি আর পারিনা" ও "সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো" কবিতা তিনটি স্বরবৃত্ত ছন্দের। কবিতাগুলো অসমপর্বিক চরণে রচিত। "পক্ষপাত" কবিতার

শেষে গিয়ে পর্ব অসম হয়ে গেছে। কবিতাগুলো দ্রুত লয়ে পঠিত। রুদ্র যে স্বরবৃত্ত ছন্দেও সুনিপুন, এ কবিতা তিনটি তারই স্বাক্ষর বহন করে। কয়েকটি উদাহরণ :

ক.	ও মন, আমি | আর পারিনা	৪ + ৪
	বাঘের থাবায় | হরিন ঘায়েল,	৪ + ৪
	হায়রে আমি | হাত-পা বাঁধা	৪ + ৪
	ঠিক সাঁকোটির | মধ্যিখান	৪ + ৪
	দুই দিকে দাঁত | দুই দিকে নোখ,	৪ + ৪
	শুধুই ঘৃনা	৪
	ও মন শুধু | ঘৃনায় কি আর | শস্য ফলে ? [৬০]	৪ + ৪ + ৪
খ.	বাজায় যারা | বাজাক বীলা | , করুক যারা | করছে ঘৃনা	৪ + ৪ + ৪ +৪
	আমি আমার | পথ চিনেছি | আমার পথে | চলবো।	৪ + ৪ + ৪ + ২
	নাইবা র'লো | সুস্বাগতম | এসব কথাই | বলবো ঃ	৪ + ৪ + ৪ + ২
	মানুষ তুমি | ভুল করোনা	৪ + ৪
	সাহস তোমার | জ্বালাও শিখা | বুকের মাঝে | সত্য	৪ + ৪ + ৪ + ২
	তোমার র'লো | সুখী মানুষ, | আমার র'লো | আর্ত [৬১]	৪ + ৪ + ৪ + ২
গ.	সামনে কারা | মেঘ দ্যাখালো	৪ + ৪
	দুঃখ দিয়ে | গাঙ সাজালো,	৪ + ৪
	কারা তোর এই | ভাঙা নায়ে	৪ + ৪
	চাপিয়ে দিলো | হাজার বোঝা | খোঁজ পেলিনা।	৪ + ৪ + ৪
	সাত সুরুষের | ভাড়া নৌকো	৪ + ৪
	বাইতে বাইতে | জনম গেল | টের পেলিনা [৬২]	৪ + ৪ + ৪

'মানুষের মানচিত্র' (১৯৮৪) কাব্যটি ইতিহাস-ঐতিহ্য, গণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও আনন্দ-বেদনার সংগ্রামী জীবন ভাষ্যের দলিল বিশেষ। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ অক্ষরবৃত্তের আট-আট-ছয় মাত্রার প্রবহমান ত্রিপদী পংক্তিতে বত্রিশটি কবিতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন একাব্যে। জীবনান্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যে এ ধরনের বাইশ মাত্রার প্রবাহমান পংক্তির প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন। প্রতিটি কবিতা বিশ পংক্তির এবং প্রতিটি চার পংক্তির মধ্যে একটি স্তবক বর্তমান। রুদ্র অসাধারণ ছান্দসিক হিল্লোলে

অতীত সংগ্রামী চেতনাকে বর্তমানের ম্যান্ডোলিনে যেন গভীর সুরের মূর্ছনা সৃষ্টিতে ন্যাস্ত থাকলেন। যে পংক্তির মধ্যে বদ্ধাক্ষর নেই তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। আবার বেশির ভাগ কবিতারই অন্ত্যমিল রক্ষা করো হয়েছে। এ কাব্যের ১, ২, ৩, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ নং কবিতার প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অন্তমিল বর্তমান। বাকি কবিতাগুলো অন্ত্যমিলহীন। রুদ্র এ কাব্যে শৈল্পিক অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য আত্মনিমগ্ন ছিলেন এবং শুদ্ধতা সন্ধানিতে ছিলেন তৎপর। একজন তারুণ্যদীপ্ত ও প্রতিভাধর কবির মানসিক উৎকণ্ঠা এবং বিশ্লেষণ প্রবণতা এ কাব্যের শৈল্পিক প্রজ্ঞা একাত্তরের জনযুদ্ধের সংগ্রামী প্রতিরোধে সমাপ্ত হয়েছে। বত্রিশটি কবিতাই ছন্দের নিগুঢ় গাঁথুনিতে রুদ্রের বিচক্ষণতা এবং কবিত্বশক্তির সৃষ্টিশীলতায় মূর্ত প্রতীক হতে পেরেছে। গণজীবনের ভাষা ও আর্তি, ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে রুদ্রের কাব্য পিপাসাকে নিবৃত্ত করেছে এ কাব্য। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও ছন্দ বিন্যাস দেখানো যেতে পারে :

ক. সারাদিন রান্নাঘরে | এক পাল পোলাপান | তাদের যতন। ৮ + ৮ +৬
আর তিন বউ তারা | দিন-রাত পান খেয়ে | মুখে দেয় শান্ । ৮ + ৮ + ৬
তাদের শানানো কথা | গতর জ্বালায়ে ছাড়ে, | জ্বালায় পরান। ৮ + ৮ + ৬
আহারে পোড়ার সুখ! | দিন কাটে, রাত তা-ও | দিনের মতোন- ৮ + ৮ + ৬

রাত্তির কাটেনা আর | দেহের আগুন নেভে, | পরান নেভেনা। ৮ + ৮ + ৬
কোনোদিন সখ হলে | কাটা ঘায়ে ফের তিনি | ছিটান লবন, ৮ + ৮ + ৬
দিনভর দেহজ্বলে, | সারারাত জ্বলে এই | নওল যৈবন। [২১] ৮ + ৮ + ৬
পোড়ার জীবন নেবে, | পোড়া কপালিরে তবু | মরন নেবেনা .... ৮ + ৮ + ৬

পাখির নাহান কেন | ডাক দাও নিশিরাতে? | বিহান বেলায় ৮ + ৮ + ৬
যদি পারো ডাক দিও, | ডাক দাও রোদ্দুরের | তাতানো দুপুরে, ৮ + ৮ + ৬
কেমন ছিঁড়তে পারি | শিকলের শিক দেখো | জীবন-নূপুরে, ৮ + ৮ + ৬
গান তুলে কেমন আ | সতে পারি স্বপ্নধোয়া | হৃদয় তলায়। [৬৩] ৮ + ৮ + ৬

খ. জন্মেই জড়ায়ে গেছি | মানুষের সুচতুর | জালে ও খাঁচায়, ৮ + ৮ +৬
তারপর যতোবার | জোয়ার এসেছে গাঙে- | এসেছে প্লাবন ৮ + ৮ + ৬
কূল ভেঙে গেছে শুধু, | ভাঙে নাই খাঁচা-জাল, | জালের বাঁধন। ৮ + ৮ + ৬
চিরকাল স্বপ্নতবু | জেলের নৌকোর মতো | জীবন ভাসায়- ৮ + ৮ + ৬

জেলের কুমারী কন্যা | এখনো খোঁপায় গোঁজে | কলাবতী ফুল, ৮ + ৮ + ৬
দরিয়ার মতো কালো | এক বুকে পিষ্ট হতে | ইচ্ছা তার কাঁদে, ৮ + ৮ + ৬
ভাড়া গাঙপাড়ে তবু | কালো মেয়ে স্বপ্ন খোঁজে | জোস্নাহীন চাঁদ। ৮ + ৮ + ৬
শুটকির গন্ধ আসে, | জোয়ারের জলে ভাসে | পরানের কূল।[৬৪] ৮ + ৮ + ৬

গ. কলার ভেলায় লাশ, | সাথে ভেসে চলে এক | স্বপ্নবান বধূ! ৮ + ৮ + ৬
হাঙর কুমির আসে, | আসে ঝাড়, অন্ধকার | দরিয়ার বান, ৮ + ৮ + ৬
লাশের শরীর থেকে | মাংশ খসে, বেহুলার | অসীম পরান, ৮ + ৮ + ৬
কিছুতে টলেনা স্বপ্ন, | আকাংখার শক্ত হাত | মেলে রাখে বধূ[৬৫] ৮ + ৮ + ৬

ঘ. এতো যে কষ্টের ধান! | মাঠ ভরা ধানে তুমি | নামালে বয়ার, ৮ + ৮ + ৬
আগুনে পোড়ালে ক্ষেত, | পাকা-শস্য, ঘরে দিলে | করাল আগুন। ৮ + ৮ + ৬
আমার শরীর আর | মাথার মগজ জ্বলে, | জ্বলে ওঠে খুন, ৮ + ৮ + ৬
আমিও ছিঁড়তে পারি | এই রুক্ষ বুনো হাতে | বেয়াড়া আঁধার।[৬৬] ৮ + ৮ + ৬

ঙ. কুকুরের গ্রাস কেড়ে | খেয়ে তার নাগরিক | জীবনের শুরু। ৮ + ৮ + ৬
এই টার্মিনালে তার | কেটে গেছে শৈশবের | ভাঙা চোরা দিন ৮ + ৮ + ৬
এই টার্মিনাল তার | রক্তের গভীরে দিছে | জীবনের ঋণ ৮ + ৮ + ৬
এই টার্মিনাল তাকে | চক্ষু দিয়ে বিনিময়ে | কেটে নিছে ভুরু।[৬৭] ৮ + ৮ + ৬

উপর্যুক্ত এই উদ্ধৃতিগুলোতে দেখা যাচ্ছে রুদ্রের রচনায় শুধু ছন্দেরই দৃঢ়তা নয়, বৈচিত্র্যও এসেছে বিষয়বৈচিত্র্যে এবং ছোট গল্পের মতো খণ্ডিত জীবনভাষ্যে; গল্পের মতো করে তাঁর গদ্যও এখানে অনেকটা গদ্যধর্মিতার প্রবণতা এসে গেছে; তবু নিটোল বিন্যাসে তাতে ছন্দের গতিবেগ আরো বেশি সঞ্চারিত করেছে; ছন্দের এতটুকু বিচ্যুতি ঘটেনি।

রুদ্রের 'গল্প' (১৯৮৭) কাব্যগ্রন্থে যে সমস্ত গল্পমূলক কবিতা আছে, সবগুলোই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্রাবৃত্তের ধীর লয়ে কবি জীবনের অসঙ্গতি, প্রেম, নারী ও প্রকৃতির মূল্যহীনতা; চলমান যান্ত্রিক সভ্যতার মেকিপনা ও সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। "পাখিদের গল্প", "সকালের গল্প", "শাড়ি কাপড়ের গল্প", "নারী ও নদীর গল্প", "কবিতার গল্প", "মিছিল ও নারীর গল্প", "চিঠি পত্রের গল্প", "দাম্পত্যকলহের গল্প", "দ্বিধার গল্প" ও গাছ গাছালির গল্প", প্রতিটি কবিতাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের (৬ + ৬ +২) পর্বে বিভক্ত। মাত্রাবৃত্তের ছয় পর্বের প্রতি কবির অনুরক্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এখানেও বিদ্যমান। আবার পংক্তির শেষে অন্ত

মিল না থাকলেও রুদ্র এখানেও চার পংক্তির স্তবক গড়েছেন প্রতিটি কবিতায়। কবিতাগুলোয় একটা কোমল ও স্নিগ্ধ আবহের সৃষ্টি করেছে; যা পাঠকের আবৃত্তির প্রবণতা এবং সাম্যজীবনের সেতু বন্ধনে বাঁধার উন্মত্ত বাসনায় সিক্ত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও ছন্দ বিন্যাস দেখানো যেতে পারে :

ক. সন্ধ্যায় চলো | মহুয়া ফুলের | বনে, ৬ + ৬ + ২
উঠাই দুজনে | চোলাই মদের | হাড়ি। ৬ + ৬ + ২
জোস্না যদি বা | না-ও ফোটে আস | মানে, ৬ + ৬ + ২
আমারা দুজনে | ফোটাবো জোস্না | -শিখা।[৬৮] ৬ + ৬ + ২

খ. তোমার জীবন | আটকা পড়েছে | জালে ৬ + ৬ + ২
তোমার স্বপ্ন | আটকা পড়েছে | জালে ৬ + ৬ + ২
তোমার শরীর | আটকা পড়েছে | জালে ৬ + ৬ + ২
তোমার স্নায়ুরা | আটকা পড়েছে | জালে- ৬ + ৬ + ২

তুমি জানো তুমি | নিরুপায় মাছি | নও, ৬ + ৬ + ২
তোমার স্বপ্ন | সচেতনাতার | ভাষা ৬ + ৬ + ২
ভেঙে দিতে চায় | ভাঙা জীবনের | ভিত ৬ + ৬ + ২
তুমি জানো তুমি | মিছিলের এক | জন।।[৬৯] ৬ + ৬ + ২

গ. কেন তন্ত্রের | নূপুরে এতোটা | ধ্বনি, ৬ + ৬ + ২
উল্টো কাছিম | এতো অসহায় | কেন, ৬ + ৬ + ২
কেন এতো মেঘ | সূর্যের চারি | পাশে, ৬ + ৬ + ২
বাতাসে বা কেন | ভাসে বারুদের | ঘ্রান, ৬ + ৬ + ২

অগ্নিগর্ভা | সময়ের অনু | বাদ ৬ + ৬ + ২
তপ্ত রক্তে | লেখা হৃদয়ের | ক্ষোভ, ৬ + ৬ + ২
প্রতিদিন আমি | তোমাকে জানাতে | চাই- ৬ + ৬ + ২
চিঠি গুলো তাই | চুরি হয়ে যায় | রোজ।।[৭০] ৬ + ৬ + ২

এ-কাব্যের "অনুতপ্ত অন্ধকার" ১–৬ নং কবিতাগুলো আবার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ারে রচিত। ভাঙন- গড়ন, বেদনা-হাহাকার, অপ্রাপ্তি-অনুশোচনা, আকাঙ্খা-বিশ্বাস এ ছন্দের নিবিড়ে ব্যক্ত

হয়েছে। ছয়টি কবিতাই ষোল পংক্তির করে এবং চার পংক্তির একটি স্তবকে গঠিত; পূর্বাপর ছন্দের কাঠামো বজায় থেকেছে। নিম্নে ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

রাত নামে, মৃত্যুময় | রাত নামে শরীরের ঘরে,	৮ + ১০
এই রাত জোস্নাহীন, | জোনাকিও নেই এই রাতে।	৮ + ১০
কেবল আঁধার এক | ভাঙনের বিশাল আঁধার,	৮ + ১০
কেবল মৃত্যুর ছায়া | স্বপ্নমগ্ন দুটি চোখ জুড়ে।	৮ + ১০
জানিনা গোলাপ ভেবে | বিষফুল করবীর স্মৃতি	৮ + ১০
কখন দিয়েছি তুলে | হেমলক-জীবনের ভার,	৮ + ১০
কখন নিয়েছি টেনে | ঘুনেজীর্ন উষর অতীতে-	৮ + ১০
আজ শুধু শোচনার | ম্লান শিখা সেঁজুতি সাজায়।[৭১]	৮ + ১০

'ছোবল' (১৯৮৬) ও 'দিয়েছিলে সকল আকাশ' (১৯৮৮) কাব্য দুটিতে গদ্য কবিতার সংখ্যাই বেশি। আশির দশকের স্বৈরাচারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। "ইশতেহার", "দ্বিধাগ্রস্থ দাঁড়িয়ে আছি", "কুশল সংবাদ", "প্রতিবাদ পত্র ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী' ৮৩", "লাশগুলো আবার দাঁড়াক", "মুখোমুখি", "কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প", "পোস্ট মর্টেম", "সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি", "চরিত্র বদল", "ঘোষনাঃ ১৯৮৪", "শিকল সামাজিক", "পৃথক প্রবেশ", "আকাশ বদল", "স্বাস্থ্য সম্মত প্রত্যাখ্যান", "কানামাছি ভোঁ ভোঁ", "ফাঁদে অন্ধকারে", প্রভৃতি কবিতাগুলো মাত্রাবিন্যাস থেকে মুক্ত। তবে কিছু কিছু কবিতায় মুক্তক ছন্দ, পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মিশ্রিত রূপ বর্তমান। রুদ্র সময়ের দাবি মেটাতে গিয়ে কবিতার চরণে আবেগ ঢেলে দিয়েছেন। এ গুলো কবিতার শৈল্পিক মূল্য নেই; ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ছন্দবদ্ধ নিটোল ভাবের মূল্য নেই, নরক যন্ত্রণায় স্বর্গের সুখের প্রত্যাশা করে না পাঠক; তাই রুদ্র গদ্য কবিতার পথ বেছে নিলেন। গণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়ালেন; সাধারণ মানুষের মতো করে কবিতার ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন। এ কবিতাগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত আবেগ সঞ্চারিত হওয়ার অতিকথন এবং সংবাদ প্রতিবেদনধর্মী হয়ে গেছে।

অবশ্য এ দুটো কাব্যেও রুদ্র ছন্দ তিরোহিত নন; এখানেও মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের সমাবেশ ঘটেছে। "কালোকাঁচ গাড়ি", "এই জল এই দুঃসময়", "একজন উদাসীন", "বেহুলার সাম্পান", "মরীচিকা বোধ", "সেই এক রোদের রাখাল", "বৈশাখের নাগর দোলায়", কবিতাগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। আবার "আল্লাহতালার হাত", "নপুংশক কবিদের প্রতি", "মিছিল", "অস্ত্র চাই", "দুষিত দুপুর", "শ্মশান", "ফিরে এসো নিশ্চয়তা", "মগ্নচিতা" কবিতাগুলো অক্ষরবৃত্তের অমিল প্রবহমাণ ছন্দে রচিত। "দূরে আছো দূরে" কবিতাটি অমিল পয়ার ছন্দের। "চাঁদে পাওয়া", "দুঃস্বপ্নের দালান কোঠা", "উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার",

"পরানে চাই দখিন হাওয়া", "দৃশ্যকাব্য-১", "দৃশ্যকাব্য-৩" কবিতাগুলো স্বরবৃত্ত ছন্দের। এখানেও যে সব কবিতা রাজনীতির উত্তপ্ততায় রচিত; ছন্দের গাঁথুনির মধ্যেও তা পানসে এবং শিথিলতাবদ্ধ এর বাইরে যুগপত চিন্তা ও ঐতিহ্য নিয়ে রচিত কবিতাগুলো অনন্য সাধারণ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল :

(১) তোমাকে পাবার | প্রস্তুতি আনে | বোধ, ৬ + ৬ + ২
দুঃখকে তাই | শাসাই রুক্ষ | স্বরে, ৬ + ৬ + ২
বেদনাকে তাই | মোড়াই কাফনে | শাদা- ৬ + ৬ + ২
তোমাকে রাখার | পরিসর গড় | প্রানে। ৬ + ৬ + ২

মন্বন্তরে | অন্তরে যতো | ক্লেদ, ৬ + ৬ + ২
মৃত সবুজের | যতো পরাজিত | বোঝা, ৬ + ৬ + ২
যতো পুরাতন | পচনের ঝুল | কালি, ৬ + ৬ + ২
ঝেড়ে মুছে কিছু | করি তারে উজ | জ্বল।[৭২] ৬ + ৬ + ২

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ৬ + ৬ + ২ পর্বে বিভক্ত; ধীরলয়।

(২) নরোম আলোর চাঁদ | মরে যায় অঘ্রানের রাতে, ৮ + ১০
বেঁচে থাকে ভালোবাসা, | নক্ষত্রের আলোকিত স্মৃতি। ৮ + ১০
তোমার শূন্যতা ঘিরে | দীর্ঘশ্বাস, বেদনার ঘ্রান, ৮ + ১০
তোমার না- থাকা জুড়ে | জেগে থাকে সহস্র শ্মশান ।।[৭৩] ৮ + ১০

অক্ষরবৃত্তের অমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মাত্রা বিন্যাস ৮ + ১০ লয়ধীর।

(৩) তোমাকে পারিনি ছুঁতে | -আমার তোমাকে, ৮ + ৬
ক্ষ্যাপাটে গ্রীবাজ যেন, | নীল পটভূমি ৮ + ৬
তছনছ কোরে গেছি | শান্ত আকাশের। ৮ + ৬
অঝোর বৃষ্টিতে আমি | ভিজিয়েছি হিয়া-[৭৪] ৮ + ৬

অক্ষরবৃত্তের পয়ার ছন্দ। লয় ধীর।

(৪) সিরামিকের | গাছগাছালি, ৪ + ৪
ইটের ঝাউ | বনের ভিতর ৪ + ৪
কোথায় আমি | খুঁজবো তোমায়? ৪ + ৪

কোথায় তোমার | সৌম সকাল, | শান্ত দুপুর? ৪ + ৪ + ৪
কোথায় তোমার | মুখর বিকেল, | একাকি রাত?[৭৫] ৪ + ৪ + ৪

স্বরবৃত্ত ছন্দের লয় দ্রুত।

রুদ্রের 'মৌলিক মুখোশ' (রচনা সমগ্রের সাথে' প্রকাশ, ১৯৯২) কাব্যের মধ্যে বেশ কিছু স্বরবৃত্ত ছন্দ দেখা যায়। তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতিও যে আগ্রহশীল, এ কাব্য তার প্রমাণ দিচ্ছে। "সামঞ্জস্য", "ক্রাচ", "যুগল দোলনা", "স্বপ্নের বাস্তুভিটে", "পরকিয়া", স্বকালের অন্ধকার" ও "পলায়ন" কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দের। ব্যক্তি ও সামাজিক সঙ্কটগুলো রুদ্র এ-ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন; স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ কবি আকাঙ্খার স্বপ্ন দেখেন। ছন্দ বিন্যাসসহ কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

ক. তুমি বরং | কুকুর পোষো; ৪ + ৪
প্রভু ভক্ত | খুনসুটিতে | কাটবে তোমার | নিবিড় সময়। ৪ + ৪ + ৪ + ৪
তোমার জন্যে | বিড়ালই ঠিক, ৪ + ৪
বরং তুমি | বিড়াল পোষো- ৪ + ৪

খাঁটি জিনিশ | চিনতে তোমার | ভুল হয়ে যায়, ৪ + ৪ + ৪
খুঁজে এবার | পেয়েছো ঠিক | ঠিক ঠিকানা। ৪ + ৪ + ৪
লক্ষ্মী-সোনা, | এখন তুমি | বিড়াল এবং | কুকুর পোষো। ৪ + ৪ + ৪ + ৪
শুকর গুলো | তোমার সাথে | খাপ খেয়ে যায়, ৪ + ৪ + ৪
কাদা ঘাটায় | দক্ষতা বেশ | সমান সমান।[৭৬] ৪ + ৪ + ৪

খ. স্নায়ু এখন | উড়ির চরের | মঞ্চসজ্জা, ৪ + ৪ + ৪
খুলির নিচে | বিআরটিসির | বাস পুড়ছে, ৪ + ৪ + ৪
শরীর জুড়ে | টলটলোমান | ক্ষীপ্তদারু, ৪ + ৪ + ৪
আমার এখন | তোমাকে চাই।[৭৭] ৪ + ৪

গ. স্বৈরাচারে | ছিন্নভিন্ন | দেশটি তবু | স্বপ্ন থাকে, ৪ + ৪ + ৪ + ৪
অবহেলায় | ধুলোয় পড়া | বীজটিতেও | স্বপ্ন থাকে। ৪ + ৪ + ৪ + ৪
তুমি আমায় | ছেড়ে যাচ্ছো, | ভুলে যাচ্ছে, ৪ + ৪ + ৪
তবু আমার | স্বপ্ন থাকে।[৭৮] ৪ + ৪

রুদ্রের 'মৌলিক মুখোশ' কাব্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের স্থান দখল করেছে গদ্য কবিতা। শুরুতে হয়তো কবি মাত্রাবৃত্তে আরম্ভ করেছেন, শেষের দিকে আবার ছন্দহীন হয়ে গেছে; আবার হয়তো অক্ষরবৃত্তে শুরু করেছেন, মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে মিল থাকলো না। সেজন্য রুদ্রের গদ্য কবিতাগুলো পুরোপুরি গদ্য নয়। জীবন যাত্রার জটিলতায় মানসিক সচেতনতাবোধ জাগাতে গিয়ে অনেক কবিতা গদ্য হয়ে গেছে; কবি গুরুগাম্ভীর্য ভাবের মধ্যে থাকতে পারেননি। পুরোপুরি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এসেছে তিনটি কবিতায় "খতিয়ান", "বেয়াড়া শোকের চুল" ও "অবচেতনের পথঘাট"। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবহমান মহাপয়ার এসেছে "যোগ্যতা", "গলে যাচ্ছে মুহূর্ত সময়", "এক্‌স্‌রে রিপোর্টি" কবিতায়। এ ছাড়া "ময়নাতদন্ত", "ক্রান্তিকাল", "রূপকথা", "ফিরে দাঁড়াও দেয়াল", "পান করো রাত্রি", "আগুন ও বারুদের ভাষা" প্রভৃতি কবিতা গুলো গদ্য-পদ্যের মিশ্রিত রূপ। একটি দৃষ্টান্ত :

তুমি- মানে ঝলোমলো, হিরক ব্যর্থতা,
মানে ছিন্নমূল দুপুরের ফুটপাতে ডালরুটি নয়
আলস্যের মেদ মেখে বেড়ে ওঠা শোভন জীবন,
ঘুষ, কালোটাকা,
মানে ককটেল পার্টি,
মানে বন্ধুরা পত্নির কাঁধে হাত, আবডালে ছোঁয়া ছুঁয়ি.....
মানে কন্যার স্বামীর সাথে মা উধাও
ব্রু-ব্রু-
তবু, রমনীরা সতিসাধ্বি, পত্নিপরায়ন স্বামী।[৭৯]

পুরোপুরি মাত্রাবৃত্ত হয়নি, আবার গদ্য কবিতাও নয়। এতে ছন্দের প্রবাহটাই বেশি। এক গ্লাস অন্ধকার (রচনা সমগ্র-এর সাথে প্রকাশ ১৯৯২) কাব্যে রুদ্রের ছন্দ ভাবনা বিস্তার লাভ করেছে; কবি ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন। বিশেষ করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পয়ার বৈচিত্র্যের প্রতি কবির আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কবিতাগুলো পড়লে মনে হবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের; অথচ কবি দ্বিপদী ও ত্রিপদী পংক্তির সাহায্যে প্রবহমান পয়ার ছন্দ নির্মাণ করেছেন। "আমরা অনার্য", "বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে", "ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা", "এক গ্লাস অন্ধকার", "প্রজাপতির স্বভাব", "খেলাধুলার সরল অংক", "তছনছ বিশ্বামিত্র", "নদীর ওপারে থাকে রোদ", "কথা ছিলো সবিনয়", "পথ ছাড়ো", "সাধারণের নিয়মরীতি", "বিচারের কথা কেউ বলছেনা কেন", "মিছিলে নোতুন মুখ" প্রভৃতি কবিতাগুলো অক্ষরবৃত্ত ছন্দের; অধিকাংশগুলোই অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ারের। কিন্তু কিছু কবিতায় মহাপয়ারের পর্ব সংখ্যা সম্প্রসারিত হয়ে গেছে; আবার কিছু

কবিতায় পর্ব সংখ্যা সংকুচিত হয়ে গেছে। তবে সম্প্রসারিত কবিতাগুলোর মধ্যে “পথ ছাড়ো”, “সাধারণের নিয়মরীতি”, “বিচারের কথা কেউ বলছে না কেন”, “মিছিলে নোতুন মুখ” এ সবের পর্ব সংখ্যা বেড়ে -আট-আট-দশ পর্যন্ত হয়েছে। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৯৭-১৯৮৬) আট-আট পর্ব সংখ্যার পংক্তিকে বলেছেন “আট-আট-মাত্রার প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্‌তিক্ত”[৮০] রুদ্র এ ছন্দও রচনা করেছেন; পাশাপাশি আট-আট-ছয়, আট-আট-দুই এবং দশ-ছয় মাত্রার প্রবহমাণ ত্রিপদী পংক্তিও রচনা করেছেন। তবে রুদ্রও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আসমান, ভীমরুল, এইখানে, আমবনে, দেখলাম, একটুও, ওইসব প্রভৃতি শব্দকে চারমাত্রা ধরেছেন; জীবনানন্দ দাশও তাই ধরেছেন; তাঁরা এগুলোকে মুক্তাক্ষর হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

ক. বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে | তুমি টের পেয়ে গেছো — ৮ + ৮
খাবার টেবিলে বোসে | তুমি টের পেয়ে গেছো [৮১] — ৮ + ৮

খ. বিচারের কথা কেউ | বলছে না কেন আজো | সুতীব্র ভাষায়? — ৮ + ৮ + ৬
কোথায় লুকালো তারা | রক্তমাখা হাত নিয়ে | কার হেফাজতে? — ৮ + ৮ + ৬
খুনিরা কোথায়? রাজ | পথ দেখতে চাইছে | নির্মোহ বিচার। — ৮ + ৮ + ৬

উড়ে এসে জুড়ে বসা | একটি দশক ধরে | হত্যা নিপীড়ন, — ৮ + ৮ + ৬
শ্বাসরুদ্ধ, কণ্ঠরুদ্ধ, | স্বেচ্ছাচারে কলঙ্কিত | পুরোটা সময়- — ৮ + ৮ + ৬
তসরুপ হরিলুটে | যারা ছিলো ব্যতিব্যস্ত | পেয়ারা গোলাম, [৮২] — ৮ + ৮ + ৬

গ. সেখানে অপেক্ষা কোরে আছে | এক নিমগ্ন বাউল স্নিগ্ধ | এক তারা হাতে, — ১০ + ১০ + ৬
সেইখানে পাখিদের জন্যে | কোনো খাঁচা কেউ ভালোবেসে | নির্মান করেনি। — ১০ + ১০ + ৬
সেখানে নদীর নাম ভালো | বাসা, তরুদের খোলামেলা | ডাক নাম প্রেম, — ১০ + ১০ + ৬
বিশ্বাস বন্ধুর মতো কাঁধে | হাত রেখে হাটে, সেইখানে | ফোটে শত ফুল। [৮৩] — ১০ + ১০ + ৬

এ-কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে “পাখিদের কথা ভেবে ডানা মেলে দিই ০১–০৭”, “পারলৌকিক মুলো”, “বাগের হাট”, “স্বপ্নগ্রস্ত/ফিরছি স্বদেশে শ্রান্ত সিন্দাবাদ”, “কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি”, “মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে”, কবিতাগুলো। রুদ্রের অন্যান্য কাব্যের মতো এ-কাব্যেও ছয় মাত্রার প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত। দু'টি দৃষ্টান্ত:

ক. শুয়ে আছে যেন | সবুজ পাহাড়ে | রেশমের মতো | ঘাসে- — ৬ + ৬ + ৬ + ২
চোখে কি স্বপ্ন? | না স্মৃতির খুব | গহনে তলিয়ে | আছো? — ৬ + ৬ + ৬ + ২

নাকি তুমি ওই | পাহাড়ে বাঁশির | সুর হয়ে গেছো নিজে! ৬ + ৬ + ৬ + ২
আমি শুয়ে আছি | সবুজ পাহাড়ে | রেশমের মতো | ঘাসে।[৮৪] ৬ + ৬ + ৬ + ২

খ. ঘুমের ভেতর | ঘুমিয়ে আবার | স্বপ্ন দেখতে | থাকি, ৬ + ৬ + ৬ + ২
কী অবাক সেই | স্বপ্নদৃশ্যে | আবার ঘুমিয়ে | পড়ি। ৬ + ৬ + ৬ + ২
এইভাবে ঘুমে | স্বপ্নেও ঘুমে | ঘুম ও স্বপ্ন | চলে, ৬ + ৬ + ৬ + ২
অন্ধ বধির | দৈত্যটি ঘাড়ে | চেপে থাকে অবি | কল।[৮৫] ৬ + ৬ + ২

আবার "কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি" ও "মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে" কবিতায় অন্ত্যমিল দেয়ার চেষ্টাও বর্তমান। যেমন-

ক. কুড়িয়ে পেয়েছি | একটি আধুলি, | আর অর্ধেক | পেলে, ৬ + ৬ + ৬ + ২
হাতল আঁকড়ে | উঠে যেতে পারি, | দুঃস্বপ্নের | মেলে।[৮৬] ৬ + ৬ + ৬ + ২

খ. স্রোত থেমে যাবে, | পথ বদলাবে | অতিথি পাখির | ঝাঁক ৬ + ৬ + ৬ + ২
মৃত মাছেদের | শরীরের খোঁজে | আসবে মাছিও | কাক।[৮৭] ৬ + ৬ + ৬ + ২

গ. পাতা ঝ'রে যাবে, | শিশু হাসবে না, | নদী ঢেকে যাবে | চরে, ৬ + ৬ + ৬ + ২
মৃত মাছেদের | শরীরের খোঁজে | মাছিরা আসবে | ঘরে ॥[৮৮] ৬ + ৬ + ৬ + ২

"চুটকি" ১নং থেকে ৫নং কবিতাটি আবার একেবারে পয়ার ছন্দের এবং অন্ত্যমিলও আছে। যেমন-

মেয়েটি ভীষন পাজি, | বেয়াড়া দু'চোখ, ৮ + ৬
অকারনে চারপাশে | বেশরম ঝোঁক। ৮ + ৬
সেকারনে সুখে আছি | নাদান শায়ের, ৮ + ৬
আমার কিছুই নয়, | আমার ভায়ের ॥[৮৯] ৮ + ৬

'বিষ বিরিক্ষের বীজ' ('রচনা সমগ্র'-এর সাথে প্রকাশ, ১৯৯২) কাব্যনাট্য। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচিত। এ-কাব্যনাট্যের মধ্যে রুদ্রের ছান্দমিক মনের পরিচয় বিদ্যমান। অক্ষরবৃত্তের অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ার ছন্দের পরিমাণ বেশি হলেও এবং মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের উপযোগী করে রুদ্র ছন্দ বিন্যাস করেছেন; যেখানে গভীর তাৎপর্য সেখানে মাত্রাবৃত্ত; আবার যেখানে চঞ্চল ও আবেগের ঝংকার প্রয়োজন সেখানে স্বরবৃত্ত ছন্দ নির্মাণ করেছেন; সর্বত্র একটা নাটকীয় ছান্দিক অনুভূতির দ্যোতনায় গণ মানুষের কাছাকাছি এবং স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য শব্দ ও ছন্দের কুশলতায় গভীর উপলব্ধির

প্রেক্ষাপট ও চিন্তাশীল অভিজ্ঞতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে এ কাব্যনাট্যে। কয়েকটি ছন্দ বিন্যাস দেখানো যেতে পারে :

ক. আবেগের কথা থাক, | অনেক হয়েছে দায়দেনা। ৮ + ১০
কয়েক পুরুষ ধ'রে | আমাদেরে জোঁকের মতোন ৮ + ১০
শুষে শুষে শাঁস রক্ত | নিয়ে গেছে সব। চড়াসুদে ৮ + ১০
বিপদে সাহায্য দিছে, | বিনিময়ে নিয়েছে জমিন। ৮ + ১০
আমারা হয়েছি জমি | হারা, ঠিকা কামলা, মজুর- ৮ + ১০
এই যে আক্কেল মিয়া, | কতো টাকা জমায়ে রেখেছো?[৯০] ৮ + ১০

অমিল প্রবহমাণ মহাপয়ার ছন্দ। গদ্যের অনুভূতি প্রবল।

খ. আহা, আহা, শোনো, শোনো | হয়োনা উতল। ৮ + ৬
বাহিরে আগুন আমি, | অন্তরে শীতল ॥ ৮ + ৬
আমি যে বিষের নেশা | জানে সর্বজন। ৮ + ৬
সাপ কোপ জন্তু ভরা | আমি এক বন॥ ৮ + ৬
আমার ভেতরে তুমি | হারাবেই পথ। ৮ + ৬
যেমন হারায়ে ছিলো | খানেদের রথ॥[৯১] ৮ + ৬

পায়ার ছন্দ। অন্ত্যমিল বর্তমান। গ্রামীণ চরিত্রের উপযোগী এবং লয় দ্রুত।

গ. মিষ্টি কথায় | ভুলছিনা গো | ভুলছি না, ৪ + ৪ + ৩
রসিক নাগর | বাঁধন আমার | খুলছি না। ৪ + ৪ + ৩
প্রলোভনেও | নোঙর খানা | তুলছিনা, ৪ + ৪ + ৩
একটুখানি | ঢেউ দিলে আর | দুলছিনা, ৪ + ৪ + ৩

স্বরবৃত্ত ছন্দ। ছড়ার গড়ন এবং দ্রুত লয়।

ঘ. আহারে! হাজার | বিলাপে কি ফিরে | তারে পাবি বোন? ৬ + ৬ + ৬
যে যাবার সে তো | গেছে। কতো, কতো | যে মায়ের বুক ৬ + ৬ + ৬
খালি হয়ে গেল | আজ-হায়রে ম | রন স্বাধীনতা! ৬ + ৬ + ৬
পোলাডার বাপ | মরলো যেবার-[৯৩] ৬ + ৬

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। লয় ধীর এবং শোকের অনুভূতি।

এভাবে রুদ্রের কবিতায় তিনটি ছন্দই স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। তবে প্রথমাবধি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দই ব্যাপকভাবে তাঁর লিরিক হর্ষরণনের নিবিড়তায় একাত্ম হয়ে আছে একেবারে শেষাবধি পর্যন্ত। মাঝে অবশ্য স্বৈরশাসনের কালে সামান্য কিছু গদ্য কবিতা ছাড়া রুদ্র ছন্দেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পয়ার বৈচিত্র্যের তিনি অনুশীলন করেছেন। আবার প্রাচীন পয়ার এবং প্রবহমান পয়ারও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক পর্যারে কিছু মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দও রচনা করেছেন।

(৩)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সহজবোধ্য কবিতার রূপায়ণে আগ্রহী। জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা পরিহার করে গণ মানুষের উপযোগী কবিতা রচনা ছিলো তাঁর প্রয়াস। তারপরও শব্দ ও ছন্দ কুশল কবি অলঙ্কার ব্যবহারেও ছিলেন সিদ্ধ এবং কবিতার গভীর গীতলতায় অলঙ্কারের মূর্ত প্রকাশে রুদ্র জীবনের ব্যঞ্জনার রণন ধ্বনিতে আবেগের সঞ্চার করতে পেরেছেন। কবিতার শ্রীবৃদ্ধিতে রুদ্র শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার দুটোই ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দালঙ্কারের প্রতি রুদ্র সব সময় যত্নশীল এবং ধ্বনিগত সাম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে গভীর উপলব্ধি এবং আবেগহীন সংযতভাব কবিতার শরীরে কারুকার্যের মননজাত ঘটায়, তাঁর কবিতায় সে-টা আশা করা যায় না; স্বল্পায়ু এবং চলমান জীবনের ক্ষিপ্রতা- সে আশার গভীরে নিরাশার বীজ বপনে সদা ছিলো ব্যস্ত। শব্দালঙ্কারের মধ্যে তিনি অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন ইচ্ছা মাফিক। ধ্বনির ব্যঞ্জনাময় অলঙ্কার যেহেতু শব্দালঙ্কার; সেহেতু রুদ্র এ অলঙ্কারের অনুপ্রাস প্রয়োগ কেরছেন অজস্র। তাঁর কবিতায় একই ধ্বনি এবং ধ্বনিগুচ্ছের- পুনঃ পুনঃ ব্যবহার পাঠক হৃদয়ে শ্রুতিমধুর অনুরঞ্জনে করেছে আবেগায়িত। সে জন্য তাঁর অসংখ্য কবিতা আবৃত্তির জনপ্রিয়তায় প্রসিদ্ধ। সেটা শুধু চলমান জীবনের দাবিই মেটায়নি; হৃদয়ের গভীরেও পৌঁছে দিয়েছে কবিতার উর্বর আত্মজৈবনিক চাষাবাদকে। অন্ত্যানুপ্রাস যদিও আধুনিক কবিদের বিষয় নয়; রুদ্র এই অলঙ্কারও প্রয়োজনে প্রয়োগ করে শ্রোতাদের মনে রেখাপাত সৃষ্টি করেছেন এবং কবিতার অন্ত্যমিলে শব্দ এবং ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

অন্ত্যানুপ্রাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

ক. পুঁজিবাদ বলে: বাদ, আর সব বাদ,
আমার শরীর দ্যাখো কেমন নিখাদ। [১৪]

খ. শ্রমিকের পেশী নেই, মাংশ নেই গায়,
হাড্ডিসার হাতগুলো বৈঠা টেনে যায়। [১৫]

গ. আহারে! গেরামটারে উল্টেপাল্টে দিয়ে সাহাবাড়ি
ঘাঁটি গেড়ে বসলো খানেরা। কলস কলস তাড়ি
দিয়ে আসি রোজ সন্ধেবেলা, মাঝেমধ্যে কোনোদিন
বকুলিরে রেখে আসি। সে-যে কী দোজখ! সাতদিন
তারপর বিছানায় প'ড়ে থাকে, উঠতে পারেনা।

ঘ. অতসব প্যাচ ঘোচ বুঝিনা কিছুই,
আমার কেবলি ইচ্ছা নদীটারে ছুঁই।
শত পথ পাড়ি দিয়ে সেই নদী যায়,
জীবনের শান্তি হয়ে সাগরে হারায়। [৯৭]

ঙ. প্রতিশ্রুতি পতাকার মতো ওড়ে ওই,
নিসর্গের হিয়া সাক্ষী জনতার হাত,
দিতে হবে রাত্রি ছিঁড়ে স্বাধীন প্রভাত
অঙ্গিকার ভঙ্গ তুমি করোনা নিশ্চয়ই।

রক্তের কালিতে লেখা বিজয়ের গান,
ভুলে গেলে ঝলসাবে বুকের আগুন।
কুমারীর গর্ভে ফের জন্ম নেবে ভ্রূন,
নিমেষে সাবাড় হবে সুখের বাগান।

কয়জন ছুঁতে পারে সাপের মাথায়
সাবধানে রেখে দেয়া অমূল্য মানিক!
সাহস সাহসী হয়ে জয়মাল্য নিক,
কারুকাজ তোলা তুমি কালের কাঁথায়

আমাদের সুরে গান গলায় ধরেনা,
অঙ্গিকার ভঙ্গ তুমি নিশ্চই করোনা ॥[৯৮]

চ. রক্তের দাগ দেখেছে কবিতা
চোখ জুড়ে তাই এতো নিরবতা, [৯৯]

ছ. মাটিতে আমার রক্তের বীজ বুনি
মাটিতে আমার জন্মের গান শুনি,
ভাঙা জীবনের কংকালে ওড়ে আগামীর শুভদিন। [১০০]

জ. রূপোলি গাঁয়ের বধূ
হরগাজা কেয়া মধু
নীরবে ভালোবেসে যুঁই বকফুল
কেতকী পরশ বুলায়
আমের মুকুল।[১০১]

ঝ. তোমার মতো আমারও আছে
ক্যামেরার মতো চক্ষু আছে
ফিল্‌মের মতো হৃদয় আছে
ফ্রেমে রাখা ছবির মতো স্মৃতি আছে
আমারও হৃদয় আছে
আমারও ছবি আছে
ছবি আছে।[১০২]

রুদ্রের কবিতার মধ্যে ছেকানুপ্রাস বা একই ধ্বনিগুচ্ছের সংযুক্ত অথবা বিযুক্তভাবে মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হতে আমরা দেখি। যেমন :

ক. তবু পৃথিবীতে রাত নামে নিবিড় তুষারের মতো,
তুমি শুধু উড়ে চলো ক্লান্তিহীন, তন্দ্রাহীন
অন্য এক সকালের দিকে।[১০৩]

খ. মাটি জানে, বৃক্ষজানে, আমি ভুল ভালবেসে
অন্ধকারে নষ্ট ফলের মতো ঘুনপোকা পুষেছি বুকের ভেতর।[১০৪]

গ. শিথানের জানালা খুলে রেখে যাবো একটি চোখ,
শিশির চুমু খাবে চোখের উত্তাপে-চুমু খাবে।[১০৫]

ঘ. রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,
হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।[১০৬]

ঙ. রক্তলগ্ন নগ্ন ক্ষোভে কাপে বিষন্ন বন্দর।[১০৭]

চ. তনু ঘিরে তার জ্বলবে আঁধার, অন্ধ বন্ধ পাখা?[১০৮]

ছ. কাপুরুষ বিনাসিত হলে,
ওদের কবরে জন্ম নেবে আগামীর গুচ্ছ গুচ্ছ সাহসী সন্তান।[১০৯]

জ. ভাঙো তোমার পায়ের শিকল ভাঙো
সোনায় মোড়া খাঁচার কারাগার।[১১০]

ঝ. টবে ওদের ফুলের বাগান, ঘরের মধ্যে নারী।
মাতাল, চল পাতাল যাই।[১১১]

ঞ. মাটিতে চুমু দিয়ে পাই
রক্তের তাজা তাজা গন্ধ।[১১২]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর কবিতায় বৃত্তানুপ্রাস বা ব্যঞ্জনধ্বনি ও ধ্বনিগুচ্ছের যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত অথবা বিযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন; ধ্বনির এই বহু অনুরণনে তাঁর কবিতায় লিরিক ঝংকার তুলেছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

ক. পরাজিত প্রেম তনুর তিমিরে হেনেছে আঘাত
পারিজাতহীন কঠিন পাথরে।
প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাথা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা-
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন![১১৩]

খ. এই তো মাধুরী, এই তো অধর ছুঁয়েছে সুখের সুতনু সুনীল রাত।[১১৪]

গ. হে পথিক, কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়,
নির্মান, নচিকেতা, বিনাশ, না, স্বাস্থ্য?
সারারাত কাঠ কাটে ঘুন পোকা গোপনে,
সারারাত ধরে তরু বোনে কিছু ফুলকে,
বোনে কিছু সকালের কুসুমের তনিমা-[১১৫]

ঘ. প্রিয়মুখ-প্রিয় পাখি- প্রিয় পাওয়া ফিরে যাবে
ভেজা চোখ করুন কাতর।[১১৬]

ঙ. আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি,
আমি দক্ষিন-বাম বুঝিনা, টার্ম বুঝিনা,
নির্বাচনের চার্ম বুঝিনা-
আমার এখন ভাতের দাবি।[১১৭]

চ. কুলীন সকল লীন হলো, কুকাজ দাঁড়ালো শেষে কাজে,
কুমীর হিংস্রতা ভুলে মীর হয়ে মাথায় পরলো টুপি।
কুমারীরা অতিদ্রুত মারী মন্বন্তরে গেলো ভেসে,
কুমন্ত্রনা অতপর মন্ত্রনার মর্যাদা জোটালো-[১১৮]

ছ. ঘাটাঘাটির ঘনঘটায় তোমাকে খুব তৃপ্ত দেখি,
তুমি বরং ওই পুকুরেই নাইতে নামো-
পংক পাবে, জলও পাবে।[১১৯]

জ. তার বুকে ছিলো উপরে ওঠার স্বপ্ন
যে স্বপ্ন সবার।
যে স্বপ্ন একজন শ্রমিকের
যে স্বপ্ন একজন কেরানির
যে স্বপ্ন একজন মিল মালিকের
তারও সেই স্বপ্ন ছিলো
স্বপ্ন সবারই থাকে।[১২০]

বক্রোক্তি অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ কাকু-বক্রোক্তি ব্যবহারের প্রতি প্রবল আসক্ত ছিলেন। চলমান করাল সময়ে কবির মনে যে নৈরাজ্য-হতাশার জাল বিস্তার হচ্ছিল; তাতে স্বাভাবিক সব কিছুকেই অস্বাভাবিক এবং মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় কবির মনে স্বস্থির বিশ্বাস দানা বাঁধতে পারেনি। আমাদের দেশের স্বার্থবাদী রাজনীতি মানুষকে প্রতারণা এবং ছলনার বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করেছে। সমাজ জীবনে সামরিকজান্তার কবলে পড়ে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ উন্নয়নে শুধু গলাবাজিই হয়েছে; দেশ মাতৃকার সেবার নামে ন্যাক্কারজনক আস্ফালন হয়েছে মাত্র। এই অবস্থায় রুদ্র ইতিবাচক সবকিছুকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে

দেখতে লাগলেন এবং নেতিবাচকই সমাজজীবনে ইতিবাচকের স্থান দখল করে নিলো। ফলে জীবনের প্রাপ্যবোধের ক্ষেত্রে যে ঘন অমানিশা; তা জগদ্দল পাথরের মতো কবির মনে আত্মসঙ্কটের সৃষ্টি করে। সেজন্য রুদ্রের কবিতায় বাঁকা কথা বেশি; সেই সূত্রে কাকু-বক্রোক্তির ব্যবহারও বেশি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. কতো আর এই রক্ত তিলকে তপ্ত প্রনাম!
জীবনের কাছে জন্ম কি তবে প্রতারনাময়?[১২১]

খ. ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে-
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?[১২২]

গ. স্বাধীনতা- এ কি তবে নষ্ট জন্ম?
এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?[১২৩]

ঘ. বিষাদে বিষাদে বেড়ে যায় বেলা,
মাধবীর তলা-শূন্য কি প'ড়ে রবে?
তবে, চোখে যার ছড়ায়নি রোদ,
সূর্যের কিছু রেনু,
তনু ঘিরে তার জ্বলবে আঁধার, অন্ধ বন্ধ পাখা?[১২৪]

ঙ. রাত থেকে নিদ্রাগুলো
লাল নক্ষত্রগুলো
স্বাধীনতাগুলো
কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। কেড়ে নিয়ে যাবে চিরকাল?[১২৫]

চ. আমরা কি কোনোদিন আর কোনো কথা বলবো না?
এরকম পরস্পরের মুখোমুখি বোসে থেকে থেকে
ছুটে চলা সময়ের ট্রেনে কোনোদিন আবার হবোনা মুখরিত?[১২৬]

ছ. এখানে তো পাখিহীন, পুষ্পহীন, উষর জীবন।
এখানে কি জল ছিলো কোনদিন, স্নেহ ছিলো?[১২৭]

জ. দুর্যোগের রাত্রি শেষে পুনরায় তুলেছি বসত,
চিরকাল তবু এই ভাঙনের শব্দ শুনে যাবো?[১২৮]

ঝ. আর কোন দোজখ বা আছে এর চেয়ে ভয়াবহ?
ক্ষুধার আগুন সে-কি হাবিয়ার চেয়ে খুব কম?
সে-কি রৌরবের চেয়ে নম্র কোন নরোম আগুন?[১২৯]

রুদ্র অর্থালঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপমা ও রূপকের প্রয়োগ করেছেন সবচেয়ে বেশি। দুটি ভিন্ন বস্তুর একই সাম্যসূত্রে গাঁথার জন্য সচেতন কবি মাত্রই তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে উপমা-রূপক এসব অলঙ্কার ব্যবহার করেন। রুদ্র উপমা প্রয়োগে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন; প্রাচীন উপমার স্থলে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সদা সজাগ ছিলেন। রুদ্র সবসময় গণ মানুষ ও মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন; এজন্য তাঁর উপমা প্রয়োগও বিপ্লব, মাটি ও মানুষের নিকটবর্তী। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. তবু সেই পাথরের অন্তর থেকে
কেঁদে ওঠে একরাশ জলের আকুতি,
ঝর্নার মতো তারা নেমে যেতে চায় কিছু মাটির শরীরে-[১৩০]

খ. এ-ও এক কণ্ঠলগ্ন প্রেম রক্তের গহনে,
মারমুখি জনতার মতো ভীষন বিক্ষুব্ধ।
যেন সমুদ্রের ঝড়,
সহজে উড়িয়ে নেবে মাস্তল মাল্লার মুগ্ধচিত্ত মোহন রমনী।[১৩১]

গ. পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান জ্ব'লে আছে ক্ষুধার মতোন,
ক্ষুধা তো বেঁচে থাকার অন্য নাম।[১৩২]

ঘ. যে- যুবক রাইফেলে ক্ষুব্ধ হাত বারুদের মতো তেজি বিস্ফোরন
বুকে নিয়ে ছুটেছে মাতাল- সে আর ফিরবেনা; সে আর ফিরবেনা.....
স্বজনের শুভ্রহাড় চারিপাশে ফুটে আছে ফুলের মতোন।[১৩৩]

ঙ. শিমুল শাখারা তবু এতো লাল হয়ে ওঠে আজো,
আজো এতো রক্তময় হৃদয়ের মতো শুস্ক বাতাসে ছড়ায়
লোহিত সুঘ্রান।[১৩৪]

চ. রৌদ্রে ফাটা মাটি তোকে ঢেকে নিলো গভীর তুষার,
সুঠাম ইটের মতো দহনের ক্ষতচিহ্ন দেহে নিয়ে তোর মাটি
সভ্যতার সরঞ্জাম হলো-[১৩৫]

ছ. বলো আমি কতোখানি প্রেম হবো, কতোখানি বিনিদ্র রাত
সাপের দাঁতের মতো কতোটুকু বিষাক্ত হবো স্বভাবে শরীরে। ১৩৬

জ. বান্ধা অন্ধকারে তবু মৃত মানুষের মতো বয়ে আনে শীত
বয়ে আনে কবরের হলুদ কাফনে বাঁধা একরাশ স্মৃতি।[১৩৭]

ঝ. সেই রাতে সমুদ্রের সফেদ ফেনার মতো একখানা হাত
মৃত্যুর গভীর থেকে তুলে এনেছিলো এক শস্যার্দ্র জন্ম,[১৩৮]

ঞ. দু'টি পাড় শূন্য চোখে ভাসে যেন কূল-ভাঙা গাঙের ভেলায়
আহত হরিন এক পচা মাংশেনীলপোকা তোমার পরানে।[১৩৯]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় উপমার চেয়ে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ বেশি। তিনি বস্তুগতভাবে উপমেয় এবং উপমানের ক্ষেত্রে উভয়ের ভিন্নতাকে কাল্পনিক শক্তিবলে অতিসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে কাব্যের গতিময়তা এবং কারুকার্যময় বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে কাব্যের গাম্ভীর্য এবং দীপ্তিময় দ্যোতির বিচ্ছুরণ প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও দেখা যাবে, গণমানুষ, মানুষের সংগ্রাম, জীবনের জটিলতা, মাটি ও দেশাত্ম অনুরাগ, রূপকের অন্তরালে কবির চাওয়া-পাওয়াকে বিমূর্ত করে তুলেছে। কবি সমাজিক আত্মসংকট ও ব্যক্তিক অনুভূতিগুলোকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর এর পশ্চাতে কাজ করেছে সাম্যবাদী প্রেরণা; রুদ্রের কবিতার নিবিড়ে এ প্রত্যয় ক্ষণিকের জন্যও অবসিত হয়নি। কয়েকটি রূপকের দৃষ্টান্ত :

ক. দেহের আগুন নয়, ক্ষুধার আগুনে পোড়া এই সব বুক,
জীবনের মাংশে এক বিষ ফোড়া, জীবনের গভীর অসুখ।।[১৪০]

খ. দুই ফোটা নোনাজল মিলে যাবে জীবনের অগনন ভিড়ে।
জোয়ারে ভাটায় নদী অবিচল শুধে যাবে পৃথিবীর ঋন।।[১৪১]

গ. ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।[১৪২]

ঘ. জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।[১৪৩]

ঙ. উজানি মাঝির পাঞ্জায় তবু বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে[১৪৪]

চ. আমার ভাষার কণ্ঠ রোধ কোরে আছে আজো চতুর শ্বাপদ,
আজো শুধু স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে উজ্জ্বল বিষন্ন ফুল।[১৪৫]

ছ. বিশাল আকাশটিরে কেটে নিয়ে রুগ্ন এক সুখের করাত-
আহা আজ নিসর্গের উদোম গলায় ঝোলে সোনা মোড়া হার![১৪৬]

জ. পৌঢ় পৃথিবীর নগ্ন খুলিতে পা রেখে এক অম্লানী যুবক,
করতলে মাটি ছুঁয়ে রক্তে মাংশে পেতে চায় শানিত আগুন।[১৪৭]

ঝ. ক্ষুধার শয্যা পেতে এক মন্বন্তরের ক্ষুধিত শকুন
মননের হাড় থেকে ছিড়ে খায় বোধি প্রেম, সুস্থতার মাংশ,[১৪৮]

ঞ. আমাদের স্বপ্নগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কাক ও শকুন। ১৪৯

সন্দেহ অলঙ্কার রুদ্রের কাব্যে অনেক এসেছে; তা কল্পনা ও বাস্তবের রূঢ়তায় সংমিশ্রিত। করাল গ্রাসে নিমজ্জিত আমাদের পাওয়াগুলো যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে; তখন কবির কবিতায় সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা-সংকোচ জাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে-টা কতোটুকু শোভাবর্ধনকারী ও সৌন্দর্যময় অলঙ্কার হতে পেরেছে; তাই দেখার বিষয়। সন্দেহ অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রুদ্রের শব্দ কুশলতায় ব্যঞ্জনার অনুরঞ্জন বিদ্যমান; উত্তরণ ও উদ্ভাবিত সম্ভাবনার দ্বার সঞ্চার তাতে দেখা যায়। তারপরও চলমান অমানিশা ব্যথা-বেদনায় সঙ্কট ঘনীভূত করে; জাগিয়ে তোলে মনে সংশয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

ক. উদ্ভিদের দেহ দ্যাখো কি-শ্যামল চেকনাই
আহা কি মাটির ঘ্রান, সোদা ঘ্রান-মাটিও কি ফুল?[১৫০]

খ. আলো দিয়ে খোলে না সে, খোলে না সে আঁধারেও,
আমার সাধের তালা, কোন চাবি দিয়ে তারে খুলি!
ঘৃনাতেও খোলেনা সে, ভালোবাসা তুমি পারো?[১৫১]

গ. আমার গ্রামের নদীটির মতো তোমার দুচোখে
কেন বালুচর জেগে ওঠে স্মাতি, কেন শূন্যতা?
সুস্থতা চাও-কোথায় স্বস্তি, কোথায় সমিল?
এইটুকু মদ গরল পানীয় পারে কি ভেজাতে
পৃথিবীর চেয়ে আরো বড়ো এক পোড়া মরুভূমি?[১৫২]

ঘ. মনে পড়ে বট? রাজপথ, পিচ? মনে পড়ে ইতিহাস?
যেন সাগরের উথলানো জল নেমেছে পিচের পথে
মানুষের ঢেউ আচড়ে পড়েছে ভাঙা জীবনের কূলে?[১৫৩]

ঙ. আমরা কি কোনোদিন আর কোনো কথা বলবো না
এরকম পরস্পর মুখোমুখি বোসে থেকে থেকে
ছুটে চলা সময়ের ট্রেনে কোনোদিন আবার হবোনা মুখরিত?[১৫৪]

চ. তবে কি তনুতে আমার কোনো ধ্বংশের ক্ষতচিহ্ন ছিলো?
তবে কি চোখে মুখে আমার ভিন্ন কোনো পূর্বাভাস ছিলো?[১৫৫]

ছ. বিষাদে বিভেদে বেড়ে যায় বেলা,
মাধবীর লতা শূন্য কি প'ড়ে রবে?[১৫৬]

জ. ব্যবধান জুড়ে রয়ে যাবে শুধু নীল শূন্যতা বাঁক?[১৫৭]

ঝ. রাত থেকে নিদ্রা গুলো
লাল- নক্ষত্র গুলো
স্বাধীনতা গুলো
কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। কেড়ে নিয়ে যাবে চিরকাল?[১৫৮]

ঞ. তোমার চোখে ও কি নদী নয় ভীষন জমাট জল, বরফিত দীর্ঘশ্বাস?[১৫৯]

সংশয় যেমন সন্দেহ অলঙ্কারের ভিত্তি; তেমনি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেও সংশয় থাকে। তবে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সংশয় থাকে শুধুমাত্র উপমানে। রুদ্র এ অলঙ্কার ব্যবহারেও যত্নশীল ছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ:

ক. মাঠের বাতাস তার ছুয়ে গেল চুল,
শিহরিত দেহখানি লজ্জায় কেঁপে
থরো থরো হলো যেন প্রথম কুমারী-[১৬০]

খ. ইতিহাস থেকে জেগে ওঠা এক শব
যেন এ প্রথম দেখলো নোতুন পৃথিবীকে,
যেন তার দেশে ছিলোনা আকাশ মাটি
ছিলোনা এমন রুপালি রোদের কারুকাজ-[১৬১]

গ. মৃত বাসি শুকনো বকুল ঝুলে আছে হলুদ দেয়ালে
যেন অহংকারের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিনীত বেদনা-
স্নেহময় হাতে যাকে স্পর্শ করলে ভেঙে পড়বে প্রবল বন্যায়।[১৬২]

ঘ. কী বিশাল সেই তাজা তরুনের মুষ্টিবদ্ধ হাত
যেন ছিড় নেবে গ্লোব থেকে তার নিজস্ব ভূমিটুকু![১৬৩]

ঙ. দারুন উজানি-মাঝি বাঘের পাঞ্জা
চওড়া সিনায় যেন ঠ্যাকাবে তুফান।[১৬৪]

চ. সমস্ত পরান জুড়ে যে অঘ্রান ফলভারে নত
তুমি তার ঘ্রান পেয়ে এলে যেন শ্যামল কিষান,
এলে মাটির মরমে রেখে মনোরম মৌন ক্ষত।[১৬৫]

ছ. হুইসেল বাজিয়ে যায় মাঝরাতে সুদূরের ট্রেন,
ভেতরে কোথায় যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য এক নদী জলহীন।[১৬৬]

জ. রক্তমাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পোকা-ধরা ক্ষত
ছুঁয়ে আছে জীবনের সবকটি ফুল-[১৬৭]

অনেক ক্ষেত্রে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর কবিতায় অপহ্নুতি অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। সমকালীন হতাশা, অবক্ষয়, সঙ্কট, আত্মগ্লানি, ক্লেদ প্রভৃতি কারণে কবির মনে যে অবসাদ এবং বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়েছে, তাতে কবি বাস্তব রূঢ়তায় কাল্পনিক জগতে বিলাসে মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতে গিয়েই উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানে শান্তি এবং আকাঙ্খার চাষাবাদ করেতে চেয়েছেন। ব্যক্তির বিশ্বাসহীনতা, যান্ত্রিক ভালোবাসা ও প্রকৃতির ধূসরতা কবির মনোবেদনাকে দিনে দিনে বিষিয়ে তুলেছে এবং কল্পলোকে সুখের আবাসন গড়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। অপহ্নুতি অলঙ্কারের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পরে :

ক. কিছুটাতো চাই-হোকভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই।[১৬৭]

খ. তোমার না-থাকা ভালোবেসে কিছু ভুলকে বেঁধেছি বক্ষে,
কিছু বলো নাই ভুল বৃক্ষকে অবাধে দিয়েছো বাড়তে।
তুমি কি জানতে
ওই তরুনয় স্বাস্থ্যোপযোগি, ও তো সেই বিষবৃক্ষ।[১৬৯]

গ. এই চোখ দেখে তুমি বুঝবেনা, কতোটা ভাঙনের চিহ্ন
জীবনের কতোটা পরাজয় ছুঁয়ে তার বেড়েছে বয়সের মেধা।[১৭০]

ঘ. যে-ফসল ক্ষেতে করেছি লাপলন কষ্টে, রক্তে, ঘামে
আমার অঙনে সে-ধান ওঠেনা
ওঠে শস্যেল ঋন।
বুকের রক্ত, কষ্টের দামে আমি কিনে নিই শোক
আমি কিনে নিই ক্ষুধার্ত দেশ রিবন্ন লোকালয়।[১৭১]

ঙ. পশ্চিমের মেঘ দেখে হাটবারে দোকানিরা গুটায় বেসাতি,
বরষা আসে না-শুধু মেঘ জমে ওঠে, বাজে মেঘের মাদল।[১৭২]

চ. নদীকে আদৌ নদীই হয় না মনে,
মনে হয় জালে আবদ্ধ খরগোশ।[১৭৩]

ছ. আত্মপ্রকাশের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলে তুমি,
তুমি- মানে কারাগার, বন্ধনের সোনালি শিকল,
মানে মধ্যরাতে টলোমলো পৃথিবীর ঘরে ফেরা নয়
সুগন্ধি মাতাল মাংশে ডুবে যাওয়া উষ্ণ বিছানা।[১৭৪]

অপহ্নুতি অলঙ্কারের বিপরীত হচ্ছে নিশ্চয় অলঙ্কার। রুদ্র এই অলঙ্কার প্রয়োগ করে ব্যথা-বেদনাগুলো ঢাকতে চেয়েছেন। তারপরও তিনি একজন আশাবাদী কবি, কল্পনার মাধ্যমে বাস্তবকে বিবর্জিত করা সাময়িক সময়ের ব্যাপার। সেজন্য কবি উপমানকে নিষেধ করে উপমেয়ে ফিরে আসেন; সাম্যবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ গড়নের প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হন। কয়েকটি নিশ্চয় অলঙ্কারের উদাহরণ :

ক. সৌন্দর্য আমাকে ডেকেছিলো
প্রাচুর্য আমাকে ডেকেছিলো
আমি যাইনি-
তুমি আমাকে ডাকোনি কখনো
আমি শুধু তোমারই কছে যাবো।[১৭৫]

খ. সাহস আমাকে প্ররোচনা দেয়
জীবন কিছুটা যাতনা শেখায়,
ক্ষুধা ও খরার এই অবেলায়
অতোটা ফুলের পয়োজন নেই।[১৭৬]

গ. কলার ভেলায় লাশ, সাথে ভেসে চলে এক স্বপ্নবান বধু
হাঙর কুমির আসে, আসে ঝড়, অন্ধকার দরিয়ার বান,
লাশের শরীর থেকে মাংশ খসে, বেহুলার অসীম পরান,
কিছুকে টলেনা স্বপ্ন আকাংখার শক্ত হাত মেলে রাখে বধূ'[১৭৭]

এভাবে অলঙ্কার প্রয়োগে কবিতার আঙিনায় রুদ্র যথার্থ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। শব্দ, ছন্দ এবং অলঙ্কারের প্রতি তিনি বরাবরই ছিলেন যত্নশীল। ভাষা ছন্দ অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্যে তাঁর কবিতা সহজ-সরল-সাবলীল শব্দ গৌরবে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। কবিতা রাজ্যে দুর্বোধ্যতার বেড়াজাল ভেঙে রুদ্র গণমানুষের বোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে বিষয়বস্তুতে যেমন তেমনি নির্মাণশৈলীতে নব্যতার সাধক।

তথ্য নির্দেশ

১. বিষ্ণুদে, "সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল"- 'সেকাল থেকে একাল', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪।

২. রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, "শব্দ-শ্রমিক", 'অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র', বিদ্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ১খ, পৃঃ ২। এখন থেকে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র স্থলে 'ঐ' এবং - 'অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র', এর স্থলে 'ঐ' সংকেত ব্যবহার করা হবে।

৩. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, ১খ, পৃঃ ২৬।

৪. ঐ, "কবিতার গল্প", ঐ, ১খ, পৃঃ ১৩৪-৩৫।

৫. ঐ, "আজীবন জন্মের ঘ্রানে", ঐ, ১খ, পৃঃ ১৯।

৬. ঐ, "কবিতার নির্বাসন চাই", ঐ, ২খ, পৃঃ ২০৩।

৭. ঐ, "শস্যের বিশ্বাসে", ঐ, ২খ, পৃঃ১২২।

৮. ঐ, "নষ্ট অন্ধকারে", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৯. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১০. ঐ, "অকর্ষিত হিয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

১১. ঐ, "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

১২. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

১৩. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

১৪. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

১৫. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ৯", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

১৬. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১০", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

১৭. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১।

১৮. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২৫", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৯. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২৭", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

২০. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ৩২", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।

২১. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, ১৭।

২২. ঐ, "বিমান বালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

২৩. ঐ, "স্মৃতি বন্টন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

২৪. ঐ, "এ কেমন ভ্রান্তি আমার", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

২৫. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

২৬. তদেব, পৃ. ২৮।

২৭. ঐ, "আমি সেই অভিমান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

২৮. ঐ, "বিশ্বাসে বিষের বকুল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

২৯. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

৩০. ঐ, "প্রিয় দংশন বিষ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৩১. তদেব, পৃ. ৩৩।

৩২. ঐ, "অপর বেলায়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৩৩. ঐ, "পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

৩৪. ঐ, "কার্পাশ মেঘের ছায়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

৩৫. ঐ, "প্রথম পথিক", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

৩৬. ঐ, "প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৩৭. ঐ, "অনিদ্রার শোকচিহ্ন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

৩৮. ঐ, "পৃথিবীর পৌঢ়স্তন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৩৯. ঐ, "বেলা যায় বোধিদ্রুমে", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

৪০. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।

৪১. ঐ, "দুটি চোখ মনে আছে", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

৪২. ঐ, "নিখিলের অনন্ত অঙ্গন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

৪৩. ঐ, "চিঠি পত্রের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

৪৪. তদেব, পৃ. ১৩৭।

৪৫. ঐ, "দাম্পত্য কলহের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

৪৬. ঐ, "গাছ গাছালির গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৪৭. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'করতলে মহাদেশ', শিল্পতরু প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৩, পৃ. ২১৭।

৪৮. তদেব, পৃ. ২২৮।

৪৯. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "পরাজিত নই পলাতক নই", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

৫০. ঐ, "বিশ্বাসের হাতিয়ার", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২।

৫১. ঐ, "মনে পড়ে সুদূরের মাস্তুল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬।

৫২. ঐ, "স্বজনের সুভ্র হাড়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৫৩. ঐ, "আধখানা বেলা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

৫৪. ঐ, "নিঃশব্দ থামাও", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

৫৫. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৮", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

৫৬. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৯", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

৫৭. ঐ, "হাউসের তালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

৫৮. ঐ, "তামাটে রাখাল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

৫৯. ঐ, "স্বপ্ন জাগানিয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯।

৬০. ঐ, "ও মন, আমি আর পারি না", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

৬১. ঐ, "পক্ষপাত", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৬২. ঐ, "সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

৬৩. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২।

৬৪. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১১", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।

৬৫. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

৬৬. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৪", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১।

৬৭. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ৩১", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

৬৮. ঐ, "পাখিদের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭।

৬৯. ঐ, "সকালের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৭০. ঐ, "চিঠিপত্রের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

৭১. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার- ৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

৭২. ঐ, "বেহুলার সাম্পান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১।

৭৩. ঐ, "শ্মশান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৭৪. ঐ, "দূরে আছো দূরে", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯।

৭৫. ঐ, "দৃশ্যকাব্য- ১", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

৭৬. ঐ, "সামঞ্জস্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

৭৭. ঐ, "ক্রাচ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭।

৭৮. ঐ, "স্বপ্নের ভাস্তুভিটে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৭৯. ঐ, "ময়না তদন্ত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯।

৮০. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'নতুন ছন্দ পরিক্রমা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ২০৮।

৮১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "মিছিলে নতুন মুখ", রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।

৮২. ঐ, "বিচারের কথা কেউ বলছে না কেন", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৮৩. ঐ, "পথ ছাড়ো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১।

৮৪. ঐ, "পাখিদের কথা ভেবে ডানা মেলে দিই", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬।

৮৫. ঐ, "স্বপ্নগ্রস্ত/ফিরেছি স্বদেশে শ্রান্ত সিন্দাবাদ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৮৬. ঐ, "কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।

৮৭. ঐ, "মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৮৮. তদেব, পৃ. ৭৫।

৮৯. ঐ, "চুটকি- ৩", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৯০. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

৯১. তদেব, পৃ. ৯০।

৯২. তদেব, পৃ. ৯৪।

৯৩. তদেব, পৃ. ৮৬।

৯৪. ঐ, "চুটকি- ২", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৯৫. ঐ, "চুটকি- ৫", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।

৯৬. ঐ, 'বিষ বিরিক্ষের বীজ', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩।

৯৭. তদেব, পৃ. ৯৭।

৯৮. ঐ, "খুটিনাটি খুনশুটি- ১৬", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০।

৯৯. ঐ, "মাঝের দেয়াল", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১।

১০০. ঐ, "রক্তের বীজ", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

১০১. ঐ, "নিসর্গ স্মৃতিতে ভাসে", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

১০২. ঐ, "হৃদয়ের মতো টেলিপ্রিন্টার", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

১০৩. ঐ, "বিমান বালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

১০৪. ঐ, "নষ্ট অন্ধকার", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

১০৫. ঐ, "ইচ্ছের দরজায়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

১০৬. ঐ, "শব্দ-শ্রমিক", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

১০৭. ঐ, "মাতালের মধ্য রাত্রি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

১০৮. ঐ, "বাঁকা ব্যবধান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

১০৯. ঐ, "প্রজ্বলন্ত লোকালয়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

১১০. ঐ, "যুগল দোলনা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।

১১১. ঐ, "পলায়ন", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।

১১২. ঐ, "গন্ধ পাই", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১১৩. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

১১৪. তদেব, পৃ. ১৭।

১১৫. ঐ, "আধখানা বেলা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

১১৬. ঐ, "মুখরিত মর্মমূল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

১১৭. ঐ, "পাকস্থলী", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

১১৮. ঐ, "রূপকথা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

১১৯. ঐ, "সামঞ্জস্য", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

১২০. ঐ, "চিলেকোঠা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১।

১২১. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

১২২. ঐ, "বাতাসের লাশের গন্ধ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

১২৩. তদেব, পৃ. ১৯।

১২৪. ঐ, "বাঁকা ব্যবধান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

১২৫. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১২৬. ঐ, "ধাবমান ট্রেনের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

১২৭. ঐ, "মরীচিকা বোধ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

১২৮. ঐ, "অনুতপ্ত অন্ধকার- ২", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

১২৯. ঐ, "ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

১৩০. ঐ, "আমি সেই অভিমান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

১৩১. ঐ, "মাতালের মধ্য রাত্রি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

১৩২. ঐ, "পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

১৩৩. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

১৩৪. ঐ, "কার্পাশ মেঘের ছায়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

১৩৫. ঐ, "সভ্যতার সরঞ্জাম", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

১৩৬. ঐ, "প্রথম পথিক", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

১৩৭. ঐ, "নক্ষত্রের ধুলো", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।

১৩৮. তদেব, পৃ. ৫৮।

১৩৯. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৬", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

১৪০. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৮", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

১৪১. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৭", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪।

১৪২. ঐ, "বাতাসে লাশের গন্ধ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

১৪৩. তদেব, পৃ. ১৯।

১৪৪. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

১৪৫. ঐ, "স্বজনের শুভ্র হাড়", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

১৪৬. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ২৪", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।

১৪৭. ঐ, "নক্ষত্রের ধুলো", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।

১৪৮. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৪৯. ঐ, "স্বপ্নগুলো", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১৫০. ঐ, "খামার", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

১৫১. ঐ, "হাউসের তালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১৫২. ঐ, "কাঁচের গ্লাশে উপচানো মদ", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

১৫৩. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

১৫৪. ঐ, "ধাবমান ট্রেনের গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

১৫৫. ঐ, "অশোভন তনু", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।

১৫৬. ঐ, "বাঁকা ব্যবধান", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

১৫৭. তদেব, পৃ. ৩৪।

১৫৮. ঐ, "মাংশভুক পাখি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১৫৯. ঐ, "বিমান বালা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

১৬০. ঐ, "শ্যামল পালক", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১।

১৬১. ঐ, "পথের পৃথিবী", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১৬২. ঐ, "নিবেদিত বকুল বেদনা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

১৬৩. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

১৬৪. ঐ, "হাড়েরও ঘরখানি- ৯", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

১৬৫. ঐ, "অকর্ষিত হিয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

১৬৬. ঐ, "দুটি চোখ মনে আছে", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১৬৭. ঐ, "মধ্যরাত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

১৬৮. ঐ, "অভিমানের খেয়া", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

১৬৯. ঐ, "বিষবৃক্ষ ভালোবাসা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

১৭০. ঐ, "অনিদ্রার শোকচিহ্ন", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

১৭১. ঐ, "গহিন গাঙের জল", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

১৭২. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৫", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

১৭৩. ঐ, "নদী ও নারীর গল্প", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

১৭৪. ঐ, "ময়না তদন্ত", ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯।

১৭৫. ঐ, "বিপরীত বাসনারা", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১৭৬. ঐ, "অবেলায় শংখধ্বনি", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

১৭৭. ঐ, "মানুষের মানচিত্র- ১৩", ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

সপ্তম অধ্যায়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবনালেখ্য

ক. জন্ম ও বংশ পরিচয়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। মা বরিশালে ভাইয়ের শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালে এই হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হন তিনি। মায়ের নাম শিরিয়া বেগম এবং বাবার নাম শেখ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁদের স্থায়ী নিবাস হচ্ছে বাগেরহাট জেলার মংলা থানার অন্তর্গত সাহেবের মেঠ গ্রাম। এই এলাকার মধ্যে রুদ্রর পরিবার ছিল ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবার। নানা শেখ মুহম্মদ ইসমাঈল ছিলেন মংলার অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। পিতা শেখ ওয়ালীউল্লাহ পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। আমৃত্যু তিনি মংলা ডক লেবার হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শ্বশুরের নামানুসারে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসমাঈল মেমোরিয়াল হাইস্কুল'। ১৯৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত ছিলেন।[১] পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সকলের বড়।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর পিতৃদত্ত নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এ নামেই তিনি ছোটবেলায় পরিচিত ছিলেন। কিন্তু লেখালেখি করতে এসে এ নামটি তাঁর পছন্দ হয়নি এবং তা পাল্টিয়ে শুরুতে 'রুদ্র' শব্দটি যোগ করেই ছাড়েন নি, 'মোহাম্মদ'-কে 'মুহম্মদ' এবং 'শহীদুল্লাহ'-কে 'শহিদুল্লাহ' করেছেন। শুধু লেখক হিসেবেই এ নামটি গ্রহণ করেননি, পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার সমস্ত সনদ পত্রেও রুদ্র মুহম্মদ শহিদূল্লাহ করে নিয়েছেন।

খ. শিক্ষা-জীবন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর নানা বাড়ি ও নিজ বাড়ির মধ্যে বেশি দূরত্ব ছিল না। বেশি সময় তিনি নানা বাড়িতেই কাটাতেন এবং এখানেই তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি। ১৯৬৪ সালে তিনি নানার নামে প্রতিষ্ঠিত 'ইসমাঈল মেমোরিয়াল স্কুল'-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। রুদ্রর বয়স তখন আট বছর। তখন থেকেই লেখা-পড়ার পাশাপাশি 'বেগম', 'শিশুভারতী' পত্রিকা এবং রবীন্দ্র-নজরুলের বই পড়ার সুযোগ পান। তারপর ১৯৬৬ সালে মংলা থানা সদরে সেন্ট পলস স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে পাঁচ বছর

পড়ার পর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ; তাঁর আর নবম শ্রেণী পড়া হয়নি। ১৯৭২ সালে রুদ্র নবম শ্রেণী টপকিয়ে ঢাকার ওয়েস্ট এণ্ড হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ৫০ লালবাগে মামার বাসায় থেকেই এ স্কুল থেকে রুদ্র ১৯৭৩ সালে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ এসএসসি পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজ এবং ১৯৭৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। এ সময় রুদ্র সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি রুদ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে বিএ (অনার্স) ভর্তি হন। এই সময় কালেই রুদ্রের একদল তরুণ সাহিত্য কর্মীর সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৮ সালে রুদ্র ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়নে সাহিত্য-সম্পাদক পদে। নির্বাচিত হতে না পারলেও এতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিচয় ঘটে, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহাল ছিলো।

১৯৭৯ সালে রুদ্র অনার্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি, ক্লাসে উপস্থিতির হার কম হওয়াতে। ১৯৮০ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিএ (অনার্স) ডিগ্রী লাভ করেন। নানা প্রতিকূলতায় প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখায় বাধা আসায় রুদ্র অবশেষে ১৯৮৩ সালে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময়ে রুদ্রের দু'টি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ পায় 'উপদ্রুত উপকূল' (১৯৭৯) এবং 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম' (১৯৮১)। এ দু'টি কাব্যের জন্য প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী 'স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে।

গ. বিবাহ ও সংসার-জীবন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ- ১৯ জানুয়ারি ১৯৮১ সালে বিয়ে করেছেন অভিভাবকের অমতে। স্ত্রীর নাম লীমা নাসরিন। পরবর্তীকালে তসলিমা নাসরিন নামে লেখালেখি করেন। উভয়ের পরিচয় লেখালেখির সূত্র থেকেই। রুদ্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তসলিমার পরিবার থেকেও এ বিয়েতে আপত্তি ছিল। তসলিমা ডাক্তারি পাস করার পর রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরে রুদ্র ও তসলিমার দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিলো। রুদ্রের উৎসাহ ও সহযোগিতায় তসলিমারও সাহিত্যাঙ্গনে বেশ জনপ্রিয়তা আসে। কিন্তু উভয়ের সংসার জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৮৬ সালে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ রুদ্রকে মানসিক কষ্ট দিয়েছে। তালাক হবার পর তসলিমা রুদ্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন এবং এক সময় গোটা পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে তাঁর কলম সক্রিয় থেকেছে। বিচ্ছেদ পাবার পর শেষ দিকে দু'জনের আবার বেশ বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে দেখা গেছে। বর্তমানে রুদ্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তসলিমা নাসরিন দেশ থেকে নির্বাসিত আছেন।

ঘ. কর্মজীবন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেননি এবং চাকরির জন্য কোনো দরখাস্তই করেননি। ১৯৮৩ সালে এম.এ পাস করার পর তিনি ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ঠিকাদারি তাঁর ভালো লাগেনা, কবিতার টানে চলে আসেন ঢাকা। রোজগারের টানে আবার চলে যান মংলা। নতুন উদ্যোগে গড়ে তোলেন চিংড়ির খামার। নিজেদের জমি এবং অন্যান্যদের জমি লিজ নিয়ে 'সোনালি মৎস খামার' গড়ে তোলেন। লাভজনক ব্যবসা হলেও রুদ্রের মন টেকে না, তিন বছর যেতে না যেতেই ফিরে আসেন ঢাকায়। শেষ দিন পর্যন্ত কবিতাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর একমাত্র কর্ম।

অবশ্য কবিতা চর্চার পাশাপাশি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সাময়িক পত্র সম্পাদনায় ছিলেন সমান মনোযোগী। যদিও এগুলোর কোনোটিই স্থায়িত্ব লাভ করেনি। 'দুর্বিনীত', 'অনামিকার অন্য চোখ ও চুয়াত্তরের প্রসব যন্ত্রণা', 'অশ্লীল জ্যোৎস্নায়', 'স্বরূপ অন্বেষা', 'Poima' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রের তিনি সম্পাদক এবং 'সাহস' নামের একটি সাহিত্য পত্রের প্রকাশক হিসেবে রুদ্র দায়িত্ব পালন করেন।[২] পরবর্তী সময়ে 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটে'র হয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বিভিন্ন সভা সমিতি নিয়ে রুদ্র ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক তিনি এবং বাংলাদেশ সঙ্গীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রকাশনা সচিব ছিলেন।

ঙ. সাহিত্য জীবন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই। ১৯৬৬ সালে তাঁর কবিতা রচনার হাতে খড়ি। কবিতার পাশাপাশি সেই কিশোর বয়সেই রুদ্র খেলা ও নাটকের প্রতি প্রচণ্ড ঝুঁকেছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি নানির ট্রাংক থেকে টাকা চুরি করে 'বনফুল লাইব্রেরি' গঠন করেন; তখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৭০ সালে রুদ্র 'বনফুল লাইব্রেরি'র সদস্যদের নিয়ে 'কালো টাইয়ের ফাঁস' নাটক মঞ্চায়ন করেন। ইতোমধ্যে রুদ্র কবিতায় কবিতায় খাতা পূর্ণ করেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বাড়ির অন্যান্য আসবাবের সাথে সেই খাতাটিও ভস্মিভূত হয়।

১৯৭৩ সালে রুদ্র যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ পায়। কবিতাটি ছাপা হয় 'আমি ঈশ্বর আমি শয়তান' শিরোনামে, কিন্তু কবির নাম ছাপা হয়নি। রুদ্র কবিতাটি কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; অসীম সাহা সম্পাদিত 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডে

'খুটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা'য়–"আমি একজন ঈশ্বর" শিরোনামে সঙ্কলিত হয়। কবিতাটির মধ্যে রুদ্রের জীবনাদর্শের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়–

আমি একজন ঈশ্বর
আমায় যদি তুমি বলো ঈশ্বর;
আমি বলব হ্যাঁ আমি তাই।
আমায় যদি বলো পাপী শয়তান,
আমি বলব হ্যাঁ আমি তাই-ই।
কারন আমার মাঝে যাদের অস্তিত্ব
তার একজন ঈশ্বর; অপরজন শয়তান,
তাই– যখন শয়তানের ছবিটি ভাসে
আমার মানব অবয়বে– তখন আমি পাপী।
আর যখন সত্যের পূর্নতায় আমি
মানবের কল্যানে আমার ধর্ম–
ঠিক তখনই আমি ঈশ্বর, কারন
সত্য, পুন্য আর মানবতাই ঈশ্বর।
যাকে তোমরা বলো ঈশ্বর–
আমি তাকে বলি সত্য, ন্যায়;
অতএব আমার পক্ষে একজন
ঈশ্বর হওয়া বিচিত্র নয়।

১৯৭৫ সালে রুদ্রের মাথায় খেয়াল জাগে 'উপলিকা' রচনার। 'না-গল্প, না-কবিতা' আঙ্গিকের মারফত রুদ্র নতুন সাহিত্য সংযোজনের প্রয়াস চালান। 'অশ্লীল জ্যোৎস্নায়' সাহিত্য সংকলনে রুদ্র "উপলিকা সম্পর্কিত উপস্থাপনা"- প্রচার করেন, তাঁর ভাষায় "উপলিকা' হচ্ছে– না কবিতা। না গল্প। সুরটা হবে কাবিতিক। এবং উপস্থাপনাটা হবে গাল্পিক। মূলত কবিতার স্বচ্ছন্দ গতি নিয়ে এর শুরু এবং গল্পের বিন্যাসে বিন্যস্ত। জটিলতা সব সময় পরিত্যাজ্য। যতোটা সম্ভব তার ধারাবাহিকতা আবশ্যক। সমাপ্তিটা ছোটগল্পের মতোন। সহজ শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। নিঃসন্দেহে সাহিত্যে এটা একটা নোতুন সংযোজন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থের রচনাগুলোয় অবশ্য উপলিকার গুণগত দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে ঐ রচনাগুলোর প্রথম অবস্থায় খুব একটা উদ্বিগ্নতা ছিল না, ্যামোন থাকে না রচনাটা শেষ হলে।

উপলিকার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে রচনার প্রথম থেকে পাঠককে যে পরিবেশ বা যে ধারণার মাঝে নিয়ে যাওয়া হবে ঠিক শেষ মুহূর্তে সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ নোতুন একটা পরিবেশ বা অবস্থানে পাঠককে ছুঁড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ঠিক সেই নোতুন পরিস্থিতির কথা না বলা পর্যন্ত পাঠককে সে সম্পর্কে সামান্যতম আভাষও পাবে না। তাই সে বিষয়বস্তু ভাবগত হোক আর বস্তুগত হোক। ... ... উপলিকার আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা, উল্লেখ করছি। তা হলো এর আকার খুব বেশি দীর্ঘ করা যাবে না। মোটকথা উপলিকা হচ্ছে না-গল্প না-কবিতা।"[৩] তারপর নমুনা হিসেবে এ কবিতা পত্রে রুদ্র দুটি উপলিকা প্রকাশ করেন, "একটি মারাত্মক স্বপ্নভুক দিন' ও "একদিন ওনামে কাউকেই চিনতাম না"। এ 'উপলিকা' আন্দোলন তখন বেশ আলোচিত হয়েছিল। রুদ্রের সাহিত্য-নিরীক্ষা ধর্মী মানসিকতা এ প্রয়াস প্রতিষ্ঠা পায় নি। এখানে তাঁর "একটি মারাত্মক স্বপ্নভুক দিন" 'উপলিকা'র উল্লেখ করা যায়:

খুব ভোরেই উঠেছি আজ। জানালায়
সকাল উঁকি দিচ্ছে। আকাশে মেঘ নেই–
ঘরময় গত রাতের ক্রমাগত পোড়া
সিগারেটের টুকরো। টেবিলে অসংযত বই।
সেভ কোরে ঘরখানা ঝেড়ে নিয়ে
ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবিটা পোরেছি।
যথেষ্ট কাজ আছে আজ। মনে মনে
এক রকোম সাজাই। প্রথমে স্বাতি
গত সাতদিন দ্যাখা হয়নি, হয়তো
ভাবছে খুব অথবা নিশ্চয়ই অভিমান,
বা ওরকোম কিছু একটা কোরেই আছে।
অতঃপর পত্রিকা অফিসগুলোতেও
যাওয়া দরকার। বিজ্ঞাপনের কয়েকটা বিল
এ্যাখোনো হয়নি, তা ছাড়া নোতুন
একটি কবিতার বই প্রকাশিত হোয়েছে
কিনতে হবে। এছাড়াও হাসানের সাথে
একবার দেখা না কোরলেই নয়।
কয়েকখানা পোষ্টকার্ডও কিনতে হবে বহুদিন চিঠি লিখিনা
এ রকোম ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরোলেই
কে য্যানো বোল্লো: 'আজ হরতাল'

১৯৭৬ সালে রুদ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর পর "রাখাল" সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থেকেছেন। আর বিভিন্ন কবিতা পত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে সংকলন বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্য

রুদ্র বেঁচে থাকাকালীন তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা প্রকাশনীর বিবরণসহ কবি কর্তৃক ভূমিকার উল্লেখ করবো। এতে রুদ্রের সমকালীন চিন্তা ও বানানের ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. উপদ্রুত উপকূল ॥ প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৮৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। প্রকাশক: আহমদ ছফা, বুক সোসাইটি, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা। গ্রন্থ স্বত্ব: বিথীকা শারমিন। প্রচ্ছদ: কাজী হাসান হাবীব। আলোচচিত্র: শামসুল ইসলাম আলমাজী। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৬৪। মূল্য: পাঁচ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

> থামাও, থামাও এই মর্মঘাতী করুন বিনাশ
> এই ঘোর অপচয় রোধ করো হত্যার প্লাবন
>
> সিরাজ সিকদার
> শেখ মুজিবুর রহমান
> আবু তাহের

কবি-রচিত ভূমিকা

গ্রন্থে কিছু শব্দের বানানে পরিবর্তন চোখে পড়বে। ধ্বনিকে মূল ভিত্তি ধ'রে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। আর ইংরেজি ফুলস্টপের মতো নোতুন যে যতি চিহ্নের ব্যবহার– সেটি অর্ধ-কমা। এ-সবের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

আমার অসন্তুষ্ট পিতা, সদা-শংকিত জননী, যার বুকে লালিত হয়েছি সেই-মা, বিক্ষুব্ধ আত্মীয়বৃন্দ, অপরিচিত অনুরাগী, শুভাকাংখি, স্বজন, বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকাগন (একজন ছাড়া), বন্ধু, শত্রু, পাঠক এবং উপদ্রুত উপকূলের আটকোটি মানুষ– সবার জন্যে আমার শুভেচ্ছা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
২১, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

২. ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম ॥ প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৮৭, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। প্রকাশক: দ্রাবিড় প্রকাশনী, ১১/১ উত্তর বাসাবো, ঢাকা। গ্রন্থস্বত্ব: লীমা নাসরিন। প্রচ্ছদ: কালিদাস কর্মকার ও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। আলোকচিত্র: মোহাম্মদ আলী মিনার। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৪৬। মূল্য: পাঁচ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

বিশ্বাসের তাঁতে আজ আবার বুনতে চাই
জীবনের দগ্ধ মসলিন।

কবি-রচিত ভূমিকা

স্বর্নগ্রাম কোনো গ্রাম নয়। স্বর্নগ্রাম হচ্ছে আমাদের ইতিহাস, জাতিস্বত্তা আর প্রেরনাময় ঐতিহ্যের প্রতীক। স্বর্নগ্রাম বাঙালির আত্মার নাম, রক্তের নাম। বৃক্ষের বিকাশের জন্যে যেমন মাটিতে শিকড় বিস্তার করা প্রয়োজন, একটি জাতির বিকাশের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন তার মাটিতে তার ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, তার প্রেরনাময় ঐতিহ্যে শিকড় বিস্তার করা। আর সেই কারনেই এই আত্মানুসন্ধান, এই স্বরূপ অন্বেষন।

বানানের ব্যাপারে আমার আগের চিন্তা ভাবনা এই বইতেও অক্ষুন্ন রয়েছে। তবে দুটি ণ-এর পরিবর্তে এই গ্রন্থে শুধু দন্ত্য ন ব্যবহার করেছি।

সবাইকে শুভেচ্ছা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
১১/১ উত্তর বাসাবো ঢাকা

৩. মানুষের মানচিত্র ॥ প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৪। প্রকাশক: সৈয়দ রাজা হুসাইন, সব্যসাচী, ১ গোবিন্দ দত্ত লেন, লক্ষীবাজার, ঢাকা। গ্রন্থস্বত্ব: মুহম্মদ সাইফুল্লাহ। প্রচ্ছদ: এস এম. সুলতানের তৈলচিত্র ফার্স্ট প্লান্টেশন অবলম্বনে মোশ্‌তাক দাউদী। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪+৩২। মূল্য: পনের টাকা। উৎসর্গ পত্র:

কেউ কি বেহুলা নেই হাড়ের খোয়াব নিয়ে বৈরী জলে ভাসে?

কবি-রচিত 'স্বীকারোক্তি'টি বিরাট আকৃতির। আমরা প্রয়োজনের তাগিদে শেষাংশটুকু উল্লেখ করছি:

'মানুষের মানচিত্র' আমাদের নির্যাতিত জীবনের কিছু প্রমান। আমাদের সমাজে সবচে কম সুবিধা যাঁরা ভোগ করে। একবেলা পেট ভরে খেতে পারাটাই যাঁদের বিলাসিতা। হিমালয়ের মতো বিশাল অন্ধকারের ভার

যাঁদের অহরহ দ'লে পিষে মারছেঃ 'মানুষের মানচিত্রে' সেই অন্ধকার জীবনের সামান্য কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষুধার অন্ধকার, অস্ত্রহীনতার অন্ধকার, বাস্তহীনতার অন্ধকার, চিকিৎসাহীনতার অন্ধকার, শিক্ষাহীনতার অন্ধকার আর শোষনের অন্ধকারে যে বিশাল জনগোষ্ঠী ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলা কবিতায় তাঁদের বড়ো একটা দ্যাখা যায়নি।

'মানুষের মানচিত্র' জীবনের অন্ধকারের বীভৎস উপস্থিতি আমার অনেক স্নিগ্ধ রুচির পাঠককে বিব্রত করেছে। কবিতায় 'এই সব নোংরামির আমদানী'কে তিরস্কার করেছে কেউ কেউ। বলা বাহুলল্য তাঁরা বিত্তবান শ্রেনীর অধিবাসী। যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছে তাঁদের অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্তের এবং তাঁরা অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে। মানুষের মানচিত্রে প্রধানত ভাঙাচোরা জীবনের মানুষদের উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। এখন তাদের কণ্ঠে দিতে হবে জীবনের দাবি আর সংগ্রামের ভাষা। সমাজের চূড়ান্ত শোষনের অবস্থাটা জানা যায় সেই সমাজের একটি নারীর জীবনে উন্মোচন করলে। শোষিত পুরুষও তার ঘরের নারীর উপর শোষন চালায়। এই বই-এ এ-রকম অনেক নারীচরিত্রের সাথে পাঠকের দ্যাখা হবে।

আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশের কবিতায় এক নোতুন বলদীপ্ত তাজা কোমল ভাষার নির্মান হতে চলেছে। প্রচলিত অভিজাত ভাষার ক্রিয়াপদ অক্ষুন্ন রেখে লোকজ শব্দের মিশালের মধ্যেই রয়েছে এক নোতুন ভাষার প্রানের শক্তি। প্রাথমিক প্রয়োগ হিসেবে। ফিরে চাই স্বর্নগ্রামের কয়েকটি কবিতায় এ-জাতীয় কাজ করেছিলাম বছর চার-পাঁচ আগে। এই গ্রন্থে আরো ব্যাপকভাবে এই কাজটি করার চেষ্টা করেছি। সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয়নি কিন্তু যেখানে হয়েছে, বোঝা যায়, কতোখানি দীপ্রগতি আর অন্তরঙ্গ গভীরতা ধারন করতে পারে এই ভাষা। 'মানুষের মানচিত্রে' দক্ষিনবাংলার লোকজ শব্দই বেশি ব্যবহার করেছি।

সম্প্রতি কেউ কেউ অবিকল আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখায় চেষ্টা করেছেন। কাজটি ক্ষতিকর। ভবিষ্যতে এতে এক ব্যাপক সাহিত্যিক অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারে। বিশ চরন আর বাইশ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্তে এই বই-এর কবিতাগুলো লেখা হয়েছে, কয়েকটি কবিতা ইচ্চাকৃতভাবে অমিল রেখেছি। লক্ষ্য করলে প্রায় প্রতিটি কবিতায় অন্ধকার শব্দটি চোখে পড়বে– এটাও ইচ্ছাকৃত। বানানের ব্যাপারে আগের সব সিদ্ধান্তই বহাল রয়েছে। সবার জন্যে রক্তিম শুভেচ্ছা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
৮ ভাদ্রুন ১৩৮৯

৪. ছোবল ॥ প্রকাশঃ ফাল্গুন ১৩৯২, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। প্রকাশকঃ দ্রাবির প্রকাশনী, ঢাকা। গ্রন্থস্বত্বঃ সোফিয়া শারমিন। পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮+৩৮। মূল্যঃ বিশ টাকা। উৎসর্গ পত্রঃ

শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবেনা দেশে,
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই, স্বপ্নবান অস্ত্র চাই হাতে।

কবি-রচিত ভূমিকা

আমাদের স্বপ্ন এক অস্ত্রহীন পৃথিবীর। অথচ এ-মুহূর্তে অস্ত্র-বাহকদের হটাতে অস্ত্রের প্রয়োজন– প্রয়োজন সশস্ত্র উত্থানের। দেশে বিরাজমান সামরিক শাসন, অন্তসারশূন্য রাজনীতি, নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতী-আপোষকামিতা, লুটতরাজে মত্ত প্রশাসন, বল্গাহীন বিত্তবানের বিলাসের ঘোড়া। নৈরাজ্যই সবচে সত্য এখন। সত্য এখন অন্ধকার। আর অন্ধকারে আগুনই হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন। আগুন সংক্রামিত হোক। আগুন ছড়িয়ে পড়ুক।

পৃথিবী হোক একটি দেশের নাম। পৃথিবী হোক একটি গ্রামের নাম, একটি পরিবারের নাম। কারন মানুষ কোনো দেশের সন্তান নয়, মানুষ পৃথিবীর সন্তান।

এ-পৃথিবী অস্ত্র নির্মাতার নয়, অস্ত্র বাহকের নয়, অত্যাচারীর নয়– এ-পৃথিবী আমাদের। এই স্বপ্ন সংক্রামিত হোক। এই স্বপ্ন আগুনের মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক।

বানানের ব্যাপারে আমার আগের সব চিন্তা-ভাবনাই বহাল রয়েছে। কাব্য বিশ্বাসও অপরিবর্তিত। পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের জন্যে আমার রক্তিম শুভেচ্ছা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
১৬.১২.৮৫

৫. **গল্প** ॥ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রকাশক: নিখিল প্রকাশন, লালবাগ, ঢাকা। মুদ্রন: ঊষা আর্ট প্রেস, লালবাগ, ঢাকা। প্রচ্ছদ: হাশেম খান। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮+৪৮। মূল্য: বিশ টাকা।

৬. **দিয়েছিলে সকল আকাশ** ॥ প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৯৫, আগষ্ট ১৯৮৮। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০। গ্রন্থস্বত্ব: আবীর আব্দুল্লাহ। প্রচ্ছদ: হাশেম খান। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮+৪০। মূল্য: ২৪ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

নাড়ায়, ভেতরে কেউ নিবিড় কড়া নাড়ায়

৭. মৌলিক মুখোশ ॥ প্রকাশ: ১লা ফাল্গুন ১৩৯৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। প্রকাশক: সাঈদ হাসান তুহিন, সংযোগ প্রকাশনী, ঢাকা। মুদ্রন: জাকির আর্ট প্রেস, ঢাকা। গ্রন্থস্বত্ব: সুবীর ওবায়েদ। প্রচ্ছদ: রুহুল আমিন কাজলের তৈলচিত্র অবলম্বনে ইউসুফ হাসান। আলোকচিত্র: গোলাম হিলালী। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৪০। মূল্য: পঁচিশ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

আমাদের স্বপ্নগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কাক ও শকুন

এই সাতটি কাব্য রুদ্রের জীবিতাবস্থায় প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যেসব রচনা প্রকাশ পায় তার পরিচিতি দেয়া হলো:

৮. এক গ্লাস অন্ধকার ॥ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান। গ্রন্থস্বত্ব: ইরা শারমিন। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৪২। মূল্য: চল্লিশ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

একগ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে বোসে আছি।
শূন্যতার দিকে চোখ, শূন্যতা চোখের ভেতরও-
একগ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে একা বোসে আছি।

৯. বিষ বিরিক্ষের বীজ ॥ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৩৬। মূল্য: ত্রিশ টাকা।

১০. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র ॥ প্রথম খন্ড। সম্পাদনা: অসীম সাহা। প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬+২০৪। মূল্য: একশ ত্রিশ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

অভিলাষী মন চন্দ্রে না পাক
জোৎস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই।

পরিবেশক কর্তৃক কবি-গ্রন্থ পরিচিতি পত্র:

মাটি, মদ, মাংস, নারী, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সুন্দরের প্রতি তীব্রভাবে নিবিষ্ট এক শিল্পমগ্ন তারুণ্যের প্রতিনিধি সে। বাংলাদেশের কবিতার আপাদ মাথা জুড়ে তার সরব উপস্থিতি, প্রেম ও সুন্দরের প্রতি তার আকণ্ঠ অনুরাগ, দ্রোহ ও সংগ্রামের প্রতি তার অভগ্ন বিশ্বাস এবং সর্বোপরি শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত নিবেদন তার কবিতাকে করে তুলেছে সত্তরের অন্যান্য কবি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের অদীর্ঘ জীবনে রুদ্রের ক্লান্তিহীন

শিল্পযাত্রায় সে ছিলো অন্যতম সফল নাবিক। অকাল প্রয়াত এই তরুণ কবির গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনার পংক্তি ও সস্তবকসমূহের এক দ্যুতিময় প্রতিভাস 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র'।

এই খন্ডে অসীম সাহার সম্পাদনা বক্তব্যসহ রুদ্রের– 'উপদ্রুত উপকূল', 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম', 'মানুষের মানচিত্র', 'ছোবল', 'গল্প', 'দিয়েছিলে সকল আকাশ'– এই ছয়টি কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতা স্থান পেয়েছে।

১১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র ॥ ২য় খণ্ড। সম্পাদনা: অসীম সাহা। প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ: খালিদ আহসান। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৭। মূল্য: একশ সত্তর টাকা। উৎসর্গ পত্র:

এটা প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়,
শুধু এক শব্দহীন সবল অস্বীকার

এই খন্ডে 'মৌলিক মুখোশ', 'একগ্লাস অন্ধকার', 'বিষ বিরিক্ষের বীজ'– এই তিনটি কাব্যসহ রুদ্রের অগ্রন্থিত কবিতা এবং পাঁচটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্প পাঁচটির নাম: সোনালি শিশির, ইতর, নিঃসঙ্গতা, উপন্যাসের খসড়া ও যেখানে নরকে গোলাপ।

১২. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ সম্পাদক: অসীম সাহা। প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ: ওয়াকিলুর রহমান। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮+৭২। মূল্য: পঞ্চাশ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

চলে গেলে মনে হয় তুমি এসেছিলে,
চলে গেলে মনে হয় তুমি সমস্ত ভুবনে আছো।

সম্পাদক-রচিত ভূমিকা:

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অভিধা নিয়ে যতো বিতর্কই থাক, পাঠকের প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাইয়ে সম্পাদকের অভিরুচিই প্রধান হলেও পাঠকের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ-সংকলনে এমন কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাকে সূক্ষ্মবিবেচনায় হয়তো শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে কষ্ট হবে। যদি খুব চুলচেরা বিশ্লেষণে আমি যেতাম, তাহলে সংকলিত এমন কিছু কবিতা আমাকে বাদ দিতে হতো, যা রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার অনুরাগী-পাঠকদের আহত করতো। সে-জন্যেই রুদ্রর শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাইয়ে আমি দু'টি দিক মনে রেখেছি।

প্রথমত তার শিল্পসম্মত কবিতা, দ্বিতীয়ত জনপ্রিয় অথচ মানোত্তীর্ণ কবিতা। শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিতাকে আমি এই সংকলনভুক্ত করার চেষ্টা করিনি।

রুদ্র'র কবিতা নিয়ে নতুন করে বলার তেমন কিছু নেই। সংকলনভুক্ত কবিতাগুলো পাঠ করে পাঠক রুদ্রকে আবিষ্কার করবেন, স্মরণ করবেন, এ-প্রত্যাশা থেকেই 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রকাশ। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই এই সংকলন প্রকাশের সার্থকতা।

অসীম সাহা

১৩. **রুদ্রের নির্বাচিত অণুকাব্য ॥** সম্পাদনা: হিমেল বরকত ও আহসানুল কবির। প্রকাশক: সমুদ্র সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা। প্রকাশ: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০+১২। মূল্য: দশ টাকা। উৎসর্গ পত্র:

থাকুক তোমার একটু স্মৃতি থাকুক
একলা থাকার খুব দুপুরে
একটি ঘুঘু ডাকুক।

এতে রুদ্রের পরিচিতি ছাড়াও তাঁর ৩২টি ছোট আকারের কবিতা স্থান পেয়েছে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর গান:

গীতিকার হিসেবে রুদ্র'র খ্যাতি ছিলো, অসংখ্য গান তিনি রচনা করেছেন এবং কিছু গানের সুরও দিয়েছেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁকে গান নিয়ে মেতে থাকতে দেখা গেছে। আবার কিছু গান কবিতা হিসেবেই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। "ভালো আছি ভালো থেকো"– এই গানের জনপ্রিয়তা দুই বাংলায় তুঙ্গে। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত ওডিও ক্যাসেটটি গান পিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

ক্যাসেটের শিরোনাম: রুদ্রের গান/ ভালো আছি ভালো থেকো
কথা ও সুর: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
সংগীত পরিচালনা: রেশাদ
প্রযোজনা ও স্বত্ব: রুদ্র পরিবার
পরিবেশনা: মধুমতি ইলেক্ট্রনিক্স, ৩১/১ পটুয়াটুলী, ঢাকা- ১১০০।
ক্যাসেটভুক্ত গান:

এপিঠ

গান	শিল্পী
১. ও নিঠুর দরিয়ার পানি	সুবীর নন্দী
২. দিন গেলো দিন গেলরে	খালিদ
৩. অন্তর বাজাও	এম.এ. খালেক
৪. ছিঁড়িতে না পারি	শুক্লাদে
৫. আমার ভিতর বাহিরে	রফিকুল আলম
৬. দরোজাটাকে খোল	শাহীন খান

ওপিঠ

গান	শিল্পী
১. ঘেরে ঘেরে ঘেরাও	গোলাম মহাম্মদ
২. আমরা পাড়ি দেব	খালিদ হাসান মিলু
৩. বৃষ্টি বরন	শাওন
৪. হারানো সুর ফিরে এলো	মাহমুদুজ্জামান বাবু
৫. ভালো আছি ভালো থেকো	সাবিনা ইয়াসমিন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচিত গানের তালিকা:

রচিত গান	রচনাকাল
১. প্রকৃতির সাথে মানুষের	২৪.০১.৮৮
২. ও নিঠুর দরিয়ার পানি	২৪.০১.৮৮
সুর: গোলাম মহাম্মদ	
৩. কি লাভ তাহলে আর/ ইটের সভ্যতা গোড়ে	২৩.০১.৮৮
৪. মানুষ কেন যে বৃক্ষের মতো নয়	২২.০১.৮৮
৫. আমার ঘরে খাবার নেই রে	
৬. কেবল মেঘের আওয়াজ শুনি গুম্ গুম্	১৫.১২.৮৪
৭. যদি চোখে আর চোখ রাখা না-ই হয়	০৭.১১.৮৭
৮. শত বছরের পরাধীন কোটি প্রানে	২৬.১০.৮৭
সুর: শেখ সাদী খান	

৯. নাচতে নেমে বলছি না তো ঘোমটা দেবো ১০.০৩.৮৭

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

১০. জোস্নায় ভেজা বালুচরে/দাঁড়িয়েছিলাম ২১.০৩.৮৭

১১. রাতের আকাশের চেয়ে ০৩.০৩.৮৭

১২ প্রিয় হৃদয় আমার, চিঠি লিখো ০৫.০৯.৮৪

১৩. মুক্তি পাক, মুক্তি পাক/ গণতন্ত্র মুক্তি পাক ০২.০২.৮৮

সুরঃ ফকির আলমগীর

১৪. পাহাড় এসে সামনে দাঁড়ায় ১৯.০১.৭৮

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

১৫. ওই আকাশ গান শোনাবে ১৯.০১.৭৮

১৬. কোন দিকে ভাসবে এ স্বপ্নের নাও? ১৯.০১.৭৮

১৭. এদেশে দুর্দিন,/জমেছে বহু ঋণ

১৮. গাছের পাতা হলুদ হইতাছে

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

১৯. রোদ ঝলমল এই যে দুপুর ১৬.০৫.৮৭

২০. পথ পানে চেয়ে বসে আছি ১১.০৫.৮৭

২১. মুখে বোল্লেও কিছু বুঝিনা, বুঝিনা ০১.০৫.৮৭

২২. আকাশের গ্রামে, মেঘের পাড়ায় ১৭.১০.৮৬

২৩. কষ্টের মেঘ জমে থাকে বুকে ১৭.১০.৮৬

২৪. দিন গেল দিন গ্যালোরে

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

২৫. আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

২৬. আমরা পাড়ি দেবো/ রুদ্র সমুদ্র ১০.০৩.৮৭

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

২৭. ছিঁড়িতে না পারি দড়াদড়ি

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

২৮. দরোজাটাকে খোলো ১০.০৩.৮৭

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

২৯. হৃদয়ে এক ফুল ফুটেছে ১০.০৩.৮৭

৩০. এ আমার শুধু তোমাকেই ভুলে থাকা ১১.০৫.৮৭

৩১. এই ঘুম ঘুম চাঁদনি রাত/তুমি আমি একা দু'জনে ১১.০৫.৮৭

৩২. এই চাঁদ জানে আকাশের/ গোপন ব্যথা ০৩.০৩.৮৭

সুরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

৩৩. আমায় শুধু একটি কথাই দাও ১৬.০৫.৮৭

৩৪. আমি চিরদিন শুধু তোমারি ১৩.০৫.৮৭

৩৫. তোমার আমার কিছু গান আর ১৪.০৫.৮৯

৩৬. পথে পথে একার ছায়া ২৯.০৫.৮৭

৩৭. সেই বনে আজো ফুল ফুটে হেসে রয় ১৬.০৫.৮৭

৩৮. সাদা কালো মানুষের ভেদাভেদ নেই

৩৯. শৃংখল মুক্তির জন্যে কবিতা আজ ২২.০১.৮৭

সুরঃ ফকির আলমগীর

৪০. নূর হোসেনের লেখা আন্দোলনের নাম ০২.০২.৮৮

সুরঃ ফকির আলমগীর

৪১. রোমের রাজা বাঁশি বাজায়/ কারবাইনের সুরে ০২.০২.৮৮

৪২. শাদা মানুষের পিশাচের থাবা ০৫.০৪.৮৬

৪৩. সংবাদপত্রের টোকাই না বাই ০৬.০৪.৮৬

৪৪. সারা জীবন এই জীবনের/ঝরাপাতা টোকাই ০৬.০৪.৮৬

৪৫. কষ্টের কথা বলতে গেলে ২৭.১০.৮৫

সুরঃ ফকির আলমগীর

৪৬. নানান রঙের দালান উঠেছে ঢাকার শহরে ২৫.১০.৮৫

৪৭. এই জীবন দিয়ে জানিয়ে গেলাম/জীবন অন্ধকার ২৫.১০.৮৫

সুরঃ ফকির আলমগীর

৪৮. শবমেহেরের কপাল তার হাতে ২৫.০৪.৮৫

সুরঃ ফকির আলমগীর

৪৯. এই দেহ বানাইছে আল্লায় ০৪.০৫.৮৫

৫০. ইচ্ছা ছিল মনে/ আশা ছিল মনে

৫১. ভাঙা চোরা মন ০৪.০৫.৮৫

৫২. পাপ কারে কয় সই? ০৪.০৫.৮৫[৪]

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ:

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর অসংখ্য কবিতা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কবিতাপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রকাশ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা উল্লেখযোগ্য বিবরণ নিচে দেয়ার চেষ্টা করছি:

	প্রকাশ কাল
দুর্বিনীত, ঢাকা	৮ ফাল্গুন ১৩৭৯
সম্পাদক: মিয়া মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
১. দুর্বিনীত	
কালস্রোত, ঢাকা	
সম্পাদক: মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম	
২. ক্লান্ত নাবিক	ডিসেম্বর ১৯৭৭
৩. বন্যাক্রান্ত স্বদেশ এবং চশমা	জুলাই/অক্টোবর ১৯৭৪
লোকালয়, ঢাকা	
সম্পাদক: কামাল চৌধুরী	
৪. নিরুদ্দিষ্ট ব্যবধান	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
ঢাকা ডাইজেস্ট, ঢাকা	
সম্পাদক: ওবায়দুর রহমান	
৫. একখানা শেফালিকা বাস	জুলাই ১৯৭৫
পেন্ডুলাম, ঢাকা	
সম্পাদক: জাফর ওবায়েদ	
৬. সম্প্রতি আমার চশমা উপলক্ষ্যে	
৭. তুমি চলে গেলে তোমাকে পেলাম	মাচ/এপ্রিল ১৯৭৫
৮. এনে দেবো শিল্পসম্মত কবিতার ভুবন	
৯. যে-কোনো পাহাড়েই আমি উঠতে পারি	
১০. জলপাই এবং সাম্প্রতিক টুকিটাকি	
১১. বিড়াল সম্পর্কিত দ্বৈত মত	
পায়ের চিহ্ন এই বাটে, ঢাকা	
সম্পাদক: মানস ঘোষ	
১২. অপরূপ ধ্বংশ	১৯৭৫

শাপলা, নারায়ণগঞ্জ
সম্পাদক: বংশী সাহা

১৩. অনিশ্চিত আহ্বানে	একুশের সংকলন ১৩৮৩

সেঁজুতি, ময়মনসিংহ
সম্পাদক: তসলিমা নাসরিন

১৪. পরবাসে খাট	আষাঢ়-আশ্বিন/১৩৮৬

কণ্ঠস্বর, ঢাকা
সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

১৫. ফুলেরা কৃষ্ণপক্ষে চলে যায়	দশম বর্ষ ১৯৭৫

পূর্বাচল, ঢাকা
সম্পাদক: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়

১৬. অসমাপ্ত ইচ্ছের দরোজায়	চৈত্র ১৩৮১
১৭. জানালায় জেগে আছি	আষাঢ় ১৩৮৩
১৮. ফেনায় ফসলের জীবন	আশ্বিন ১৩৮৪
১৯. সমুদ্রে সমুর্পিত	অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

গণমন, ফরিদপুর
সম্পাদক: ফরিদপুর জেলা বোর্ড

২০. আকাশে নিঃশব্দ রোদ	জুলাই ১৯৭৬
২১. ধানের স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে	মে ১৯৭৭

সমকাল, ঢাকা
সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান/ ইসমাইল হোসেন

২২. আজীবন জন্মের ঘ্রান	ভাদ্র ১৩৮৩
২৩. বিপরীত আকাঙ্ক্ষা	শ্রাবণ ১৩৮৪

আবাহন, ঢাকা
সম্পাদক: আসাফ্উদদৌলা রেজা

২৪. যুদ্ধ কোথায়	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭
২৫. বসন্ত উৎসব	এপ্রিল ১৯৭৭

মহুয়া, ময়মনসিংহ
সম্পাদনাঃ ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড

২৬. দুঃসাহসী আঙুলে	পৌষ ১৩৮৩
২৭. প্রতিকূল পিরামিড	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৩
২৮. উদাসীন প্রস্থান	বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৩৮৪

উত্তরাধিকার, ঢাকা
সম্পাদনাঃ বাংলা একাডেমী

২৯. আধখানা বেলা	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭
৩০. বিষবৃক্ষ ভালোবাসা	নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৭

রানার, ঢাকা
সম্পাদনাঃ সংস্কৃতি সংসদ (ঢাঃ বিঃ)

৩১. রক্তের বীজ	বিজয় দিবস ১৯৭৭

মুক্তকণ্ঠ, ঢাকা
সম্পাদকঃ বিভুরঞ্জন সরকার

৩২. প্রতীক্ষার পথ	একুশের প্রকাশনা ১৯৭৮

পরিচয়, কলকাতা
সম্পাদকঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩. গহীন গাঙের জল	জুলাই ১৯৭৫

প্রতিধ্বনি, ঢাকা
সম্পাদকঃ গোলাম রব্বানী বাবু

৩৪. আমি সেই অভিমান	এপ্রিল ১৯৭৮

প্রতিফলন, ঢাকা
সম্পাদকঃ চৌধুরী মোহাম্মদ জহুরুল হক

৩৫. অসুস্থ চাঁদ	ভাষাদিবস সংখ্যা ১৯৭৮

স্বকাল, ঢাকা
সম্পাদকঃ আহমদ আজাদ

৩৬. রৌদ্র সম্পাদ	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

শব্দশ্রমী, ঢাকা

সম্পাদক: তারিক এ. খন্দকার

৩৭. একদিন কৃষ্ণচূড়া	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
৩৮. বিষের বকুল	জুন-জুলাই ১৯৭৮
৩৯. নেপথ্য ট্রাফিক	বিজয় দিবস ১৯৭৭

অরণি, সিরাজগঞ্জ

সম্পাদক: সাইফুল ইসলাম

৪০. কৃষ্ণপক্ষে ফেরা	একুশের সংকলন ১৯৭৮

গণসাহিত্য, ঢাকা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: আব্দুল হাফিজ/মফিদুল হক

৪১. অপরাধ দগ্ধদীপ	বৈশাখ ১৩৮৫
৪২. হাড়েরও ঘরখানি	ফাল্গুন ১৩৮৭

তারুণ্যের অক্ষর, ঢাকা

সম্পাদক: আবুল কাসেম

৪৩. বিশ্বাসী বৃক্ষের ছায়া	একুশের প্রকাশনা ১৯৭৮

ধানসিঁড়ি, ঢাকা

সম্পাদক: শাহেদ মিজানুর রহমান

৪৪. নির্জন হত্যাকারী	মাঘ ১৩৮৪

রৌদ্রের রঙ, ঢাকা

সম্পাদক: শামীম কবীর/ নাঈম হাসান

৪৫. শূন্যতার পিপীলিকা	বিজয়দিবস ১৯৭৮
৪৬. বিশ্বামিত্র নই	পৌষ-মাঘ ১৩৮৭

ভাস্কর, খুলনা

সম্পাদক: কামাল উদ্দীন মাহমুদ

৪৭. বিশ্বাসের চোখে নির্মান	চতুর্থ সংখ্যা ১৯৭৮

স্বকীয়তা, ঢাকা

সম্পাদক: ইসরাইল খান

৪৮. চাঁদের করোটি	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
৪৯. আঁধার শীতল রাত	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

সভ্যতা, ঢাকা

সম্পাদক: হাফিজুর রহমান

৫০. বিশ্বাসের হাতিয়ার — এপ্রিল ১৯৭৭

সাম্প্রতিক, ঢাকা

সম্পাদক: আমিনুল ইসলাম বেদু

৫১. সেই গ্রাম সেই বুকের পাঁজর — শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৪

৫২. আমি সেই অভিমান — ফাল্গুন ১৩৮৩

৫৩. নক্ষত্রের ধুলো — ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২

ইশতেহার, ঢাকা

সম্পাদনা: জাতীয় ছাত্রদল, ঢাকা নগর কমিটি

৫৪. করতলে গ্রেনেড — ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

ধলেশ্বরী, ঢাকা

সম্পাদক: নাসিমা খান

৫৫. সম্রাটের চাবুক — ১৯৭৬

৫৬. প্রিয় দংশন বিষ — ১৯৭৭

৫৭. জানালা দরজাবিহীন অন্ধকার — ১৯৭৮

৫৮. সন্ধ্যাকালীন মহুয়াকে — ১৯৭৬

বন্ধ করোনা পাখা, ঢাকা

সম্পাদক: জাফরুল আহসান

৫৯. অশোভন তনু — সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

বিশ্বাস, ঢাকা

সম্পাদক: মুহম্মদ নূরুল হুদা

৬০. মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন — জানুয়ারি/মার্চ ১৯৭৭

তোমার আঙিনা জুড়ে, ঢাকা

সম্পাদক: আবুল কাসেম

৬১. বিশ্বাসের হাতিয়ার — বৈশাখ ১৩৮৫

নান্দনিক, ঢাকা

সম্পাদক: মুস্তাফা আনোয়ার

৬২. পাললিক উদ্ধার	২৬ মার্চ ১৯৭৭
৬৩. মোহমগ্ন পর্যটন	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬

নির্জন ক্রোধ, ঢাকা

সম্পাদক: আনোয়ারুল ইসলাম/মাহবুব নওরোজ

৬৪. হারানো হরিনপুর	শহীদদিবস ১৯৭৭

সুপ্রভাত, ঢাকা

সম্পাদক: সুলতানা বেগম

৬৫. উপদ্রুত উপকূল	জানুয়ারি ১৯৭৮

ছাড়পত্র, ঢাকা

সম্পাদক: রনু রহমান

৬৬. প্রতিবাদী সবুজ শ্রমিক	একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

শ্লোগান, খুলনা

সম্পাদক: অনুশীলন কবি গোষ্ঠী

৬৭. ফেনিল মেঘলা চোখ	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

মাতাল মোহনা, রাজশাহী

সম্পাদক: রেজাউল কাবীর

৬৮. মাতাল মোহনা	১৩/৯/১৯৭৭

অয়ন, ঢাকা

সম্পাদক: তপন জ্যোতি

৬৯. অনুর্বর ঋতু	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭
৭০. হে হরিৎ হনন বিলাসী	জানুয়ারি ১৯৭৭

পলি মাটি, ঢাকা

সম্পাদক: বিমল দত্ত

৭১. মানুষের মানচিত্র- ২৩	পৌষ ১৩৯০
৭২. বৈশাখি ছেনাল রোদ	বৈশাখ ১৩৮৮

মড়ক, ঢাকা

সম্পাদকঃ বাবুল আনোয়ার

৭৩. মানুষের মানচিত্র- ৫ আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩

বিকেল, ঢাকা

সম্পাদকঃ মাহমুদ মান্না

৭৪. মানুষের মানচিত্র- ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

৭৫. মানুষের মানচিত্র- ৫

প্রগতি, ঢাকা

সম্পাদকঃ নূর মোহাম্মদ নূর

৭৬. সাহস মে দিবস সংখ্যা ১৯৭৯

অরোরা, ঢাকা

সম্পাদকঃ মহিউদ্দিন আহম্মেদ

৭৭. প্রতিবাদ পত্র শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৮৩

দুর্যোগের আলো, ঢাকা

সম্পাদকঃ শফিউল্লাহ্ নাজিম

৭৮. মানুষের মানচিত্র- ২৯ স্বাধীনতা দিসব সংখ্যা ১৯৮৩

এই সময়, ঢাকা

সম্পাদনাঃ ধূমকেতু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ

৭৯. আল্লাতালার হাত একুশের সংকলন ১৯৮৪

৮০. চরিত্র বদল একুশের সংকলন ১৯৮৬

জয়ধ্বনি, ঢাকা

সম্পাদকঃ রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা

৮১. নৈশভোজ '৮৩ একুশের প্রকাশনা ১৯৮৮

রক্তঘামে রক্তমাখা, রাজশাহী

সম্পাদকঃ আবু রাকিব

৮২. পাকস্থলি একুশের প্রকাশনা ১৯৮৫

কাশবন, ঢাকা

সম্পাদকঃ আমিনুল ইসলাম

৮৩. কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প অক্টো-ডিসেম্বর ১৯৮৬

নৈকট্য, ঢাকা

সম্পাদক: মিজানুর রহমান বাবু

৮৪. পৃথক প্রবেশ — একুশে সংখ্যা ১৯৮৭

সাহিত্য সাময়িকী, ঢাকা

সম্পাদনা: শিরিন সুলতানা

৮৫. শ্মশান — সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

স্রোত, ঢাকা

সম্পাদক: ফজল মাহমুদ

৮৬. স্বাস্থ্যসম্মত প্রত্যাখান — ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

কিছু ধ্বনি, ঢাকা

সম্পাদক: আনওয়ার আহমেদ

৮৭. গাছগাছালির গল্প — জানুয়ারি ১৯৮৮

৮৮. শাড়ি কাপড়ের গল্প

ঢাকার ডাক, ঢাকা

সম্পাদক: আলতাফ আলী হাসু (ঋষিজ)

৮৯. দৃশ্যবাক্য- ২ — একুশে সংকলন ১৯৮৮

৯০. গান (মুক্তিপাক)

নান্দীপাঠ, ঢাকা

সম্পাদক: সাজ্জাদ আরেফিন

৯১. চোখ খুলে গ্যালো — জুলাই ১৯৮৮

জয়ন্তী, ঢাকা

সম্পাদক: মাহফুজুর রহমান মাহফুজ

৯২. মানুষের মানচিত্র- ১০ — আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮১

অঙ্গীকার, ঢাকা

সম্পাদক: মনোজ মণ্ডল

৯৩. শিকড় — একুশে সংকলন ১৯৮১

জয়ধ্বনি, ঢাকা

সম্পাদক: বিভুরঞ্জন সরকার

৯৪. গহিন গাঙের জল — একুশে ১৯৮১

ইন্দ্রানী, কলকাতা

সম্পাদক: নির্মল বসাক

৯৫. সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো রথযাত্রা ১৩৮৮

গণসংস্কৃতি, ঢাকা

সম্পাদক: কুয়াতউল ইসলাম

৯৬. মানুষের মানচিত্র ফাল্গুন ১৩৮৮

৯৭. ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ ঘৃন্য চতুরতা আশ্বিন ১৩৯৭

পতাকা যারে দাও, ঢাকা

সম্পাদক: জাফর ওয়াজেদ (ডাকসু)

৯৮. মনে করো তাম্রলিপ্তি একুশে প্রকাশন ১৯৮১

সুন্দরম, ঢাকা

সম্পাদক: আবুল কালাম আজাদ

৯৯. একজন উদাসিন সেপ্টেম্বর ১৯৮০

চেতনা, ঢাকা

সম্পাদক: সাদেক সাচী

১০০. অতিক্রম একুশে সংকলন ১৯৮০

অলক্ত, কুমিল্লা

সম্পাদক: তিতাস চৌধুরী

১০১. একজন উদাসিন এপ্রিল ১৯৮০

জয়ধ্বনি, ঢাকা

সম্পাদক: কামরুল আহসান

১০২. নীল কারুকাজ পুড়িয়ে দেব একুশে প্রকাশনা ১৯৮০

কবি, যশোর

সম্পাদক: বোরহানউদ্দিন জাকির

১০৩. শ্রাবন এলে আকাশের চোখে শহীদ দিবস ১৯৭৬

সংলাপ, কুমিল্লা

সম্পাদক: কিংশুক ওসমান/সপ্তক ওসমান

১০৪. আঁধারের শ্রমিক ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

রক্তের সিঁড়ি বেয়ে, ঢাকা

সম্পাদক: মতিউর রহমান ভূঁইয়া

১০৫. অন্তর্গত জটিলতা — একুশে ১৯৭৬

কিংশুক, ঢাকা

সম্পাদক: জালাল আহমেদ চৌধুরী

১০৬. অলৌকিক রাতে শব্দের শিশির — বৈশাখ ১৩৮৩

১০৭. স্মৃতি বিষয়ক তৃতীয় ঢেউ — বৈশাখ ১৩৮২

কৃষ্ণের লাল পাখী, ঢাকা

সম্পাদক: শাহরিয়ার ইমাম

১০৮. বিকল্প বসতি — জুলাই ১৯৭৬

কণ্ঠস্বর, ঢাকা

সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

১০৯. বেলা যায় বোধিদ্রুমে — মার্চ ১৯৭৬

কৌসুমী, ঢাকা

সম্পাদক: কামাল আতাউর রহমান

১১০. গ্লানির মুকুট মাথায় — ১৯৭৬

১১১. নিবেদিত বকুল বেদনা — ডিসেম্বর ১৯৭৬

ছন্দধারা, ঢাকা

সম্পাদক: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া

১১২. গৈরিক লাবণ্য তুমি — আশ্বিন ১৩৮৩

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, রংপুর

সম্পাদক: আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১১৩. কষ্টবিদ্ধ মানুষ — বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৩

১১৪. শস্যের বিশ্বাস — ঐ

ইদানিং, ঢাকা

সম্পাদক: এরশাদ হাসিব

১১৫. অনির্দিষ্ট অধিবাস — কার্তিক ১৩৮৩

বিচিত্রা, ঢাকা	
সম্পাদক: শামসুর রাহমান	
১১৬. মানুষের মানচিত্র- ২৫	৮ ফাল্গুন ১৯৮৩
১১৭. মানুষের মানচিত্র- ৩১	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
১১৮. মৌলিক মুখোশ	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
বিচিন্তা, ঢাকা	
সম্পাদক: মিনার মাহমুদ	
১১৯. এক্স-রে রিপোর্ট	২৪ জানুয়ারি ১৯৮৮
দিকচিহ্ন, ঢাকা	
সম্পাদক: মোহন রায়হান	
১২০. রূপকথা	উৎসব সংখ্যা ১৩৯৬
ভারত বিচিত্রা, ঢাকা	
সম্পাদক: বেলাল চৌধুরী	
১২১. আত্মরক্ষা	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
১২২. তছনছ বিশ্বামিত্র	জুলাই ১৯৯০
নিপুণ, ঢাকা	
সম্পাদক: শাহজাহান চৌধুরী	
১২৩. জীবন-যাপন- ৩	১ বৈশাখ ১৩৯২
১২৪. চিত্র নাট্য- ১	মার্চ ১৯৮৪
সাপ্তাহিক লাবণী, ঢাকা	
সম্পাদক: লীনা কবীর	
১২৫. ফেরা	শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৮৭

রোববার, ঢাকা

সম্পাদক: আব্দুল হাফিজ

১২৬. শ্মশান	শহীদ দিসব ১৯৮৭
১২৭. কাচের গেলাসে উপচানো মদ	২৯ নভেম্বর ১৯৭৮
১২৮. পথের পৃথিবী	শহীদ দিবস ১৯৭৯
১২৯. অপরাহ্নের অসুখ	২২ জুলাই ১৯৭৯
১৩০. খামার	২ মার্চ ১৯৮০
১৩১. হাউসের তালা	২৮ ডিসেম্বর ১৯৮০
১৩২. মানুষের মানচিত্র- ১৬	১৩ ডিসেম্বর ১৯৮১
১৩৩. অনুতপ্ত অন্ধকার- ১	২৮ আগস্ট ১৯৮৩
১৩৪. অনুতপ্ত অন্ধকার- ২	১৩ নভেম্বর ১৯৮৩
১৩৫. জীবনযাপন	ঈদে মুনর্মিলনী সংখ্যা ১৯৮৫
১৩৬. অবচেতনের পথঘাট	২২ মে ১৯৮৮
১৩৭. ঘুমিয়ে পড়েছে সব	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

পূর্ণিমা, ঢাকা

নির্বাহী সম্পাদক: আতাহার খান

১৩৮. পাখিদের কথা ভেবে ডানা মেলে দেই	২১ নভেম্বর ১৯৯০

মূলধারা, ঢাকা

প্রধান সম্পাদক: শামসুর রাহমান

১৩৯. নষ্ট আঙুলে নষ্ট নিখিল নীড়	২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
১৪০. অপ্রাপ্ত আধুলি	২৫ মার্চ ১৯৯০
১৪১. নদীর ওপারে সূর্য	১৭ জুন ১৯৯০
১৪২. ১৯৮৯	৭ জানুয়ারি ১৯৯০

সাপ্তাহিক আগামী, ঢাকা

সম্পাদক: আরেফিন বাদল

১৪৩. পরকীয়া	১৬ নভেম্বর ১৯৯০

উত্তরণ, ঢাকা

সম্পাদক: কাজী আকরাম হোসেন

১৪৪. গাঢ় দুঃসময়	২৪ জুন- ৮ জুলাই ১৯৯০

লাবণী, ঢাকা

সম্পাদক: নাঈমুল ইসলাম খান

১৪৫. প্রজাপতির স্বভাব — ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

শতাব্দী, ঢাকা

প্রধান সম্পাদক: শামসুল বারী উৎপল

১৪৬. যুগল দোলনা — স্বাধীনতা দিবস ১৯৯০

ক্যাম্পাস, ঢাকা

সম্পাদক: আশরাফ মোহাম্মদ ইকবাল

১৪৭. সুতনুকা উদ্ধার — ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৭

মাসিক প্রতিরোধ, ঢাকা

সম্পাদক: আরেফিন বাদল

১৪৮. ফসলের সভ্যতা — ১ অক্টোবর ১৯৭৭

১৪৯. কার্পাস মেঘের দিকে — ১ অক্টোবর ১৯৭৮

মণীষা, ঢাকা

সম্পাদক: জাহানারা তাহের

১৫০. পলাতকা শুভ্র আঙুল — বর্ষশুরু সংখ্যা ১৯৭৭

পাক্ষিক আজকাল, ঢাকা

কার্যনির্বাহী সম্পাদক: সেলিনা হোসেন

১৫১. প্রতীক্ষার চিতায় — ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮

সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রধান সম্পাদক: এম. এ. ওহাব

১৫২. পরানে চাই দখিন হাওয়া — ১ অক্টোবর ১৯৯০

১৫৩. হাউসের তালা — ১ মে ১৯৮১

দীপক, ঢাকা

সম্পাদক: কাজী জহুরুল হক

১৫৪. মানুষের মানচিত্র- ৯ — ভাদ্র ১৩৮৮

১৫৫. মানুষের মানচিত্র- ১০ — কার্তিক ১৩৮৮

১৫৬. মানুষের মানচিত্র- ১২ — মাঘ ১৩৮৮

সচিত্র স্বদেশ, ঢাকা

সম্পাদক: জাকিউদ্দিন আহমেদ

১৫৭. মানুষের মানচিত্র- ৬	১৪ জানুয়ারি ১৯৮২
১৫৮. মানুষের মানচিত্র- ১৩	৮ জুলাই ১৯৮২

সাপ্তাহিক বিপ্লব, ঢাকা

সম্পাদক: সিকদার আমিনুল হক

১৫৯. মানুষের মানচিত্র- ২	২৭ জুলাই ১৯৮৩
১৬০. মানুষের মানচিত্র- ৩০	৫ জানুয়ারি ১৯৮৮
১৬১. অনুতপ্ত অন্ধকার- ৪	২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

সচিত্র সন্ধানী, ঢাকা

সম্পাদক: গাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ

১৬২. স্বপ্নগ্রস্ত	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
১৬৩. একজোড়া অন্ধ আঁখি	৩০ জুলাই ১৯৭৮
১৬৪. পৌরানিক চাষা	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
১৬৫. চাষারা ঘুমিয়ে আছে	৪ মার্চ ১৯৭৯
১৬৬. বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা	১৫ এপ্রিল ১৯৭৯
১৬৭. দ্বিধা	১৪ অক্টোবর ১৯৭৯
১৬৮. মানুষের মানচিত্র- ১	২৬ জুলাই ১৯৮১
১৬৯. মানুষের মানচিত্র- ৭	১৫ জুলাই ১৯৮১
১৭০. দুটি চোখ মনে আছে	১১ জানুয়ারি ১৯৮১
১৭১. মানুষের মানচিত্র- ১১	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২
১৭২. মানুষের মানচিত্র- ৯	২০ ডিসেম্বর ১৯৮১
১৭৩. মানুষের মানচিত্র- ১০	১৮ এপ্রিল ১৯৮২
১৭৪. নপুংশক কবিদের প্রতি	২ ডিসেম্বর ১৯৮৪
১৭৫. ক্রান্তিকাল	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

গণবার্তা, কলকাতা

সম্পাদক: সুখময় চক্রবর্তী

১৭৬. নৈশভোজ	শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭[৫]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর অসুস্থতা ও মৃত্যুঃ

রুদ্র'র শেষ জীবন আদৌ সুখকর ছিল না, একাকী-নিঃসঙ্গ জীবনে তিনি শরীরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেছেন। মাত্রাহীন মদ্যপান ও ধূমপান জনিত কারণে ক্যান্সার রোগে ভুগেছেন। তারপরও বিভিন্ন আড্ডায় বসে কবিতা ও দেশের কল্যাণের কথা বলেছেন, পরিকল্পনা এঁকেছেন, উৎসাহ-আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। "সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক এমনকি সাংসারিক জীবনেও তিনি ছিলেন আমৃত্যু উপদ্রুত"।[৬]

১৯৯১-র শুরু থেকেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। পাকস্থলীতে আলসার এবং পায়ের আঙুলে বার্জাস ডিজিজ হয়েছিল। খাবারে অনিয়ম তার উপর ধুমপান-মদ্যপান নিত্যদিনের। "রুদ্রের পায়ের আঙুলে একবার বার্জাস ডিজিজ হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, পা-টাকে বাঁচাতে হলে সিগারেট জাড়তে হবে। পা এবং সিগারেটের যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে বলেছিলেন। রুদ্র সিগারেট বেছে নিয়েছিল। জীবন নিয়ে রুদ্র যতই হেলাফেলা করুক, কবিতা নিয়ে করে নি, কবিতায় সে সুস্থ ছিল, নিষ্ঠ ছিল, স্বপ্নময় ছিল"।[৭]

হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকেও রুদ্র মানসিক শক্তি হারান নি। কিছুটা সুস্থ হবার পর কবি ভ্রাতা ডাঃ মুহম্মদ সাইফুল্লাহ তাঁকে নিয়ে ২০ জুন রাজা বাজারস্থ বাসায় নিয়ে আসেন। পরের দিন ২১ জুন ১৯৯১, রুদ্র ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়া সেরে দাঁত ব্রাশ করতে বেসিনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ থুবড়ে বেসিনের উপর পড়ে যান এবং সাড়ে সাতটার সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাযার পর কবির মৃত্যুদেহ ২২ জুন তাঁর গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এবং রুদ্র'র শৈশব-কৈশরের স্মৃতি বিজড়িত বাগের হাটের মংলার মিঠেখালিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দেশের প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা রুদ্রের মৃত্যুর শোকবার্তা প্রকাশ করে এবং অনেক পত্রিকা রুদ্রের উপর প্রতিবেদন ছাপায়। রুদ্রের গ্রামের বাড়িতে ১৯৯২ সালে "রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" স্থাপন করা হয়। গঠন করা হয় 'রুদ্র সংসদ'।

সমকালীন কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের মতামতঃ

তাঁর মৃত্যু অব্যবহিত পরে সমকালীন অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সাময়িকীতে আলোচনা করেছেন; তার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে আমরা কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত মতামত নিম্নে তুলে ধরছি। রুদ্রের কবিতা ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতার বিস্তৃত বিবরণ শেষে কবি শামসুর রাহমান বলেন–

> মাত্র পনর বছরের ব্যবধানে আমাদের দু'জন কবি আবুল হাসান এবং রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে ভোগ নিলো কবিতা। এই নাতিদীর্ঘ রচনায় আমি রুদ্রের কাব্যক্ষমতা নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা করিনি। এটা এখনও সম্ভব নয়; কারণ এই মুহূর্তে আমরা শোকার্ত, আবেগতাড়িত; মূল্যায়ন বিষয়ে অন্যমনস্ক। প্রতিশ্রুতিশীল এই কবির কাব্যক্ষমতা পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই মৃত্যু লোভাতুর তস্কারের মতো চুরি করে নিয়ে গেল তাঁকে। তাঁর শেষের দিকের কবিতা প'ড়ে মনে হচ্ছিলো, তাঁর কাব্য নতুন বাঁক নিতে যাচ্ছে; অন্তত 'আজকের কাগজে' সদ্য প্রকাশিত কবিতাটি প'ড়ে আমি বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি, রুদ্র তাঁর প্রাক্তন কাব্যভাবনা থেকে কিছুটা হ'লেও সরে যাচ্ছিলেন। রুদ্র বলেছেন 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম'। আমরা কি কোনোদিন ফিরো পাবো সেই স্বর্ণগ্রাম, যার জন্যে এত ব্যাকুলতা ছিল সেই তরুণ কবির মর্মমূলে?[৮]

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-সমালোচক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সরস আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন:

> বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তার অনেক চিন্তা ছিল, ক্রোধ ও হতাশা ছিল, কিন্তু এই প্রতাশাও তার কবিতায় ছিল যে সময়ের সঙ্গে সমান্তরাল যদি মানুষের পদযাত্রা এগিয়ে যায়, সে মানুষ ইতিহাসের কাছে পরাস্ত হয় না। তার কবিতায় ইতিহাস কোনো মিথ্যা পাঠ দেয় না, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করেনা কোনো অলীক মোহ– অত্যন্ত নির্মোহভাবে বর্তমানের সকল ভূমিকে পর্যবেক্ষণ করেছে সে, তার ভবিষ্যতে আশাবাদ বাস্তবের ঐ ভূমিতে শিকড় মেলেছে। রুদ্রের কবিতার প্রধান কালটি বর্তমান, প্রধান শক্তিটি সংগ্রামের, সংঘাতের; প্রধান পুলকটি ঐ সংগ্রাম ও সংঘাতের পর বিরল কোনো অর্জনের। ... তার কবিতায় শুধু মানুষ, শুধুই পরিকীর্ণ নিসর্গ, শুধুই উচ্ছ্বাস, দ্রোহ, কলরোল। পল ভ্যালেরীর একটি কথা যেন প্রমাণিত করেছে রুদ্র যে, যে কবি যত বেশী একা, তত তার প্রাণবন্ত সংসার। রুদ্রের কবিতার এই ভিড়াক্রান্ত জগৎ তার কমিটমেন্টগুলোকে প্রতিফলিত করে।[৯]

কবি-প্রাবন্ধিক মুহম্মদ নূরুল হুদা, বয়সে বড়ো হলেও রুদ্রের সহচর ও প্রেরণাদাতা ছিলেন; রুদ্রের কবিতার প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যার অংশ বিশেষ এমন:

> রুদ্র আগাগোড়া লিখতে চেয়েছে ভালো কবিতা, উত্তীর্ণ কবিতা, পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য কবিতা, যে মৌলিক কবিত্ব শক্তির অধিকারী, সে ভেতরঙ্গেই নতুন কবি। কাজেই কষ্টার্জিত মুদ্রার খেলায় নিজেকে নতুন কবি হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন থাকে না তার। রুদ্র নিজের কিবত্ব সম্বন্ধে এতোখানি নিঃসন্দেহচিত্ত ছিল যে, সে তথাকথিত নতুনত্বের কসরৎ নিয়ে কোনো কালেই ব্যস্ত ছিল

না। নতুন কবিতা তো নতুন বাণী নতুন ভাষা নিয়ে আসবেই। ফলে পরিবর্তিত হয়ে চলবে কাব্যভাষা। এই সহজ বিশ্বাসে সমর্পিত রুদ্র তাই বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ধাঁচে, বিভিন্ন ছন্দে কবিতা লিখেছে। গীতিকবিতা, মন্ময় প্রেমের কবিতা, তন্ময় বক্তব্যপ্রধান কবিতা, গল্পাশ্রয়ী দীর্ঘ কবিতা, নাট্যকবিতা, নাট্যকাব্য ইত্যাদি প্রচলিত বিভিন্ন আঙ্গিকের দ্বারস্থ হয়েছে সে অকৃপণভাবে। কিন্তু অযাচিতভাবে করেনি কাব্যিক স্বয়ম্ভুত্ব কিংবা আরোপিত নতুনত্ব। একে অন্যভাষায় বলা যেতে পারে কাব্যিক বিনয় বা সদাচার, যা যে- কোনো বড় কবির মৌলিক পুঁজি। প্রকৃত কবি অকৃপণভাবে গ্রহণ করেন তাঁর পূর্বসুরিদের রচনা ও অভিজ্ঞতা থেকে, প্রভাবিত হন কাব্যজীবনের শুরুতে। কবিতার ক্ষেত্রে অ্যাবসলিউট স্বয়ম্ভু বা নতুন বলে কোনো কথা নেই, থাকতে পারে না। রুদ্র, তাই, তার সক্ষম উত্তরসূরিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে কাব্যভাষা ও কাব্যপ্রক্রিয়া। এমনকি বিষয়ের ক্ষেত্রেও রুদ্র-র কোনো অভিনবত্ব প্রয়াস নেই। রুদ্র-র কাব্যবিশ্বাস ও কাব্যপ্রয়াসের ভেতর লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের অনমনীয় একরৈখিকতা। উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতসাধনে রুদ্র ব্রতী হয়েছিলো ভিন্নমেরুনিবাসী তার এক শ্রদ্ধেয় অগ্রজের মতোই। পূর্বসূরিদের ধ্যান-কল্পনা এভাবেই আত্মস্থ করেছিলো রুদ্র। যেন সে নিজের পৃথিবী নির্মাণ করতে পারে একান্ত আপনভাবেই। দূর পূর্বসূরিদের ভেতর কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিবৃন্দ, আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, সুকান্ত, সুভাষ, সমর, জীবনানন্দ এবং তাঁর সমকালীনদের ভেতর আল মাহমুদ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে নানা প্রয়োজনে।[১০]

কবি কামাল চৌধুরী ছিলেন রুদ্রের নিত্যদিনের সহযাত্রী রুদ্রকে কাছ থেকে বুঝেছেন, জেনেছেন এবং রুদ্রের কবিতা অনুধাবন করতে পেরেছেন। রুদ্রকে নিয়ে তাঁর বেশ ক'টি লেখা বর্তমান। তা থেকে রুদ্রের কবিতার মূল্যায়ন সংক্রান্ত এই অংশটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়:

আঞ্চলিক ভাষা ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, কাঠামোগত বিন্যাসে সৈয়দ শামসুল হকের 'পরানের গহিন ভেতর'-এর কবিতাগুলির সঙ্গে 'মানুষের মানচিত্রে'র সাযুজ্য রয়েছে গ্রামচেতনায় ও ভাষাগত প্রক্ষেপে মিল রয়েছে আল মাহমুদের সঙ্গেও। কিন্তু তারপরও এর অস্তিত্ব আলাদা, স্বাতন্ত্র্য সামগ্রিকতায়। এতে কোথাও কোথাও পূর্ববর্তীদের প্রতিধ্বনি আছে, শব্দের পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সুলতানের ছবির মতো বিশাল ক্যানভাসে উঠে এসেছে অন্তরঙ্গ জীবনের চালচিত্র। একটি কবিতাকে আলাদা করা যায় না অন্যটি থেকে, একটি উঠে এসেছে অন্যটির পরিপূরক হিসেবে। এভাবে তৈরী হয়েছে এক অখণ্ড সত্তা। রুদ্র'র কবিসত্তার যথার্থ স্ফূরণ ঘটেছে এই সিরিজের কবিতাগুলোতে।[১১]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর "ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম" (১৯৮১) প্রকাশ পাবার পর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে, সমালোচক হাসান ফেরদৌস 'সন্ধানী' গ্রন্থ-পরিচিত- এর মধ্যে সুন্দর আলোকপাত করেছেন। কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যায়- যা রুদ্রের সমগ্র কাব্যেরই একটা বিশিষ্ট প্রবণতা–

> রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর স্বভাবগত আড়ম্বরহীনতা তাঁর কবিতাতেও নিরাভরণ উচ্ছলতা নিয়ে এসেছে। সম্ভবত সে কারণেও এই গ্রন্থের এককুড়ি সাতটি কবিতাকে দ্রুত নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। শব্দের বাহাদুরী ব্যবহার, অক্ষরবৃত্তের ওস্তাদি কারুকাজ, লোকজ চিত্রের প্রয়োগ– রুদ্রের কবিতার এসব পরিচিতি উপসর্গ এ-গ্রন্থটিকে অলঙ্কৃত করেছে।[১২]

সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় নূরউল করিম খসরু লেখেন–

> রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় আবেগ, প্রেম, নষ্টালজিয়া ও ঐতিহ্য অহংকার উপজীব্য হলেও বার বার উঁকি দেয় মানুষ, সেই মানুষ পোড়-খাওয়া, তামাটে এবং গ্রামীণ। যাদের সারা জনম কাটে শস্য ফলনে, অথচঃ তেজি কব্জায় জমি চষে আমি ঘরে তুলে নেই ব্যথা,/ ঘরে তুলে নেই হাহাকারে ভরা অনাহারী দিনমান। (গহীন গাঙের জল) মূলত সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদনের চেতনা তার কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে উজ্জ্বল। তাছাড়া ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির জীবন কবিতায় চিত্রিত হয়েছে বেশি।[১৩]

রুদ্রের আর এক সহচর কবি আলমগীর রেজা চৌধুরী তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও কবিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার কিছু অংশ এমনঃ

> রুদ্রের মধ্যে কিছুটা বেপরোয়া ভাব ছিলো। দ্রোহী স্বভাব, কী চলনে, কী বলনে! কবিতায় শেকড় সন্ধানী আত্মমগ্নতা আমাকে প্রথম থেকে আকর্ষণ করেছিলো। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী, মুখে গোঁফ, পোষাক রং চকচকে পাঞ্জাবি, আর জিন্সের প্যান্ট। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো ওর অসাধারণ দু'টো চোখ। সত্যি কসম করে বলি, আমি ওকে হিংসে করতাম। রুদ্রকে বল্লে ও হাসতো। সবকিছুর মধ্যে বাউলাপনা ছিলো। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে যখন টিএসটি মোড় থেকে বাংলা একাডেমির দিকে হেঁটে যেত তখন মনে হত নগরে বাউল। ঢাকা শহরে প্রত্যেক অলিগলির কোনো-না-কোনো মুদির দোকানদারের সঙ্গে ওর জানাশোনা ছিলো। প্রচুর সিগারেট খেতে পারতো। স্টার ছিলো ওর প্রিয় ব্রাণ্ড। পরবর্তীতে গোল্ডলিফ। চা খেত প্রচুর। যে-কোনো যায়গায় বসে যেত চা খেতে। ফুটপাত থেকে ফাইভস্টার। আর মদ! হ্যাঁ সম্ভবত এটাও ওর প্রিয় বিষয়ের একটি। কবিতার মতো। প্রিয় নারী লীমার মতো। রাজনীতির মতো।[১৪]

কবি-প্রাবন্ধিক আহ্‌মদ রফিক বলেন:

ধবধবে ফর্সা চেহারা, নাদুস-নুদুস তুলতুলে শরীর আর কপালে কাজলকালো টিপ নিয়ে সে যখন মুখ তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে বড় বড় আয়ত চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেছে তখন সেই মায়াবী চাউনি সহজেই মন কেড়ে নিতো, সবারই নিয়েছে। ওর সেই চেয়ে থাকার ভঙ্গিটা ছিল আশ্চর্যরকম কোমল আর সুন্দর। ... . স্বভাবে ছিল বড়, অন্তর্মুখী, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ইনট্রোভার্ট'।[১৫]

বিশিষ্ট ছড়াকার-প্রাবন্ধিক রেজাউদ্দিন স্টালিন বলেন:

রুদ্রের কবিতার পয়ারগুলো পারাবত হয়ে শান্তির জন্যে উড়ে বেড়াতো। লোকজ শব্দরাজিকে শেকড়ের মতো অনুসন্ধান করে ফিরতেন রুদ্র। মনে পড়ছে গভীর রাত অব্দি রুদ্র ঘুরে বেড়াতেন আড্ডায়, রেস্তোরাঁয়, পান্থশালায়, রাস্তায় রাস্তায়। ভাবতেন নতুন শব্দ আর কবিতা নিয়ে। সংকট আর সম্ভাবনা নিয়ে। ... ... সবুজ লাবণ্যময় মুক্ত, পরিবেশের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় টান। কখনো কখনো খুব নিঃসঙ্গ থাকতে ভালোবাসতেন।[১৬]

কবি-স্থপতি রবিউল হুসাইন লেখেন:

মননে ও চিন্তায় রুদ্র দেশদরদী ছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল ওর চিন্তা-চেতনা। কবিতার বেলায়ও তার দৈশিক ঐতিহ্য এবং আবহমান বাংলার আদিরূপের উপাসনা, মগ্নতা ও সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যেতো। এসব কারণে তার কবিতা এত লোকপ্রিয় ছিল। আমরা যারা ওর চেয়ে বয়সে বড় ছিলাম, তাদের প্রতি সে সবসময় শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতো। মনে মনে দ্রোহী আবার বাইরে ভদ্র ও বন্ধু প্রিয়। ব্যক্তিগত মনোকষ্টে খুব ব্যথিত হয়েছে কিন্তু বাইরে তত প্রকাশ না পেলেও তার কবিতার মধ্য দিয়ে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। তার কষ্ট কবিতার লাইনে ফুটে উঠেছে। এসব জাতকবির লক্ষণ।[১৭]

কথা সাহিত্যিক ইসহাক খান রুদ্রের একেবারে ঘনিষ্ঠজন এবং অকৃত্রিম বন্ধু, রুদ্রকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক অনেক রচনা আছে; এখানে অংশ বিশেষ উল্লেখ করার মতো:

অনেকেই রুদ্রের অকাল মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। কেউ কেউ বলছে প্রচণ্ড আত্মঅভিমানেই রুদ্র আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। কেউ কেউ আবার রুদ্রের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার আবেগে রুদ্রের অকালমৃত্যুর জন্যে তার সাবেক জীবন সঙ্গিনীকে দায়ী করছে। তাদের ভাষ্য, 'রুদ্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার প্রেম। অন্তর্ঘাতী প্রেমই রুদ্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে; একজন তরুণ কবি সেদিন টিএসটিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'রুদ্ররা মরে

> কেন? কেন রুদ্রদের মতো প্রতিবাদী কবিদের এভাবে মরতে হয়? ... ... সবাই বলছে, আমার বন্ধুকে তার প্রেম শুষে নিয়েছে। যুক্তি দিয়ে কথাটি উড়িয়ে দেয়া যায়। আমি অবশ্য যুক্তি অযুক্তি কোনোটাতেই আপাতত যাব না। আমার বন্ধু মারা গেছে, এই সত্যই চিরসত্য। সেই বেদনা আমার সমগ্র জীবনের উপহার।[১৮]

বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক মাহবুব সাদিক রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবনীকার তপন বাগচী এর নিকটে সাক্ষাৎকারে যা বলেন, তা এখানে স্মরণযোগ্য:

> রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রধানত রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি কবিতার মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রকৃত আবেগের তীব্র তাপ তাঁর কবিতাকে কিছু উষ্ণতা বিলিয়েছিল। তাঁর স্বভাবে ছিল কবিতা এবং তাঁর বক্তব্য ছিল বলিষ্ঠ। এজন্যে তিনি জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। তবে তাঁর কবিতায় আবেগের শাসন ছিলনা। রুদ্রের কবিতায় ছন্দ কিছুটা এলোমেলো। প্রতীক ও সমৃদ্ধ রূপকের অভাব রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর আবেগতাড়িত কবিতার ভাষা তেমন আধুনিক নয়। তাঁর চিত্রকল্পও সুগঠিত হয়ে উঠেনি। প্রকরণের প্রতি সচেতন হওয়ার আগেই মৃত্যু তাঁকে অপহরণ করেছে।[১৯]

উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে আমরা রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাই; সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির টানাপোড়েনে রুদ্রের ব্যক্তি-মানসে এর প্রভাব যেমন পড়েছে, তেমনি রুদ্রের কবিতা শাণিত তরবারির মতো সমস্ত বিভ্রান্তি ও হতাশার মূলোৎপাটন করে অসহায় মানুষের মুক্তির দিশারী হতে চেয়েছে। স্বৈরাচারি অপশাসনের অবসান করে গ্রামীণ দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে রুদ্র তাই মার্ক্সিয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান। এজন্য তাঁর কবিতা সহজবোধ্য, প্রকরণে কিছুটা পাকাপোক্ত হবার আগেই মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করে।

তথ্য নির্দেশ

১. তপন বাগচী, 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ', বাংলা একাডেমী, জীবনী গ্রন্থমালা জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৩।

২. ঐ, পৃ. ৩৭।

৩. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, "উপলিকা সম্পর্কিত উপস্থাপনা", 'অশ্লীল জ্যোৎস্নায়' কবিতা পত্র, '১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৫। সৌজন্যেঃ তপন বাগচী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

৪. সৌজন্যেঃ তপন বাগচী, 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৪-৯৬।

৫. সৌজন্যেঃ তপন বাগচী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৯৩।

৬. আহমদ রফিক 'বিদায় মায়াবী চোখ 'সুদর্শন", দৈনিক বাংলা, সাহিত্য পাতা, জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৯।

৭. তসমিলমা নাসরিন, "রুদ্র ফিরে আসুক", আজকের কাগজ, ৪ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৫।

৮. শামসুর রাহমান, "ফিরে পাবো কি তাঁর স্বর্ণগ্রাম", সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৪ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১৩।

৯. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, "অলস দিনের হাওয়াঃ কবিকে নিয়ে লেখা", 'দৈনিক সংবাদ' সাময়িকী, ১৫ আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ৫।

১০. মুহম্মদ নূরুল হুদা, "রুদ্রের শুভ দৃষ্টি, সার্ত ও অন্যান্য", মুক্তধারা, ১৯৯৩, পৃ. ১১।

১১. কামাল চৌধুরী, "এই শহরের তূর্যবাদক", পাক্ষিক শৈলী, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫।

১২. হাসান ফেরদৌস, গ্রন্থ-আলোচনা, সাপ্তাহিক সন্ধানী, ২৪ মে ১৯৮১, পৃ. ২৯।

১৩. নূরউল করিম খসরু, সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১।

১৪. আলমগীর রেজা চৌধুরী, "অচল পত্র", 'কিছুধ্বনি', ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯১, পৃ. ৩১।

১৫. আহমদ রফিক, "বিদায়, মায়াবী চোখ সুদর্শন", দৈনিক বাংলা, সাহিত্য পাতা, ৫ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৯।

১৬. রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, "জীবনের দগ্ধ মসলিনঃ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ", দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী, ১১ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৫।

১৭. রবিউল হুসাইন, রুদ্রের কবিতা-জীবন, কিছুধ্বনি, অক্টোবর ১৯৯১।

১৮. ইসহাক খান, দ্রোহ যাকে করেছে রুদ্র, সাপ্তাহিক সংবাদচিত্র, ৫ জুলাই ১৯৯১।

১৯. তপন বাগচী, সাক্ষাৎকার, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, ১৯৯৮, পৃ. ১২২।

উপসংহার

সামরিক ও স্বৈরশাসন কবলিত বাংলাদেশের ঘনীভূত আত্মগ্লানিবোধ, বিভেদ ও বৈষম্যমূলক নীতির ফলে ব্যক্তিক জীবনে আত্মসঙ্কট এবং সমাজ দেহের সর্বত্র অরাজকতার দাপট; স্বাভাবিকভাবেই সবেতন কবিমনে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমস্ত রোমান্টিক ভাবালুতার বিসর্জন ঘটেছে। অন্যান্য সমাজবাদী, মানবদরদী কবির মতো রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এই বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করতে অত্যধিক সমাজ মনস্ক এবং রাজনীতির প্রখর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা কবিতাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এতে জনমনে প্রেরণার সঞ্চার হবে এবং সম্মিলিত মানুষ স্বৈরশাসন অবসানে রাজপথে জড়িত হবে। এমনি একটা বোধের উন্মোচন তাঁর কবিতায় দেখা যায়। অবশ্য গণমানুষের মনে অধিকার আদায়ের এই আবেগ, বিহ্বলতা ও উচ্ছ্বসিত প্রেরণা এবং সাম্রাজ্যবাদী অপঃশক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক– এ সমস্ত সৃষ্টি করেছে মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত শ্রেণী সংগ্রামের যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের বাস্তব প্রতিফলন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব।

গোটা ভারতবর্ষের সচেতন মানুষ মাত্রই এই সাম্যবাদী আন্দোলনে স্পন্দিত হয়েছেন কমবেশি। কবিদের মধ্যে অনেকেই সরাসরি সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সামজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেন। আবার অনেকের মধ্যে অতিরিক্ত মানবিক উপলব্ধিগত চেতনা জাগ্রত হওয়ায়, তাঁরা সংগঠনের আওতাভুক্ত না হয়েও গণমানুষের অধিকাবোধে উজ্জীবিত হয়ে উচ্চকিত করেছেন কণ্ঠস্বর। রুদ্র ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কবি ঢাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে স্বৈরাচার বিরোধী মঞ্চ সফল কবিতার মাধ্যমে শ্রেণী জাগরণের দ্বার উন্মোচিত করলেন; মুক্তিকামী মানুষকে একই কাতারে শামিল করতে নিজের মেধা-মনন ও শ্রমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রতিবাদী প্রেরণার সঞ্চার করলেন। কিন্তু দেখা যাবে, রুদ্রও তাঁর পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের দ্বারাই কমবেশি শ্রেণীচেতন হয়েছিলেন; এতে কোন নতুনত্ব উপকরণের উপস্থাপন ঘটেনি। তবে রাজনীতি ও কবিতার সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা লক্ষণীয়।

আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তির ফলে এখানে ইসলামী ভাবাদর্শের পাশাপাশি একটা সামন্তবাদী মূল্যবোধের জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে। যার ফলশ্রুতিতে এ দেশের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক একটা তীব্রতর নৈরাজ্যবোধের সম্মুখিন হলেন। তার মধ্যে সামান্য কয়েকনজন কবি সাম্যবাদী আদর্শে বিলোড়িত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য, তাদের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা ও গ্লানি, মুক্ত করতে এগিয়ে আসলেন। মূলত

তাঁরাই মানবিকতার জয়োল্লাসের জন্য অকুণ্ঠ চিত্তে একটা পাহাড় সমান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলাদশের সমাজ ও রাজনীতির ধারায় আমরা তাঁদের আলোচনায় এনেছি, তাঁদের বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এ দিক নির্দেশনার মূলে তাঁদের যে অবদান বেশি, তার আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। এতে দেখানো হয়েছে, তাঁদের চিন্তার প্রসার ও আন্দোলনের প্রতি তীব্রানুভূতির পরিবর্তে মানবিক জারক রসই বেশি আপ্লুত হয়েছে। আর তাঁরা তা পেয়েছেন ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

এই দু'টি যুগান্তকারী ঘটনাই মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কবিতাকে আরো বেশি শাণিত, মৃত্তিকা সংলগ্ন এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সংগঠিত করেছে। কেননা, এ দু'টি ঘটনা বাঙালি জাতির বিচ্ছিন্নতাবোধ নষ্ট করে একটা সম্মিলিত ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল। রুদ্রও সামরিক জাঁতাকল থেকে মানবতার মুক্তির জন্য, শোষণমুক্ত সমাজ গড়নে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করে সাম্যের জয়োগান গাইতে চেয়েছেন। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাঙ্খিত মনের মানুষগুলো, মুজিব, সিরাজ, তাহের- আরো অনেকে। কণ্ঠরোধ করছে জাগ্রত জনতার, বেয়োনেটের নিচে চাপা পড়ে আছে মানবতা।

রুদ্র এই ঘোর অমানিশার অবসান চান, অসুস্থ্য ও বিকৃত রাজনীতির কবলে পড়ে মানুষ নিজের সুষ্ঠ বিবেচনা বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে; ইটের নিচে চাপা পড়ছে মানব সভ্যতার কারিগরদের পাঁজর। তাই কবি রাজনীতি ও কবিতার সমন্বয়ে বিভেদহীন, শ্রেণীহীন কৌম সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বলা যায়, একজন জীবনবাদী ও সমাজবাদী কবির সকল প্রচেষ্টা গণমানুষের কল্যাণে উৎসর্গিত হলো। জনমনে সামরিক শৃঙ্খল ভাঙতে এবং প্রবল ঘৃণার উদ্রেক ঘটাতে তিনি যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালেন; তা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রকে ব্রাত্যজনের কাছাকাছি এবং জীবন ঘনিষ্ঠ করতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রয়োজন হলে এবং নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে তিনি অস্ত্রের মোকাবেলা অস্ত্রের মাধ্যমেই করতে চেয়েছেন; আর এভাবেই সাম্যবাদী সমাজে ফসলের সুষম বন্টন হবে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ একদিকে যেমন নাগরিক তীক্ষ্মতাবোধ জাগাতে চান; অন্যদিকে আবার গ্রামীণ মানুষকে সজাগ করতে কবিতার চরণে সহজবোধ্যতা আরোপ করেন। দু'টি ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী। কবিতার ক্ষেত্রভূমিকে আত্মকেন্দ্রিক বলয়মুক্ত করণেই তাঁর সংগ্রাম। রোগাক্রান্ত সনাতন চিন্তাভাবনার অবসান চান কবি; নির্যাতিত জীবনের এক একটি প্রতীক আঁকেন, যারা সমাজে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও ভুলুণ্ঠিত যাদের কামনা-বাসনা। এদরে নিয়েই তাঁর কবিতা সাবলিল গতিপথ পেয়ে যায়, এদের নিয়েই কবির স্বপ্ন ও মেহানীয় পরিকল্পনা। ফিরে পেতে চান হারানো সেই স্বর্ণগ্রামকে, যেখানে মানুষ, শুধুই মানুষ; দাস নয়, শৃঙ্খলিত জানোয়ার নয়। জাতিসত্তার আত্ম অনুসন্ধানে কবি নিবেদিত প্রাণ; তাদের স্বপ্ন, আকাঙ্খা, ব্যর্থতার

উদ্ঘাটনে কবি যত্নশীল হন। তাদের ভাষা, চাওয়া-পাওয়ার তীব্রতা, তাদের উপযোগী করেই কবি বিবৃত করতে চান। শ্লোগানধর্মী কবিতার বিপরীতে এ কবিতাগুলোই রুদ্রকে মানুষের নিকটবর্তী করবে চিরদিন।

যে বয়সে কবিতার চরণে প্রগাঢ় অভিব্যক্তির পরিস্ফুটন হয়, রুদ্র তত আয়ু পাননি। অভিজ্ঞতার নির্যাসে কবিতার অবয়বে চিন্তাশীল শৈল্পিক উৎকর্ষ যেভাবে এবং যে পরিবেশে আসে; সে পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা রুদ্রের হয়নি। কবিতার পাকাপোক্ত বহিঃপ্রকাশ তরুণ বয়সেই অপঘাতে থামিয়ে দিয়েছে কবিকে। তারপরও কবিতার আন্তর্বয়নে হারানো লোকজ উপাদান-উপকরণের সমাবেশ ঘটানোর প্রবণতা এবং সমাজ নিরীক্ষাধর্মী চিন্তা-ভাবনা কবি রুদ্রকে বাঁচিয়ে রাখবে আজীবন। বর্তমান সন্দর্ভে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লার কবিমানস ও তাঁর কাব্য ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আমরা এ কথাই বলতে চেয়েছি– তাঁর কবিতা আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে অমূল্য সম্পদ। নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস।

পরিশিষ্ট-১

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রতিকৃতি

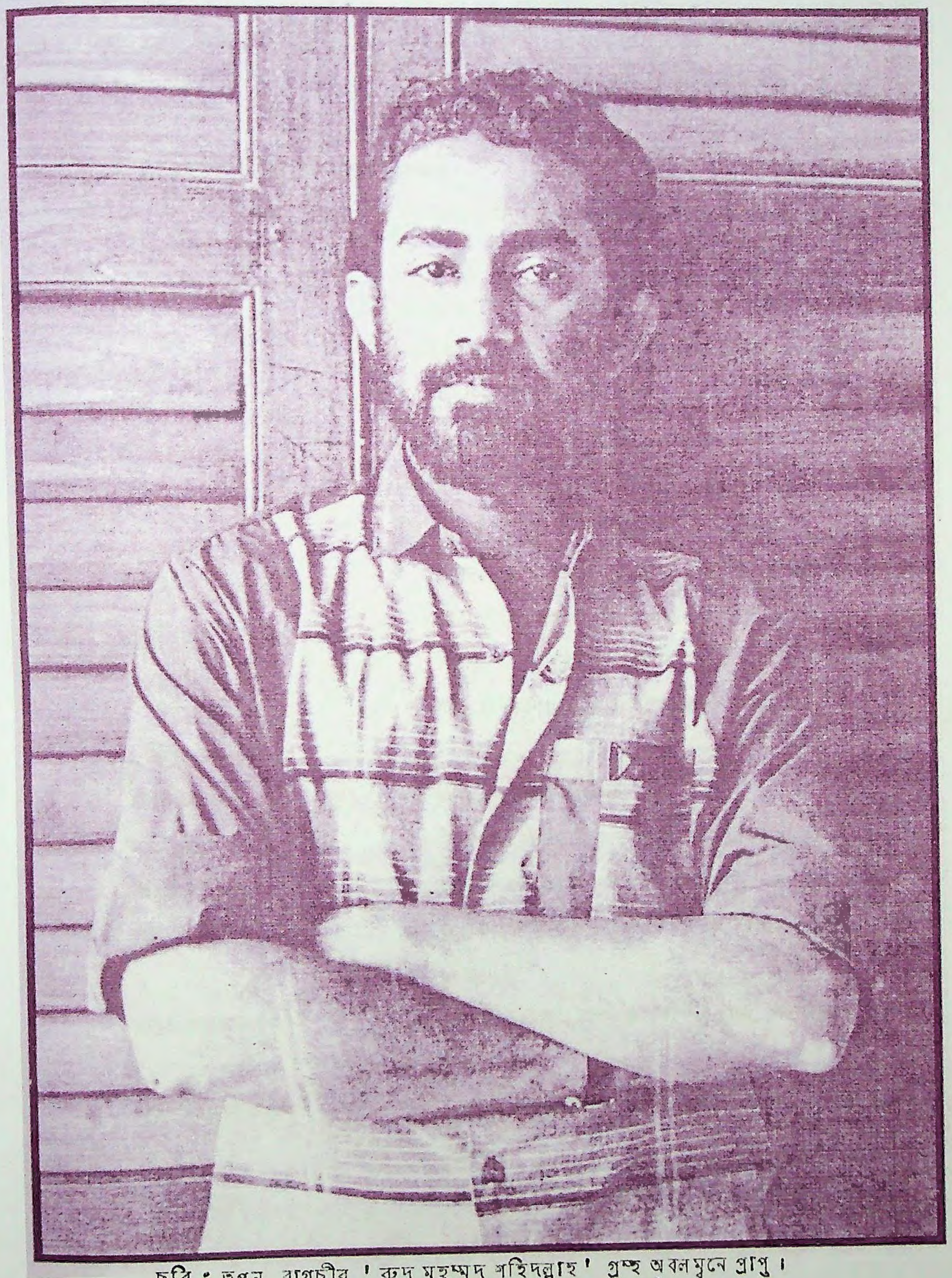

ছবি ঃ তপন বাগচীর 'রুদ্র মহুম্মদ শহিদুল্লাহ' গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাপ্ত।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ(১৯৫৬-৯১)

পরিশিষ্ট – ২

গ্রন্থপঞ্জি

১. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর আলোচিত মূলগ্রন্থ

: উপদ্রুত উপকূল, বুক সোসাইটি, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৯।

: ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম, দ্রাবিড় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১।

: মানুষের মানচিত্র, সব্যসাচী, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ১৯৮৪।

: ছোবল, দ্রাবিড় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

: গল্প, নিখিল প্রকাশন, লালবাগ, ঢাকা, ১৯৮৭।

: দিয়েছিলে সকল আকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮।

: মৌলিক মুখোশ, সংযোগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড), সম্পাদনা: অসীম সাহা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯২।

: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড), সম্পাদনা: অসীম সাহা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯২।

২. সহায়ক গ্রন্থাবলি

অজয় ভট্টাচার্য : নানকার বিদ্রোহ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮।

অরুণ সেন : বিষ্ণু দে-র নন্দনবিশ্ব, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯২।

অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, সিগনেট বুকস্‌, কলিকাতা, ১৩৮৬।

অনীক মাহমুদ : আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : করতলে মহাদেশ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩।

আলী আহসান, সৈয়দ : আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

আবুল কালাম : ইউরোপীয় রাজনীতি ও কূটনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

আব্দুল হাফিজ (সম্পাদিত) : রক্তাক্ত মানচিত্র, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ : সাতনরী হার, বিচিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৫।

আব্দুল গণি হাজারী : জাগ্রত প্রদীপে, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০।

আবুল হাসান : রাজা যায় রাজা আসে, খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭২।

আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) : নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ২৫ মে, ১৯৯৩।

: নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৫।

: নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পু: মুদ্রণ, ১৯৮৩।

আলাউদ্দিন আল আজাদ : মানচিত্র, সাহিত্যভবন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

আহমেদ পারভেজ (সম্পাদিত) : সুকান্ত সমগ্র, স্বর্ণালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

এস.এম. আব্দুল লতিফ : ছন্দ পরিচিতি, ইউরেকা বুক এজেন্সী, ষষ্ঠ সংস্করণ, রাজশাহী, ১৯৯৬।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস : নির্বাচিত রচনাবলি, ১১ খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২।

: নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯।

: রচনা সংকলন, ১ খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : বাঙলা অলঙ্কার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পু: মুদ্রণ, ১৯৯৪।

তপন বাগচী : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

নার্গিস জাফর : বাংলা ছাড়োঃ সিকান্দার আবু জাফর, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

নির্মলেন্দু গুণ : ইস্ক্রা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

: শান্তির ডিক্রি, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮।

: নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক কবিতা, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮।

প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,-৯, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৩।

পুলিন বিহারী সেন (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রায়ণ, ২ খণ্ড, বাক সাহিত্য, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬৮।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় : "আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা", প্রকাশভবন, কলিকাতা-১২, এপ্রিল ১৯৬৯।

বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯।

: সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২ মুদ্রণ, ১৯৯২।

বেগম আকতার কামাল : বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

বার্ণিক রায় : কবিতাঃ চিত্রিত ছায়া, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

বিষ্ণু-দে : সেকাল থেকে একাল, বিশ্বব্যাপী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০।

: কবিতাসমগ্র (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪।

মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতাঃ তুলনামূলক ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মালেকা বেগম : ইলামিত্র, বিচিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

মমতাজউদ্দীন আহমদ : নির্বাচিত নিবন্ধ ও সরস সম্ভার, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯।

ম.আ.ব. সিদ্দিকী : কোমল গান্ধার ভরে আশ্বিনের আকাশ, বিদ্যাপতি প্রকাশ, নওগাঁ, ১৯৯৯।

মহাদেব সাহা : রাজনৈতিক কবিতা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

মুহম্মদ নূরুল হুদা : অরক্ষিত সময়, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

মুনতাসীর মামুন : ইতিহাসের মুক্তি, স্বদেশ প্রকাশনী, পৌষ, ১৩৭৭।

মুজফ্ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতি কথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৯।

যতীন সরকার : সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫।

	:	মানবমন মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০।
রফিকুল্লাহ খান (সম্পাদিত)	:	হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
রণেশ দাশগুপ্ত	:	শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
শামসুর রাহমান	:	বন্দী শিবির থেকে, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-১, জানুয়ারি ১৯৭২।
	:	কাব্যসম্ভার, বিউটি বুক হাউস, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত)	:	চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫।
শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলিকাতা, সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।
শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	:	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪।
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পাদিত)	:	মুক্তিযুদ্ধ: নির্বাচিত কবিতা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭।
সমরেশ দেবনাথ ও নিতাই সেন (সম্পাদিত)	:	দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা, আগামী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৯।
সমর সেন	:	তিন পুরুষ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯।
	:	নানাকথা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯।
	:	কয়েকটি কবিতা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯।
	:	খোলাচিঠি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯।
	:	গ্রহণ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৯।
সত্যপ্রিয় ঘোষ	:	বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭।
সফর আলী আকন্দ (সম্পাদিত)	:	বাঙালীর আত্ম পরিচয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ, ঢাকা, ১৯৯১।
সৈয়দ হায়দার	:	ধ্বংশের কাছে আছি, সাতত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৬।
সুশীলকুমার গুপ্ত	:	রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ, ১৯৭২।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, ১ খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

সিরাজুল ইসলাম, ড. : বাংলদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৮।

সিকান্দার আবু জাফর : বাঙলা ছাড়ো, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।

সোহরাব হাসান ও সুলতানা নাহার (সম্পাদিত) : তৃতীয় বিশ্বের কবিতা, সমাজ গবেষণা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র : বাংলা কবিতার নবজন্ম, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৬২।

হাসান হাফিজুর রহমান : যখন উদ্যত সঙ্গীন, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭২।

: বজ্রেচেরা আঁধার আমার, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩।

হায়াৎ মামুদ : প্রতিভার খেলা নজরুল, চেতনা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

হাসানউজ্জামান, ড. : সামরিক রাজনীতির চালচিত্রঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।

হুমায়ুন কবির : কুমুমিত ইস্পাত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭২।

হুমায়ুন আজাদ : সীমাবদ্ধতা সূত্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

: আমার অবিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

: নরকে অনন্ত ঋতু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

(সম্পাদিত) : আধুনিক বাংলা কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৭।

৩. সহায়ক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনা

আমজাদ হোসেন : "জাসদ রাজনীতিঃ জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি", 'সাপ্তাহিক আগামী', ৬ জানুয়ারি ১৯৮৯।

: "বৃটিশ ভারতে নিষিদ্ধ গ্রন্থ", 'তারকালোক', ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৯।

আলী রীয়াজ : "ভূমিকা", 'সত্তর দশকের কবিতাঃ অজস্র আগুনের ফুল', অর্কিড, ১৯৯৫।

আহমদ শরীফের (কলাম) : "ভাবনার কথা", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ৫ জানুয়ারি ১৯৯৩।

আহমেদ মুসা : "ঋণ সালিশী বোর্ডঃ শুভ সূচনা কিন্তু ফলাফল শূন্য", সাপ্তাহিক আগামী, ৬ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

আলমগীর রেজা চৌধুরী	:	"অচল পত্র", 'কিছুধ্বনি', ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯১।
আহমদ রফিক	:	"বিদায়, মায়াবী চোখ সুদর্শন", 'দৈনিক বাংলা', সাহিত্য পাতা, ৫ জুলাই, ১৯৯১।
আখতার উল আলম	:	"গণতন্ত্রের স্বপক্ষে", 'সাপ্তাহিক রোববার', ৩০ মে, ১৯৯০।
ইসহাক খান	:	"দ্রোহ যাকে করেছে রুদ্র", 'সাপ্তাহিক সংবাদ চিত্র', ৫ জুলাই, ১৯৯১।
এম. আর. চৌধুরী	:	"ভারতের হিন্দু মুসলিমঃ রক্তাক্ত ইতিহাস", 'সাপ্তাহিক আগামী', ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৮।
ওমর তারেক চৌধুরী (অনুদিত)	:	"যৌক্তিক ফ্যাসিবাদ, কালো কুর্তাওলা আর কমিউনিষ্টরা", 'মাসিক সংস্কৃতি', অক্টোবর, ২০০০।
কৃষ্ণকুমার পাল চৌধুরী	:	"স্বাধীনতা, হে মোর স্বাধীনতা", 'বাংলাবাজার পত্রিকা', বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪।
কামাল চৌধুরী	:	"এই শহরের তুর্যবাদক", 'পাক্ষিক শৈলী', ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫।
	:	"রুদ্রঃ অমলিন স্মৃতি", 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ৫ জুলাই, ১৯৯১।
জিল্লুর রহমান/আশরাফউজ্জামান	:	"সিরাজ সিকদার সাফল্যে ও ব্যর্থতায়", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ৫ জানুয়ারি, ১৯৮৯।
তসলিমা নাসরিন	:	"রুদ্র ফিরে আসুক", 'আজকের কাগজ', ৪ জুলাই ১৯৯১।
তাপস বসু	:	"কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ", 'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্রসংখ্যা, ২৬ এপ্রিল, ২০০২।
দেলওয়ার হাসান	:	"ইংরেজ আমলের গোয়েন্দা বিভাগে নজরুল চর্চা", 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ জুন, ১৯৯৯।
নারায়ণ চৌধুরী	:	"বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব", 'মাসিক সংস্কৃতি', অক্টোবর ১৯৯৮।
নূরউল করিম খসরু	:	"লেখালেখি", 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
নীতিশ বিশ্বাস	:	"আমি ব্রাত্য, মন্ত্রহীন", 'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্রসংখ্যা, ২৬ এপ্রিল, ২০০২।
মতিউর রহমান চৌধুরী	:	"বঙ্গবন্ধু থেকে খালেদা", 'বাংলাবাজার পত্রিকা', বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪।

মজিদ মাহমুদ : "সত্তর দশকের কাব্য পাঠের ভূমিকা", 'দৈনিক বাংলা', ২১ জুন, ১৯৯৬।

মাহমুদুর রহমান মান্না : "সিরাজ সিকদার: এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সমালোচনা", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ৫ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

মাহবুব হাসান : "বিপন্ন বিশ্বের 'উত্তরাধিকার' কবি শহীদ কাদরী", 'শিল্পতরু', এপ্রিল, ১৯৯২।

মোহাম্মদ ইউনুস : "বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস", 'সাপ্তাহিক অর্থনীতি', ৭ এপ্রিল, ১৯৮৮।

মুহম্মদ নূরুল হুদা : "ভূমিকা", 'আজকের কবিতা', রূপম, মার্চ ১৯৮৮।

রেজোয়ান সিদ্দিকী : "হুমায়ুন কবির: বিক্ষত হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে পেরিয়ে আসছেন দশক দশক", 'দৈনিক বাংলা', সাময়িকী, ১১ জুন ১৯৯৩।

রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন : "জীবনের দগ্ধ মসলিন: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ", 'দৈনিক ইত্তেফাক', সাহিত্য সাময়িকী, ১১ জুলাই ১৯৯১।

রবিউল হুসাইন : "রুদ্রের কবিতা-জীবন", 'কিছুধ্বনি', অক্টোবর, ১৯৯১।

শহিদুল ইসলাম মিন্টু : "সর্বহারা পার্টির গোপন তৎপরতা", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৩।

শামসুর রাহমান : "ফিরে পাব কি তাঁর স্বর্ণগ্রাম", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ৪ জুলাই ১৯৯১।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর (কলাম) : "শুনতে পাই", 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজ', ১৬ মার্চ, ১৯৮৯।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : "মানুষ ও মানচিত্র: রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ", 'কিছু ধ্বনি', অক্টোবর, ১৯৯১।

হাসান ফেরদৌস : "বই-পরিচিতি", 'সাপ্তাহিক সন্ধানী', ২৪ মে, ১৯৮৫।

হেলাল আহমেদ : "উপদ্রুত উপকূল- এর কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ", 'দৈনিক বাংলা', সাহিত্য পাতা, ৫ জুলাই, ১৯৯১।

৪. সহায়ক পত্র-পত্রিকা

আজকের কাগজ, ৪ জুলাই, ১৯৯১।

কিছুধ্বনি, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯১।

তারকালোক, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৯।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুন, ১৯৯৯।

দৈনিক বাংলা, ২২ জুন, ১৯৯১; ২৩ জুন, ১৯৯১; ১১ জুন, ১৯৯১; সাহিত্য পাতা, ৫ জুলাই, ১৯৯১; ২১ জুন, ১৯৯৫; ২১ জুন, ১৯৯৬।

দৈনিক সংবাদ, সংবাদ সাময়িকী, ৪ জুলাই, ১৯৯১।

দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী, ১১ জুলাই, ১৯৯১।

পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৯, ২৬ এপ্রিল, ২০০২।

পাক্ষিক শৈলী, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৫।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪।

মাসিক সংস্কৃতি, অক্টোবর, ১৯৯৮; অক্টোবর, ২০০০।

শিল্পতরু, এপ্রিল, ১৯৯২।

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ১৬ মার্চ, ১৯৮৯; ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৩; ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৩; ৫ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

সাপ্তাহিক মেঘলা, ১ মার্চ, ১৯৯৮।

সাপ্তাহিক আগামী, ২২ জানুয়ারী, ১৯৮৮; ৬ জানুয়ারী, ১৯৮৯; ১৭ মার্চ, ১৯৮৯; ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

সাপ্তাহিক রোববার, ৩০ মে, ১৯৯০; ৩০ জুলাই, ১৯৯১।

সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ৭ এপ্রিল, ১৯৮৮।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৫ জুলাই, ১৯৯১; ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

সাপ্তাহিক সন্ধানী, ২৪ মে, ১৯৮১।

সাপ্তাহিক সংবাদচিত্র, ৫ জুলাই, ১৯৯১।

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2608
Date. 16.2.07